ভারত বিভাজন
যোগেন্দ্রনাথ
ও
ডঃ আম্বেদকর

শ্রীবিপদভঞ্জন বিশ্বাস

ভারত বিভাজন
যোগেন্দ্রনাথ ও ডঃ আম্বেদকর

শ্রীবিপদ ভঞ্জন বিশ্বাস

—ঃ পরিবেশকঃ—
বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা- ৭০০ ০৭৩

BHARAT BIVAJAN : JOGENDRANATH O DR. AMBEDKAR
[PARTITION OF INDIA : JOGENDRANATH & DR. AMBEDKAR]
BY
SHRI BIPAD BHANJAN BISWAS

সত্ত্ব : লেখকের

প্রথম প্রকাশ : ১ সেপ্টেম্বর, ২০০৩
দ্বিতীয় প্রকাশ : ৫ই মার্চ—২০১৫
প্রকাশক : শ্রীমতী সরযূ বিশ্বাস
কেওটা ফুলবাগান, হুগলী, পিন- ৭১২ ১০৪

লেসার কম্পোজ : শ্রীসৌম্য জ্যোতি রায়
জ্যোতি কম্পিউটারস, বলাকা, বামনগাছি
পিন-৭৪৩ ৭০৬, ফোন- ২৫৬২-৪৩২২
e-mail : nepalroy@vsnl.net

মুদ্রণে : ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রাঃ লিঃ
গঙ্গানগর, কলকাতা - ১৩২
ফোন ঃ ২৫৩৮ ৮৮৮০/৭০০৯

প্রাপ্তিস্থান : ১। ড. বি. আর. আম্বেদকর স্টাডি সার্কেল
বলাকা আবাসন, বামনগাছি, জি ঃ উঃ ২৪ পরগনা
পিন - ৭৪৩ ৭০৬

২। শ্রীবিনয় ভূষণ মিত্র
সাঃ সম্পাদক, মানব অধিকার সংরক্ষণ সমিতি
ভারত গ্যাস বিল্ডিং, জি. টি. রোড মোড়
পোঃ ব্যান্ডেল, জিঃ হুগলী, পিন - ৭১২ ১২৩

৩। মায়া ক্লিনিক, কদমতলা বাজার
৬১৮/১-এ, ডায়মণ্ড হারবার রোড
কোলকাতা - ৭০০ ০৬৩

বিনিময় : ৭০·০০ টাকা

উৎসর্গ

সংখ্যালঘু বিনিময়হীন ভারত ভাগের বলি
মানব অধিকার বঞ্চিত লক্ষ লক্ষ
ছিন্নমূল মানুষের ইতিহাস
যাঁরা লিখবেন।

"মনুষ্যত্ব বিধিদত্ত নিত্য অধিকার
যে নির্লজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার
সভামাঝে, দুর্গতির করে অহংকার,
দেশের দুর্দশা লয়ে যার ব্যবসায়,
অন্ন যার অকল্যাণ মাতৃ-রক্ত-প্রায় —
সেই ভীরু নতশির চিরশাস্তিভারে
রাজকারা বাহিরেতে নিত্যকারাগারে।"

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভূমিকা

তখনও ভারত ও বাংলা বিভক্ত হয়নি। তফসিলী সম্প্রদায়ের নেতা প্রয়াত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের বক্তৃতা শোনার আমার সুযোগ ঘটেছিল। যাঁরা তৎকালীন মুসলিম লীগের সঙ্গে সহযোগিতা করে তফসিলী সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করা ও তাঁদের উন্নতির কথা ভাবেন তাঁদের মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত সময়কালের বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনায় তাঁর ভূমিকার যথার্থ বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

আইন সভায় তাঁর ভাষণ, বিভিন্ন সময়ে পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বিবৃতি, তাঁর নিজের চিঠি-পত্র, সংখ্যায় অল্প হলেও তাঁর রচনা সমূহ, সরকারী কাগজ পত্র ইত্যাদির সাহায্যে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের একটি পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ণ করা সম্ভব হলে আধুনিক বাংলার ইতিহাসের কয়েকটি অবহেলিত দিক সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হবে। বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করে শ্রীবিপদ ভঞ্জন বিশ্বাস এই বিষয়ের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। এই গ্রন্থটি বাংলার রাজনীতিতে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের ভূমিকা আলোচনায় পাঠক মহলে যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি করবে বলে আমার ধারণা।

২২ জুলাই, ২০০৩।

অমলেন্দু দে
সভাপতি
এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা

প্রাক-কথন

'জীবন-চরিত' একাধারে বিবরণী ও ইতিহাস। অর্থাৎ এতে ফুটে ওঠে কোন ব্যক্তি বিশেষের জীবনের ইতিহাস ও বিবরণী। এক কথায় ইতিহাস ও বিবরণীর যৌথ নাম 'জীবন-চরিত'। এ নিয়ে চলচ্চিত্রও তৈরী হয়। এতে আবার দু'টো রূপ ফুটে ওঠে — একটির নাম বস্তুনিষ্ঠ বাস্তব। ইংরেজীতে বলে 'documentary film'; দ্বিতীয়টি উপন্যাসের কাল্পনিক গল্প; ইংরেজীতে বলা হয় 'feature film'। প্রথমটি ইতিহাসের সমগোত্রীয়; দ্বিতীয়টি উপন্যাস। ইদানিংকার জীবন-চরিতে এই দু'য়ের মিশ্র প্রয়োগ দেখা যায়।

এ পর্যন্ত যতগুলো 'জীবন-চরিত' লেখা হয়েছে তার অধিকাংশই কোন না কোন দোষে দুষ্ট। ঐ সব ক্ষেত্রে চরিতকার 'feature film' লেখায় অধিকতর উৎসাহ বোধ করেন। দু'একটি উদাহরণ দিলে প্রসঙ্গটি পরিষ্কার হবে। গান্ধি সম্পর্কে পিয়ারীলালের 'EPIC FAST বা 'মহাকাব্যিক অনশন' উল্লেখ্য। এখানে লেখক তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ডের 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' সম্পর্কে গান্ধির ঐ অনশনের ঐ আখ্যা দিয়েছেন। একে ইতিহাস বলা যায় না, কেননা ওখানে অনুন্নতদের দাবি উপেক্ষা করা হয়েছে। অথচ ঐ অনশনকে 'EPIC FAST' নাম দিয়ে উঁচুস্তরে উন্নীত করা হয়েছে।

আর একটি দৃষ্টান্ত হল জগদীশ চন্দ্র মণ্ডলের 'মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ'। বইটির বিষয়বস্তু অনেকাংশেই বাস্তবতার ঊর্দ্ধে — গল্পে বিরাজমান। ইতিহাস এখানে স্থান পায়নি। কারণ, যোগেন্দ্রনাথ বাংলা তপশীলি ফেডারেশনের সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও নিজের জীবন রক্ষার্থে পাকিস্তান থেকে ভারতে পালিয়ে এলেন। তপশীলিদের রেখে এলেন নেকড়ে বাঘের সম্মুখে। তাই যোগেন্দ্রনাথকে আর যা-ই বলা হোক না কেন 'মহাপ্রাণ' বলা যায় না। তপশীলিদের জন্য তাঁর যে প্রেম তা তো সত্যিকারের প্রেম ছিল না।

প্রসঙ্গত শেকস্পীয়রের প্রেমের সংজ্ঞা উল্লেখ্য:

" ......সে প্রেম তো প্রেম নয় কদাচ, কখন
পরিবর্তনের পথে যে শুধু নিজেকে বদলায়,
অথবা যে নুয়ে পড়ে কাছে পেয়ে সে পরিবর্তন।
.... চির নির্ধারিত চিহ্ন এই,
তাকায় ঝড়ের দিকে, অনড়, অচল, সর্বদাই;
প্রতিটি বিপথগামী জাহাজের ধ্রুব তারা সেই,

....

প্রেমের বদল নেই, পরেনা প্রহর হপ্তা বেশ,
কিন্তু সে অটুট রয় জীবনের অন্তিম প্রহরে।"
(অনিল বিশ্বাস- শেকস্পীয়রের সনেট, ১৯৬৬, সনেট নং ১১৬, পৃ- ৫৮)

শেকস্পীয়রের এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছিলেন তৎকালীন তপশীলি জাতি ফেডারেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট কামিনী প্রসন্ন মজুমদার এবং যুগ্ম সম্পাদক রমেশ চন্দ্র মণ্ডল। তাই তাঁরা বলতে পেরেছিলেন যে, "তিনি (যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল) তপশীলি জাতিবর্গের বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।"

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল রাজনীতিবিদ; কিন্তু স্বপক্ষত্যাগী। তিনি নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়োজনে কখনো এক পক্ষ, কখনো অন্য পক্ষের সমর্থন নিয়েছেন। এ ব্যাপারে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ তাঁর সহায়ক হয়েছে। তিনি ডঃ আম্বেদকরকে নেতা বলে মেনে নিয়েও তাঁর অনুমতি ছাড়াই মুসলিম লীগের 'নমিনী' হিসেবে ১৯৪৬-এ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করেন। এর জন্য বাবাসাহেব অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, "But we can neither congratulate ourselves nor him on this event."। ইতিহাসে দেখা যায় কংগ্রেস তপশীলিদের মধ্য থেকে জগজীবন রামকে এবং লীগ যোগেনবাবুকে মনোনীত করেন নিজ নিজ দলের স্বার্থ সিদ্ধির তাগিদে। ফলে তপশীলিদের দাবি-দাওয়া নস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল।

শ্রীবিপদ ভঞ্জন বিশ্বাস মহাশয় রচিত 'ভারত বিভাজন : যোগেন্দ্রনাথ ও ডঃ আম্বেদকর' শীর্ষক বইটি ইতিহাসের সমতুল্য। কারণ এটি তথ্যনিষ্ঠ বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত। বইটি বাংলা ভাষায় রচিত যোগেন্দ্রনাথের প্রকৃত জীবন কথা। লেখক কল্পনার আশ্রয় নেননি একটুকুও। একজন মানুষের পরিচয় দিতে গেলে তাঁর দু'টো দিক আলোচনা করা দরকার — একটি বাইরের দিক যাকে বলা হয় 'বহিরঙ্গ রূপ'; অন্যটি ভেতরের ব্যাপার, 'স্বরূপের ধাতু বিশ্লেষণ'। বিপদ ভঞ্জন বাবুর এই বইটি শেষোক্ত পর্যায়ের।

লেখকের একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারত বিভাজন প্রসঙ্গে ডঃ আম্বেদকর এবং যোগেনবাবুর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য তুলে ধরা। এই পার্থক্য খুব সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে এই বই-এ। আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

স্বাঃ অনিল বিশ্বাস
জুলাই ৩০, ২০০৩

'গৈরিক'
১৮, কো-অপারেটিভ্ রোড
কোলকাতা-৭০০ ০৭০

শুভেচ্ছা-বাণী

ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ, এম.এ., পি.এইচ.ডি.
ডেপুটি রেজিষ্ট্রার (অবসরপ্রাপ্ত), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১০০০ খৃঃ থেকে পরবর্তী ৭৫০ বছর যেমন চরম বিপর্যয়ের যুগ ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত দশটি বছর তেমনি বাংলার ইতিহাসে চরম বিপর্যয়ের যুগ। এই সময়ে বিদেশী শক্তির সরাসরি মদতে মুসলিম লীগের মত সাম্প্রদায়িক শক্তি বাংলাকে ভারত ভাগের পীঠস্থানে পরিণত করেছিল। লীগের সহযোগী হিসেবে এই কাজে পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র নেতা প্রয়াত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কলঙ্কিত এই দশ বছরের ইতিহাস সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ এখনও উদাসীন; বলা যায় বেদনাদায়ক ভাবে উদাসীন। '৪৬-এর কোলকাতার নারকীয় দাঙ্গাই যে ভারত বিভাজনকে ত্বরান্বিত করেছে এ কথা স্বীকার করতে আমাদের ঐতিহাসিকদের বুক যেন ফেটে যায়। কয়েকজন নব্য বুদ্ধিজীবী আবার নিজেদেরকে অ-হিন্দু পরিচয় দিয়ে '৪৬-এর ঐ দাঙ্গাকে হিন্দুদের সৃষ্টি বলে প্রচার করা শুরু করেছে। এরা সঠিক তথ্যাবলীকে চাপা দিয়ে বাংলা ভাগের জন্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে দোষারোপ করেই থামছে না; ভারত ভাগের জন্য এক তরফা হিন্দুদের দায়ী করছে। অথচ ড.আম্বেদকর এবং ড. মুখার্জী — এই দুই নেতাই চেয়েছিলেন অখণ্ড ভারত। কিন্তু ভারতের প্রতিরক্ষার সমস্যা এবং অধিকাংশ মুসলমানদের মানসিকতার কথা বিবেচনা করে পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগ সহ ভারত ভাগকেই সমর্থন করেছিলেন এঁরা দু'জনেই। অথচ বাবাসাহেবের অনুগামী বলে পরিচয় দিয়ে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িকতা এবং পাকিস্তান সৃষ্টির প্রেক্ষাপট বিষয়ক তাঁর চিন্তা-চেতনা নস্যাৎ করে দিয়ে আজ এরা কেন তথাকথিত ঐতিহাসিক আয়েষা জালালের সঙ্গে সহমত পোষণ করছেন তা বোঝা মুশকিল। তাঁর বিচারে মহম্মদ আলী জিন্নাহ্ ভারত ভাগের জন্য দায়ী নন। এরপর হয়ত কেউ একজন ফতোয়া দিয়ে বসবেন যে, পলাশী কাণ্ডের জন্য মীরজাফর দায়ী নন।

ভারত ভাগের প্রেক্ষাপটটি অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ড. আম্বেদকর তাঁর 'পাকিস্তান অর দি পার্টিশন অব ইণ্ডিয়া' শীর্ষক গ্রন্থে। দলিত নাম নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ এবং তার সঙ্গে ঐতিহাসিকরা কেন বাবাসাহেবের মুল্যায়নকে এড়িয়ে যাচ্ছেন তা বুঝতে খুব একটা কষ্ট হয় না। ১৯৪৩ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত সময় কালের মধ্যে যোগেনবাবু বছর তিনেকের জন্য বাবাসাহেবের রাজনৈতিক দল তফসিলী ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি কাজ করেছেন মুসলিম লীগের একনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে। বাবাসাহেবের চিন্তা চেতনা ও লীগের চিন্তা-চেতনার মধ্যে ফারাক ছিল আসমান-জমীন। এই পার্থক্যকে মুছে

দিয়ে যোগেনবাবুর পাপ কাজকে মহা পুণ্যের কাজ বলে প্রচার চালাচ্ছেন। কি চান এরা? এরা কি আর একটি পাকিস্তান গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন? বলা প্রয়োজন, পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র সমাজের পূর্ব ইতিহাস যা-ই হোক, তাঁরা ক্ষত্রিয় সদৃশ বীরের জাতি। সেদিন এঁদেরকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছিল মুসলিম লীগ আর তাদের বন্ধু যোগেনবাবু। আর আজ তাঁদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে দলিত-মুসলিম ঐক্যের প্রবক্তারা।

১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত সময় কালের নিরপেক্ষ ইতিহাস লেখার প্রধান অন্তরায় তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাস চিন্তা। এই অছিলায় ড. আম্বেদকরের ভূমিকা এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। যোগেন্দ্রনাথকে তো এ পর্যন্ত হিসেবের মধ্যেই আনেননি কেউ। এই অবস্থার সুযোগ নিতে এগিয়ে এসেছে দলিত-মুসলিম ঐক্যের প্রবক্তারা। মুসলিম লীগের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য কাব্যিক গাল গল্পের মাধ্যমে তাঁকে 'মহাপ্রাণ' বা 'মহাত্মা' বানাবার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে ভ্রমাত্মক।

শ্রীবিপদ ভঞ্জন বিশ্বাস মহাশয় গালগল্প পরিহার করে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ দিয়ে ভারত বিভাজন প্রসঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ ও ডঃ আম্বেদকরের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য তুলে ধরেছেন অতি সুন্দরভাবে। যোগেনবাবুর রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস এভাবে আর লেখা হয়নি। মণ্ডল মশাই নিজের পাহাড় প্রমাণ রাজনৈতিক ভুল স্বীকার করে গেছেন তাঁর পদত্যাগ পত্রে। তিনি মুসলিম লীগের প্ররোচনায় শুধু বর্ণহিন্দু সমাজ নয়, তাঁর স্বজাতি নমঃশূদ্র শ্রেণীর যে চরম ক্ষতি সাধন করেছেন তার অকপট স্বীকৃতি আছে ঐ পদত্যাগপত্রে। বিপদভঞ্জনবাবু প্রামাণ্য দলিল পত্র ঘেঁটে যোগেনবাবুর স্বীকৃতির পক্ষে ঐতিহাসিক প্রমাণ তুলে ধরেছেন। এর ফলে বাংলার ইতিহাসের এক অনুদ্‌ঘাটিত দিকের আবরণ উন্মোচিত হল। তিনি যোগেনবাবুকে যথাযথভাবেই তুলে ধরেছেন।

অঙ্কের হিসাবেই দেখা যাচ্ছে ১৯৪৩-এ ২১ জন এম.এল.এ নিয়ে যোগেনবাবু যে মুসলিম লীগকে বাংলার গদিতে বসিয়েছিলেন, সেই মুসলিম লীগ বীর নমঃশূদ্রদের ঘুম পাড়িয়ে রেখে একতরফা হিন্দু হত্যা ঘটিয়ে পাকিস্তান আদায় করে নিয়েছে। ইতিহাসের এই অধ্যায়টি তুলে ধরার ফলে শুধু নমঃশূদ্র সমাজই নয়, যাঁরা ভারতকে ভালোবাসেন, ভারতকে পুনরুত্থিত সাম্প্রদায়িকতার দুষ্ট ছোবল থেকে রক্ষা করতে চান তাঁরা সবাই উপকৃত হবেন। এ ছাড়া নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকরা সঠিক ইতিহাস লেখার উপাদান খুঁজে পাবেন এই বই-এ।

নিরপেক্ষ ইতিহাস মনস্কতার জন্য আমি লেখককে এবং তাঁর সহযোগী গবেষকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

জুলাই ৩০, ২০০৩ স্বাঃ দীনেশ সিংহ

লেখকের নিবেদন

অবিভক্ত ভারতে বিরাট সংখ্যক হিন্দু সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে নির্যাতিত হচ্ছিলেন : তাঁদের সার্বিক মুক্তির জন্য ১৯১৯ থেকেই আন্দোলন সুরু করেছিলেন বাবাসাহেব ডঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকর। এর দীর্ঘদিন পরে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় যোগেনবাবুর ঃ ১৯৪৩-এর অক্টোবর মাসে। উভয় নেতার মধ্যে সর্বশেষ দেখা হয় ১৯৪৬-এর নভেম্বর মাসে (?)। এর মধ্যে প্রায় ৪ মাস যোগেনবাবু বাবাসাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রেখেছিলেন। যতদূর জানা গেছে, '৪৬-এর পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বাবাসাহেবের সঙ্গে মণ্ডল মশাইয়ের সাক্ষাৎকার ঘটেনি; ২/৩-টি চিঠির আদান প্রদান হয়েছিল মাত্র।

দেশ-ভাগ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে এই দুই নেতার ভূমিকা নিয়ে আজও কোন বই লেখা হয়নি। এই সুযোগে আজকের মৌলবাদী অপ-শক্তি তাদের কূট-কৌশল আবার সুরু করেছে। এরা মহান ভারত-প্রেমিক বাবাসাহেবের সঙ্গে যোগেনবাবুকে এক করে 'ভারত পুনর্দখলের' খেলা সুরু করেছে। এরা একদিকে যোগেনবাবুকে দলিত-মুসলিম ঐক্যের পথিকৃৎ বলে বর্ণনা করছেন এবং অপরদিকে তাঁকে বাবাসাহেবের পার্শ্বে বসিয়ে মালা পরাচ্ছেন। এঁরা বলতে চান -- উভয় নেতাই সম মর্যাদাপূর্ণ। এই আন্দোলনকারীদের বক্তব্য -- তফসিলী জাতি-উপজাতিভুক্ত মানুষেরা হিন্দু নন। এঁরা 'দলিত'। এঁদের সঙ্গে মুসলমানদের ঐক্য হলে ব্রাহ্মণ্যবাদী বা মনুবাদী হিন্দুদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করা তো যাবেই; সুযোগ এলে তাঁদেরকে ভারত থেকেই তাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে।

ভারতের ইতিহাস বলছে, যোগেনবাবুই একমাত্র নেতা যিনি হিন্দু হয়েও মুসলিম লীগের 'সহযোগী সদস্যপদ গ্রহণ' [!] করে লীগের মন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছেন প্রায় ৮ বছর। মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভা থেকে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল ১৯৫০-এর ৮ অক্টোবর। আশ্রয় নেন তাঁর আজন্ম শত্রু তাঁর ভাষায় ব্রাহ্মণ্যবাদী এই ভারতে। এখানে এসে তিনি ৮০০০ শব্দ সম্বলিত একটি দীর্ঘ পদত্যাগ পত্র লিখে তার রাজনৈতিক জীবনের 'সব প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসেব' দিয়েছেন। তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে মুসলিম লীগের সঙ্গে গিয়ে তিনি ভুল করেছেন। মুসলিম দর্শন সম্পর্কে তিনি কঠোর মন্তব্য করে বলেছেন, 'পাকিস্তানে হিন্দুদের বসবাস করার কোন সুযোগ নেই। ওখানে থাকতে গেলে হিন্দুদের হয় মুসলমান হতে হবে, নয়ত অন্ধকারে বিলীন হয়ে যেতে হবে।'

তাঁর এই মন্তব্যকে উলটে দেওয়ার চক্রান্ত করছেন আজকের একদল নেতা-কর্মী, যারা 'দলিত-মুসলিম ঐক্যে' গভীরভাবে বিশ্বাসী। তাঁরা যোগেনবাবুর স্বীকারোক্তিকে কালো কাপড়ে ঢেকে দিয়ে এবং তাকে 'মহাপ্রাণ' উপাধি দিয়ে তাঁর ভুলকে সত্য বলে প্রচার করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা সুরু করেছেন। কোন এক অজ্ঞাত কারণে বামপন্থী

নেতাদের কেউ কেউ যোগেনবাবুকে 'মহাত্মা' করার কথা ভাবতে সুরু করেছেন। (হাওড়া, পঃ ব ঃ, থেকে প্রকাশিত মাসিক 'অধিকার' পত্রিকা, ১৫ এপ্রিল, ২০০২)। এই পত্রিকার ভাষ্য মতে বামপন্থী এক মন্ত্রী মশাই দুঃখ করে বলেছেন, " মহাত্মা ফুলের আপনজন তাঁকে মহাত্মার আসনে বসিয়েছেন। কিন্তু আমরা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে মহাত্মার আসনে বসাতে পারিনি। রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা যাই হোক তিনি দলিতদের অধিকার আদায়ের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন।" অথচ ইতিহাস বলছে অধিকাংশ বামমার্গীরা চিরদিন যোগেনবাবুকে সাম্প্রদায়িক নেতা বলে গালাগাল দিয়ে আসছিলেন।

প্রশ্ন উঠেছে — যোগেনবাবু যে রাজনৈতিক কাজ কর্ম করেছিলেন তার ধরনটা কি ছিল? তিনি কি কোন গণ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন কোনদিন? তিনি কি ভারতের অস্পৃশ্য জনগণের দুরবস্থা নিয়ে কোন গবেষণা করেছিলেন? সমাজ সংস্কার বা অর্থনৈতিক সংস্কার সম্পর্কে কোন 'থিসিস' আছে কি তার? নির্যাতিত শ্রেণীর মুক্তির জন্য তিনি কি কখনও জেল জুলুম বা কোন নির্যাতন ভোগ করেছিলেন কোনদিন? তিনি তো মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অংশীদার ছিলেন। এই মুসলিম লীগের একটি মাত্র নীতি ছিল — 'কোরানে বর্ণিত দ্বিজাতি তত্ত্বের বাস্তব রূপ দেওয়া।' তাদের পার্টি ছিল 'অব দি মুসলিম, ফর দি মুসলিম এণ্ড বাই দি মুসলিম।' লীগ প্রকাশ্যে বলেছে হিন্দুরা মানবেতর জীব [sub-human creature] এবং তাদের শত্রু। ১৯৩৭-এ বিক্ষুব্ধ কংগেসীদের সহযোগিতা নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে এম. এল. এ. নির্বাচিত হয়ে ১৯৪৩-এ কোন অধিকারে তিনি লীগের সঙ্গে গাঁটছড়া বাধলেন?

ব্যক্তি জীবনে সদালাপী এবং সুবক্তা যোগেনবাবুর রাজনীতির উদ্দেশ্য ছিল 'সংরক্ষণের মাধ্যমে আমাদের মুক্তি নিয়ে আসা'। এটা করতে গিয়েই তিনি এই মুসলিম লীগের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন। লীগ তাঁকে তফসিলীদের জন্য পৃথক নির্বাচন, চাকুরীতে সংরক্ষণ এবং স্টাইপেন্ড বাবদ কিছু টাকার ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেয়। এই আশ্বাস দিয়ে সুচতুর লীগ যোগেনবাবুকে ***পাকিস্তান আদায়ের কাজে ব্যবহার করেছেন। লীগ এ কাজে শতকরা ১০০ ভাগ সফল হয়েছে।***

কার্ল মার্কস সাহেব নাকি ধর্মকে আফিম বলে বর্ণনা করেছিলেন। সেই আফিমের ধারক ও বাহক মুসলিম লীগের সেদিনের সহযোগী এবং কমিউনিষ্টদের কাছে অচ্ছুৎ যোগেনবাবুকে 'সমাজের অস্পৃশ্য-নিপীড়িত জনজাতি তথা সর্বহারার মুক্তি সংগ্রামের এক মূর্ত প্রতীক' হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছে কোন মহান উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য?

যোগেনবাবুর রাজনৈতিক জীবন নিয়ে কোন কিছু লেখার উদ্দেশ্য আমাদের কোন দিনই ছিল না। ভারত রত্ন ডঃ আম্বেদকর অখণ্ড ভারতের সমর্থক হয়েও কেন শেষ পর্যন্ত ভারত ভাগের পক্ষে মত দিয়েছিলেন তা জনসমক্ষে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে আমরা পড়াশোনা সুরু করি। কাজ করতে গিয়ে দেখা গেল অনেকে বাবাসাহেব এবং যোগেনবাবুকে অযৌক্তিক ভাবে এক করে ফেলছেন। আবার যোগেনবাবুর বলা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা মাটি চাপা দিচ্ছেন। এ সব কারণের জন্যই এই বইটি লিখতে হল।

যোগেনবাবুর রাজনীতি সম্পর্কিত বই-পত্র মোটেই সহজ লভ্য নয়। তবে ইদানিং তার নিজের লেখা পদত্যাগ পত্র এবং কিছু কিছু চিঠি-পত্র পাওয়া গেছে। তাঁর পদত্যাগ-পত্র এমন একটি দলিল যার মধ্যে হিন্দুদের জন্য বিশেষ ভাবে তফসিলী জাতির জন্য তিনি একটি বাণী [message] রেখে গেছেন। তা হল 'কেউ যেন আর কোন দিন মুসলিম লীগ বা তাদের সম-গোত্রীয় মৌলবাদীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ আদায়ের চেষ্টা না করেন।' এই বক্তব্যটিও জনসমক্ষে বিশেষ ভাবে তুলে ধরার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে আজকের 'মৌলবাদ-তোষণ-ভিত্তিক' রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে।

এই বই লিখতে গিয়ে আমরা লণ্ডন থেকে প্রকাশিত ১২ খণ্ডের 'ট্রান্সফার অব পাওয়ার', পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত 'জিন্নাহ্ পেপার্স' [QUAID-I-AZAM MOHAMMAD ALI JINNAH PAPERS], এবং কোলকাতা থেকে প্রকাশিত বেশ কিছু বই ও পত্র-পত্রিকা থেকে সাহায্য নিয়েছি। যোগেনবাবুর পুত্র জগদীশচন্দ্র মণ্ডলের লেখা থেকেও সাহায্য নিয়েছি। সকল গ্রন্থের লেখক এবং পত্র-পত্রিকার সম্পাদকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এ ছাড়া বর্তমান সময়ের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও বিশিষ্ট আম্বেদকর-গবেষক শ্রী দেবজ্যোতি রায় অনেক দুষ্প্রাপ্য তথ্য সংগ্রহ করে দিয়ে এবং তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহার করার সুযোগ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাছাড়া গ্রন্থটি সম্পাদনার প্রতি স্তরে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। তা না হলে এত তাড়াতাড়ি এটি প্রকাশ করা সম্ভব হত না। শ্রীরায় ডি. টি. পি. করা এবং প্রুফ দেখার কাজেও সাহায্য করেছেন। প্রুফ দেখার কাজে আরও সাহায্য করেছেন বন্ধুবর শ্রীকমলাকান্ত বণিক।

গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন এসিয়াটিক সোসাইটির বর্তমান সভাপতি প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ অমলেন্দু দে। 'প্রাক-কথন' লিখেছেন এ কালের বিদগ্ধ পণ্ডিত, কবি ও মণীষী ডঃ অনিল রঞ্জন বিশ্বাস মহাশয়। পাণ্ডুলিপি পড়ে 'শুভেচ্ছা বাণী' পাঠিয়েছেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডেপুটি রেজিষ্ট্রার ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ। এঁদের সকলের কাছে লেখক চির কৃতজ্ঞ।

আমরা আনন্দিত যে আমাদের এই ঐতিহাসিক তথ্য সমৃদ্ধ বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধটিকে ড. বিশ্বাস 'ইতিহাসের সমতুল্য' বলে চিহ্নিত করেছেন। তবে আমাদের এই বিশ্লেষণের সঙ্গে কেউ কেউ হয়ত সহমত পোষণ নাও করতে পারেন। তাঁরা এটিকে 'খোলা চিঠি' হিসেবে ধরে নিয়ে আমাদের দেওয়া তথ্যে ভুল (যদি থাকে) ধরিয়ে দিতে পারবেন এবং এই মূল্যায়নের সমালোচনা করতে পারবেন অনায়াসেই। সেই সমালোচনার ভিত্তিতে আমরা হয়ত ভবিষ্যতে একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখার সুগোগ পাব।

বিনীত —

সাহাগঞ্জ, হুগলী
সেপ্টেম্বর ১, ২০০৩

শ্রীবিপদ ভঞ্জন বিশ্বাস
সভাপতি, মানব অধিকার সংরক্ষণ সমিতি
ব্যাণ্ডেল, হুগলী

সূচীপত্র

অধিকার আদায়ের সংগ্রামে

বাঞ্ছিত লক্ষ্য পাকিস্তান অর্জনের অপূর্ব সাফল্য লাভের জন্য এবং তিনটি 'স্বর্ণ-সিংহাসন' পেয়ে তফসিলীদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি খুশী হয়েছিলেন, তিনি যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। আবার তিনিই ১৯৫০-এর অক্টোবর মাসে সবচেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছিলেন পবিত্র ভূমি পাকিস্তানে তাঁর জীবন নাশের হুমকি পাবার কারণে।

১৯৪৬-অক্টোবর মাসে যে নোয়াখালির তফসিলী সহ হিন্দুদের শতকরা ৯৫ জন অত্যাচারিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁদের মা-বোন-স্ত্রী-কন্যারা সতীত্ব হারিয়েছিলেন, সেই নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় বিমানে এক চক্কর ঘুরে এসে যিনি ২৫ অক্টোবর বলেছিলেন 'ঐ দাঙ্গায় তফসিলীদের একজন মানুষও নিহত বা আহত হননি' [2]; তিনি ভারতের অন্তর্বর্তী সরকারে মুসলিম লীগ মনোনীত আইন মন্ত্রী মিঃ যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল (১৯৪৬)।

৫ নভেম্বর, ১৯৪৬। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সভায় যিনি দুরন্ত গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন **"তপশীলি জাতি হিন্দুদের আওতায় থাকিয়া ঘৃণিত জীবন যাপন করার চেয়ে মুসলমান অথবা অন্য কোন জাতির আওতায় স্বাধীন ও সম্মানের সহিত বাস করিতে বেশী পছন্দ করে"**[3], তিনি কেন্দ্রীয় অন্তর্বর্তী সরকারের আইন মন্ত্রী মিঃ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

১৪ জুন, ১৯৪৭। যোগেনবাবুর 'জাগরণ' পত্রিকায় লেখা হল 'পাকিস্তানে তফসিলীদের অধিকার যথাযথ যে রক্ষিত হইবে তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।...... অবশেষে ভারতের অচল অবস্থার অবসান ঘটিল এবং ভারতকে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে বিভক্ত করণের দীর্ঘ বিতর্কমূলক প্রশ্নের সমাধান হইল। বাঞ্ছিত লক্ষ্য পাকিস্তান অর্জনের অপূর্ব সাফল্য লাভের জন্য আমি কায়েদে আজম জিন্নাহ্ ও মুসলিম লীগকে অভিনন্দিত ও সম্বর্ধিত করিতেছি। **যুগ যুগ ব্যাপী হিন্দু আধিপত্য হইতে ভারতের কোটি কোটি মুসলমানের মুক্তি লাভের সংবাদ বাস্তবিকই আনন্দপ্রদ।** নিশ্চিতরূপে মুসলমান ভারত তাহাদের পরিত্রাতা মহান কায়েদে আজমের কৃতিত্ব চিরদিন কৃতজ্ঞ ও বিস্ময় বিমুগ্ধচিত্তে স্মরণ করিবে।" [4] সেদিন যিনি এই বাণী প্রদান করেছিলেন, তিনি অবিভক্ত ভারতের আইন মন্ত্রী মিঃ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। ৭ মার্চ,১৯৪৮। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি সংবিধান পরিষদে একটি প্রস্তাব আনেন যাতে বলা হয় 'ইসলামে বর্ণিত গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য, সহিষ্ণুতা ও

সামাজিক ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সংবিধান রচিত হইবে।' ["WHEREIN the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice, as enunciated by Islam, shall be fully observed;"] [5] ঐ প্রস্তাবের আইনী বৈধতা দিয়েছিলেন যিনি, তিনি তৎকালীন আইন মন্ত্রী মিঃ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

২৪ মার্চ, ১৯৪৮। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান। পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রাণ পুরুষ ও গভর্ণর জেনারেল মিঃ মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্ ভাষণ দিতে উঠে বললেন, "প্রিয় ছাত্রবৃন্দ, ইসলাম ধর্মের জন্যই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা।" [6] সেদিন ঐ ঘোষণার আইনী বৈধতা দেবার দায়িত্ব যার উপর ন্যাস্ত ছিল তিনি পাকিস্তানের আইন মন্ত্রী মিঃ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

২৪ এপ্রিল, ১৯৫০। রাজশাহী কারাগারের খাপড়া ওয়ার্ডে সংঘটিত হল আর এক 'জালিয়ানওয়ালাবাগ'। নিহত হলেন শিবেন রায়, বিজন সেন, সুধীন ধর ও কম্পরাম সিং সহ মোট ৭ জন। আহত হলেন কমরেড আবদুল্লাহ্ রসুল ও শ্রীমতি ইলা মিত্র সহ ২৫ জন রাজবন্দী। ঐ সময় পাক প্রধান মন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকত আলি খান ঢাকায় ছিলেন। তিনি এই নৃশংস ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে —

'কিছু হিন্দু সন্ত্রাসবাদীর প্ররোচনায় কতিপয় বিচ্ছিন্নতাবাদী কমিউনিষ্ট এবং স্বাধীনতা বিরোধী ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করে পাকিস্তানের দুশমনী করেছিলো এবং তারই দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হয়েছে।' [7] তখন পাকিস্তানের আইন মন্ত্রী ছিলেন মিঃ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

(ইসলাম) "এমন একটি দর্শন যা' মানবতা এবং সকল প্রকার সাম্য ও শুভ চিন্তার পক্ষে মহা বিপদ স্বরূপ।" [8] "শেষ পর্যন্ত আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, পাকিস্তান হিন্দুদের বাসযোগ্য নয়। ওখানে তাঁদের ভবিষ্যত ধর্মান্তরগ্রহণ এবং অবলুপ্তির করাল ছায়াপাতে তমসাচ্ছন্ন।" [9] '৫০-এর ৮ অক্টোবর এই মন্তব্য যিনি করেছিলেন তিনি পাকিস্তানের আইন মন্ত্রীর 'স্বর্ণ সিংহাসন' ছাড়তে উদ্যোগী মিঃ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

মিঃ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল জন্মেছিলেন বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল জেলার মৈস্তারকান্দী গ্রামে এক নমঃশূদ্র পরিবারে। তারিখ ১৯০৪-এর ২৯ জানুয়ারী। তিনি ১৯২৪-এ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। গণিত ও সংস্কৃত সহ বি.এ. পাশ করেন ১৯২৯-এ। ১৯৩৪-এ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে স্নাতক হন। ১৯৩৭-এ সক্রিয় রাজনীতি শুরু করেন। তিনি মারা যান ১৯৬৮-এ। তারপর থেকে তার অতি আপন জনেরা তাকে 'মহাপ্রাণ' আখ্যা দিতে সুরু করেন। তখনকার বামপন্থীরা মহাপ্রাণ তো দূরের কথা যোগেনবাবুকে স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন। কারণ তাদের মতে যার মধ্যে কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান বা বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে সে কমিউনিষ্ট হয়। আজও ঐ মাপকাঠির তেমন কোন হেরফের হয়নি। অথচ 'হিন্দুত্ববাদী ও সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধতা' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় এক বামপন্থী মন্ত্রী বলে বসলেন, "মহাত্মা ফুলের আপনজন তাঁকে মহাত্মার আসনে বসিয়েছে। কিন্তু আমরা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে মহাত্মার আসনে বসাতে পারিনি। রাজনৈতিক

চিন্তা চেতনা যাই হোক তিনি দলিতদের অধিকার অর্জনের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন।" (শ্রীগৌরাঙ্গ সরকার সম্পাদিত মাসিক 'অধিকার', এপ্রিল ১৫, ২০০২)

মোটামুটি ঐ সময় থেকে যোগেন্দ্র অনুরাগী কয়েকজন কলমচি যোগেনবাবুর নব মূল্যায়নে ব্রতী হয়েছেন। তাঁকে পাকিস্তান সৃষ্টি-বিরোধী, তফসিলীদের অধিকার আদায়ের বীর সেনাধ্যক্ষ, প্রাজ্ঞ, ঐ সময়ের সবচেয়ে বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করতে সুরু করেছেন। কেউ কেউ তাঁর কাজের ফলাফলকে 'বিষময়' হিসাবে চিহ্নিত করেও তাঁর প্রচেষ্টাকে যথেষ্ট 'আন্তরিক' বলে আখ্যা দিচ্ছেন। কেউ বা তাঁকে 'সৎ ও দেবোপম চরিত্রের অধিকারী' বলে বর্ণনা করছেন। এবারে আমরা খুঁজে দেখব যোগেনবাবুর বয়ঃপ্রাপ্তির পর থেকে তপসিলীদের অধিকার অর্জনের কি কি সংগ্রাম হয়েছিল এবং সেইসব সংগ্রামে তিনি কখন কি ভূমিকা পালন করেছিলেন।

তিরিশের দশকের পূর্ব পর্যন্ত নির্যাতিতদের সকল আন্দোলনই ছিল মূলতঃ সামাজিক অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। এগুলোর মধ্যে প্রধান হল — বারোয়ারি উৎস থেকে জলপানের অধিকার, মন্দিরে প্রবেশের অধিকার, রাস্তাঘাটে স্বাধীন ভাবে চলাফেরার অধিকার সহ মনুস্মৃতি বাতিলের দাবি ও মনুস্মৃতি দহন ইত্যাদি। বোম্বাই অঞ্চলে এ ধরনের অনেক কাজের মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর। তিরিশের দশক থেকেই সুরু হয় অস্পৃশ্যদের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। যোগেনবাবু এ সময়ে ২৬/২৭ বছরের যুবক।

তিরিশের দশকের সুরুতে অর্থাৎ ১৯৩০-'৩১-'৩২ সনে ইংরেজের সঙ্গে ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দের পর পর তিন তিনবার গোল টেবিল বৈঠক হয় ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক নীতি নির্ধারণের জন্য। এখানে ভারতের বিভিন্ন দলমত-জাতি-গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। নির্যাতিত **[depressed]** শ্রেণীর পক্ষে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন বাবাসাহেব ডঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকর। তখনও রাজনীতিতে প্রবেশ ঘটেনি যোগেনবাবুর।

মুসলিম লীগের দাবি মেনে নিয়ে তাদের জন্য পৃথক নির্বাচনের নীতি গৃহীত হয়েছিল ১৯০৯ সালে। এই মুসলিম লীগের জন্ম হয় ১৯০৬-এ। বলা যায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সৌজন্যেই এই দলের জন্ম। পূর্ববঙ্গের তখনকার ছোট লাট মিঃ হেয়ার ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্কে ১৪ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়ে আগেই লীগের জন্মের পথ প্রশস্ত করে রেখেছিলেন। [10]

১৯১৬-এ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তির (লখ্নৌ চুক্তি) ফলে এই পৃথক নির্বাচন প্রথা কার্যকর হয়। ডঃ আম্বেদকর রাজনীতির জগতে এসে অস্পৃশ্যদের ভোটাধিকার এবং সংরক্ষণ সহ যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা দাবি করেন। [11] এই দাবির প্রতি কেউ কর্ণপাত না করায় তিনি ১৯৩০-৩২-এ লণ্ডনে অনুষ্ঠিত গোল টেবিল বৈঠকে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা দাবি করেন। এই দাবি গৃহীতও হয়। এর ফলে 'হিন্দুদের মধ্যে বিভাজন হবে' — এই আশঙ্কায় শ্রী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (গান্ধীজী) পুনার যারবেদা জেলে বসে আমরণ অনশন

সুরু করেন। এ ব্যাপারে অনেক তর্ক বিতর্ক ও আলোচনা সমালোচনার পর গান্ধীজীর জীবন বাঁচাতে তাঁর সঙ্গে ডঃ আম্বেদকরের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর। এই চুক্তির নাম 'পুনা চুক্তি'। পৃথক নির্বাচন পেলে অস্পৃশ্য শ্রেণীর লোকেরা নির্বাচনে সংখ্যানুপাতে যতগুলি আসন লাভ করবেন তার চেয়ে বেশি আসন ছেড়ে দিতে রাজি হয়ে গান্ধীজী এই চুক্তি মেনে নেন। জাতির এই সংকটময় দৃশ্যেও ২৯ বছরের যুবক যোগেনবাবু ছিলেন অদৃশ্য।

গোলটেবিল বৈঠকগুলোর প্রেক্ষিতে ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনে তফসিলীদের শিক্ষা ও চাকুরীতে আলাদা সুযোগ সুবিধা দেওয়ার নীতি গৃহীত হয়। গণপ্রতিনিধিত্বের ব্যাপারেও এদের জন্য সংরক্ষণসহ যুক্ত নির্বাচন নীতি সংবিধান সম্মত করা হয়। এটাই হল ভারতের তফসিলীদের (পরবর্তীকালে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদেরও) জীবনের রাজনৈতিক 'ম্যাগ্না কার্টা'। এ সব চলাকালীন সময়ে একমাত্র ডঃ আম্বেদকরেরই ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিক। এ সময়ও যোগেনবাবু কোন দৃশ্যে দৃশ্যমান হননি। কাজেই সংরক্ষণ বা নির্বাচন পদ্ধতি গৃহীত হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে যোগেনবাবুর কোন ভূমিকাই ছিল না, থাকতে পারে না। অথচ তফসিলীদের জন্য সংরক্ষণ নীতি প্রবর্তন 'যোগেনবাবুর রাজনৈতিক চেষ্টার ফল' বলে কোন কোন মহল থেকে প্রচার করা হচ্ছে। এইরূপ প্রচার মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

অস্পৃশ্য তথা তফসিলীদের অধিকার অর্জনের জন্য যে সব সংগ্রাম হয়েছে তার নেতৃত্ব দিয়েছেন ডঃ আম্বেদকর এবং তার প্রথম পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৩৫ সালে। এই বছর এঁদের অধিকার সংবিধানে (অ্যাক্টে) লিপিবদ্ধ হওয়ার পর সর্ব ভারতীয় ভাবে এঁদের অধিকার অর্জনের জন্য আর তেমন কোন লড়াই-আন্দোলন করতে হয়নি। যোগেনবাবু এ সময় পর্যন্তও (১৯৩৫) রাজনীতিতে আদৌ প্রবেশ করেননি। তিনি অধিকার আদায়ের আন্দোলন করলেন কখন? এর পরের ইতিহাস (কার্যত) অধিকার আদায়ের সংগ্রাম নয়, সারা ভারতে নির্বাচনের মাধ্যমে গদি দখলের লড়াই।

যোগেনবাবুর রাজনীতিতে প্রবেশ ঘটে ১৯৩৭ সনে। ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন অনুযায়ী এ সময়ে সারা ভারতে প্রাদেশিক আইন সভার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বরিশালের কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন বিখ্যাত জমিদার দত্ত পরিবারের সরল দত্ত মহাশয়। কিন্তু তখনকার কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে অনেকেই সরল দত্তের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। কংগ্রেসের ঐ বিক্ষুব্ধ অংশের সমর্থন নিয়ে যোগেনবাবু ঐ সাধারণ 'সীটে' প্রার্থী হন (সরকারীভাবে নির্দল প্রার্থী) এবং সরল দত্তকে পরাজিত করেন। তারপর অনেক দিন পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের সঙ্গেই ওঠাবসা করতেন।

১৯৩৭-এর ঐ নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। বাংলার মানুষ আশা করেছিল অপেক্ষাকৃত অসাম্প্রদায়িক কৃষক প্রজা পার্টি (কে-এস-পি) ও কংগ্রেস মিলে শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হকের (হক সাহেব) নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার বসবে বাংলার গদিতে। কিন্তু সে চেষ্টা অতি সামান্য কারণে ব্যর্থ হয় এবং মুসলিম লীগ ও

কে-এস-পি-র কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। এই ঘটনার মধ্য দিয়েই বাংলার শাসন ক্ষমতায় সাম্প্রদায়িক অশুভ শক্তি মুসলিম লীগের অনুপ্রবেশ ঘটে। এ কাজ কংগ্রেসের অদূরদর্শিতারই নিদর্শন।

এরপর 'ওয়ার কাউন্সিলে' [War Council] সদস্যপদ নেওয়ায় হক সাহেবের সঙ্গে মিঃ জিন্নাহ্‌র প্রচণ্ড মতবিরোধ দেখা দেয়। এবং এর ফলে মিঃ জিন্নাহ্ "ফজলুল হককে মুখ্যমন্ত্রীর *(ঐ সময় বলা হত প্রধানমন্ত্রী)* পদ থেকে সরিয়ে দেবার জন্য তাঁর সমর্থকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।" [12]

তার ফলে "দেখা গেল, ১লা ডিসেম্বর তারিখে মুসলিম মন্ত্রীরা সকলে এক সাথে হক মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করিলেন। মুসলিম লীগ পার্টিও আর হক মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করে না বলিয়া ঘোষণা করিল। অগত্যা হক সাহেবও পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ...... ইউরোপীয় দল ও কোন কোন শ্বেতাঙ্গ আই. সি. এস. সেক্রেটারির পরামর্শে লাট সাহেব স্যার নাজিমুদ্দিনকে ভরসা দিয়াছিলেন, হক মন্ত্রিসভার অবসানে লীগ দলকেই মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হইবে।" [13] তখন হক সাহেবকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন শরৎ চন্দ্র বোসের নেতৃত্বে কংগ্রেসের একটি অংশ, সুভাস চন্দ্র বোসের ফরোয়ার্ড ব্লক এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর হিন্দু মহাসভা। এঁদের সকলকে নিয়ে হক সাহেব গঠন করলেন 'প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি'। হক সাহেব তখন মেজরিটির সমর্থন পেলেন। তাই বাংলার লাট সাহেব ১০ ডিসেম্বর লীগকে না ডেকে হক সাহেবকেই আবার মন্ত্রিসভা গঠন করতে বললেন হয়তবা বড়লাটের নির্দেশে। এই মন্ত্রিসভায় অতি অবশ্যই শরৎবাবু এবং শ্যামাপ্রসাদ বাবু থাকবেন। কিন্তু ১১ (১২) ডিসেম্বর মন্ত্রিসভা গঠনের মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে ভারত রক্ষা আইনে শরৎ বাবুকে গ্রেপ্তার করা হল। তাই শরৎ বাবুকে বাদ দিয়েই মন্ত্রিসভা গঠন করেন হক সাহেব। এর নাম 'শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা'।

"দ্বিতীয়বার ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রীরূপে দায়িত্ব গ্রহণ করার পরেই বিধান সভার ভেতরে ও বাইরে মুসলিম লীগের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই মন্ত্রিসভার পতন ঘটানো এবং লীগের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করা।" [14] এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ১৯৪২-এর শেষের দিকেই অনেকের মধ্যে যোগেনবাবুরও কদর বেড়ে যায় লীগের কাছে। কারণ, তিনি ইতিমধ্যেই 'হক-বিরোধী' বলে পরিচিত হয়ে গেছেন। কিছুদিন আগে তিনি অন্যান্য কয়েকজন হক-বিরোধী সদস্য নিয়ে হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। "হক মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনকারীদের মধ্যে আমি অন্যতম।" বলেছেন যোগেন্দ্রনাথ। এটি উল্লেখ করেছেন তাঁর পুত্র জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল তাঁর লেখা 'মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ'-এর ১ম খণ্ডের ৫৮ নং পৃষ্ঠায়।

ওদিকে গোলটেবিল বৈঠকের পর থেকেই মুসলিম লীগ বিশ্রীভাবে ঝিমিয়ে পড়েছিল। মিঃ মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ মুসলিম লীগের চিতার ধোঁয়া (Funeral) দেখার জন্য থেকে যান লণ্ডনে। ১৯৩৪-এ লিয়াকত আলি লণ্ডনে গিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে জিন্নাহ সাহেবকে

ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। ভারতে এসেই জিন্নাহ্ সাহেব কোরান-হাদীস অনুসরণ করে টুপিধারী মোল্লা বনে যান [15] এবং খুব শক্ত হাতে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দেন।

১৯৪০ সনে তারই নেতৃত্বে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে প্রস্তাব করা হয় যে, মুসলমানদের জন্য আলাদা আবাস ভূমি চাই। এর নাম 'লাহোর প্রস্তাব'। এটি আসলে 'পাকিস্তান প্রস্তাব'। ডঃ আম্বেদকর এ বিষয়ে তাঁর সুদূর প্রসারী চিন্তাভাবনার কথা তাঁর 'Thoughts on Pakistan' (যার পরবর্তী নাম 'Pakistan or The Partition of India') গ্রন্থে তুলে ধরেছেন ঐ ১৯৪০ সনের ডিসেম্বরেই। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে তিনি ভারতকে অখন্ড রাখার অনেক যুক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। তবে এই অভিজ্ঞ রাষ্ট্র বিজ্ঞানীর মতে ভারতের অখন্ডতার ব্যাপারে অন্তরায় সৃষ্টিকারী দু'টো পরিস্থিতি সমাজ দেহে বর্তমান। আর তা হল — (১) অখণ্ড ভারতে হিন্দু মুসলমানের মিলিত প্রতিরক্ষা বাহিনীর সমস্যা [Defence of united India] এবং (২) মুসলমানদের মানসিকতা [sentiment of the Muslims]। এই অপরিহার্য পরিস্থিতির যথার্থতা বোঝানোর জন্য তিনি প্রশ্নাকারে একটি বাস্তব উদাহরণ টেনে বলেছেন, **"ভারতের সেনাবাহিনী অবশ্যই হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সেনাবাহিনী হবে। সেক্ষেত্রে ভারত যদি বিদেশী শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে ভারত রক্ষার ব্যাপারে সৈন্য বিভাগের মুসলমান সৈন্যদের কি বিশ্বাস করা যাবে? তারপর আক্রমণকারী যদি তাদের স্বধর্মের হয় তবে কি মুসলমান সৈন্যরা আক্রমণকারীর পক্ষ নেবে, না ভারত রক্ষার জন্য আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে?"** [16]

এই প্রশ্নের একটি উত্তর পাওয়া গিয়েছিল অনেক আগে, ১৯২৪ সনে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আলোচনার পর বাংলা সংবাদ পত্রের এক সম্পাদক তার রিপোর্টে লিখেছেন, "কবি বলেছেন, অত্যন্ত খোলা মনে তিনি অনেক মুসলমানকে জিজ্ঞেস করেছেন যে, কোন বিদেশী মুসলমান শক্তি যদি ভারত আক্রমণ করে তবে তারা তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের সঙ্গে একত্রে তাদের উভয়ের মাতৃভূমি রক্ষার জন্য এক কাট্টা হয়ে লড়বেন কিনা। তাদের নিকট থেকে যে উত্তর পেয়েছেন তাতে তিনি *(কবি)* সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি বললেন, তিনি এ কথা নিশ্চিত বলতে পারেন যে, মহম্মদ আলির মত লোকেরা পর্যন্ত প্রকাশ্যে ঘোষণা করেই বলেছেন যে, কোন অবস্থায়ই একজন মুসলমানের পক্ষে আর একজন মুসলমানের (তার স্বদেশ পরিচয় যাই হোক না কেন) বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কোনরূপ অনুমতি নেই।" [17]

ভারত-বিভাজনের পক্ষে উপরে উল্লেখিত কারণ দু'টি পেশ করার আগে বাবাসাহেব ভারতের সামরিক বাহিনীর ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে দেখেছেন ইংরেজ সরকার সামরিক বাহিনীর ১৯৩০-এর পরের ইতিহাস গোপন করে ফেলেছেন। তাই ১৯৪০-এ অর্থাৎ 'পাকিস্তান প্রস্তাব' পাশ করার সময় ভারতের সামরিক বাহিনীতে মুসলিম সৈন্যের সংখ্যা কত তা জানার কোন উপায় ছিল না। কেউ কেউ বলেন, যুদ্ধ পূর্ব *(দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ)* স্বাভাবিক অবস্থায় ভারতের সামরিক বাহিনীতে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৬০ থেকে ৭০ জন।

অন্য একদল বলছেন ৫০ এর কাছাকাছি। বাবাসাহেব বলছেন, "এটা যদি ৫০ শতাংশও হয়ে থাকে, তবে হিন্দুদের ক্ষেত্রে তা অবশ্যই আশঙ্কার কারণ।" [18] ঐ সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীতে মুসলমান সৈনিকের সংখ্যা যে শতকরা ৫০-এর কম নয়, তার আর একটি প্রমাণ পাওয়া গেছে ১৯৪২-এর ১৩ সেপ্টেম্বরে মিঃ জিন্নাহ্‌র সাংবাদিক সম্মেলনে। একজন সাংবাদিক জিন্নাহ্ সাহেবকে প্রশ্ন করেছিলেন — আপনি কি সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন? উত্তরে উনি বলেছিলেন — " আমি এ ব্যাপারে প্রায় নিঃসন্দিহান যে, বিরাট সংখ্যক সৈন্য আমাদের দিকেই চলে আসবে। বর্তমানে সেনাবাহিনীর শতকরা প্রায় ৬৫ জন মুসলমান। [".......but I have very little doubt in my mind that a very large body in the army will fall out, and today almost 65% of the army are Mussalmans." 'T. P.', Vol. XII, page-960]

মুসলিম লীগের স্বর্ণ সিংহাসনে (১৯৪৩)

"তপসিলীদের এটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তাঁরা হিন্দুদের অপছন্দ করেন বলেই মুসলমানদের বন্ধু বলে মনে করেন। এই চিন্তাধারা ভুল।" —ডঃ আম্বেদকর।

১৯৪৩। যোগেনবাবু এবং তাঁর অনুগামীরা মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভায় 'তিনটি স্বর্ণসিংহাসন' (?) লাভ করলেন। এই বছরই মনুষ্য-সৃষ্ট ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের বছর। ডঃ আম্বেদকরের সঙ্গে যোগেনবাবুর প্রথম সাক্ষাতের বছর। তখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে পুরোদমে। ওয়ার কেবিনেটের [War Cabinet] শীর্ষে ছিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ জিন্নাহ্‌র অতি শ্রদ্ধাভাজন মিঃ উইনস্টন এস্ চার্চিল। ভারতের ভাইস্‌রয় ছিলেন মার্কুইস লিনলিথগো, কমাণ্ডার-ইন-চীফ ছিলেন কংগ্রেস ও গান্ধীবিরোধী জেনারেল ওয়াভেল। ডঃ আম্বেদকর ছিলেন ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের শ্রম সদস্য (মন্ত্রী)। বাংলার গভর্ণরের পদে আসীন ছিলেন মুসলিম লীগের পৃষ্ঠপোষক লেঃ কঃ স্যার জন হার্বার্ট। লীগ বিরোধী শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক বাংলার প্রিমিয়ার; আজকের ভাষায় মুখ্যমন্ত্রী।

বাংলায় তখন কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, (হক সাহেবের) কৃষক প্রজাপার্টি, কমিউনিষ্ট পার্টি এবং হিন্দু মহাসভা সক্রিয়। মুসলিম লীগের 'মহাপ্রাণ' মিঃ জিন্নাহ্ ১৯৪০-এ হক সাহেবকে দিয়ে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করাতে পারলেও মিঃ জিন্নাহ্‌র সঙ্গে তাঁর বিরোধ দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছিল। হক সাহেবের তুলনায় মিঃ সরোয়ার্দি এবং মিঃ নাজিমুদ্দিন সাহেবরা ছিলেন তাঁর অনেক বেশি কাছের। তবে সরোয়ার্দি এবং নাজিমুদ্দিনের মধ্যেও খুব একটা ভাল সম্পর্ক ছিল না। ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে হক সাহেব সরোয়ার্দি-নাজিমুদ্দিন- জিন্নাহ্‌র বিপরীত মেরুতে চলে গেছিলেন। ১৯৪১-এর শেষে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। তৎকালীন রিফর্মস কমিশনার ৮ নভেম্বর থেকে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ ১ মাস ধরে বিভিন্ন প্রদেশ ঘুরে ঘুরে জানতে পেরেছিলেন যে, একমাত্র শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক বাদে প্রতিটি মুসলিম লীগ নেতা পাকিস্তান প্রস্তাবের সমর্থক। অর্থাৎ হক সাহেব পাকিস্তানের দাবি থেকে সরে এসেছেন। "The Pakistan theory itself was supported with strict orthodoxy by every Muslim League politician with whom I spoke (Except Mr. Fazlul Huq, who was then still nominally a leading member of the League) and by no one else,

..." (T.P. Vol. 1, pp. 65-66 এবং ডঃ অমলেন্দু দে-র পা. প্র. ও ফজলুল হক, পৃ-১৩৫)

যুদ্ধের গতি তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এর সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় খাদ্যাভাব শুরু হয়েছে। গভর্ণর হার্বার্ট সাহেব অযৌক্তিকভাবে খাদ্য সংগ্রহের জন্য হক সরকারকে নির্দেশ দিলেন। হক সাহেব এই নির্দেশ অমান্য করলেন। তখন নাজিমুদ্দিন রাজী হয়ে গেলেন। কারণ মুসলিম লীগ চাইছিল যেন তেন প্রকারে বাংলার ক্ষমতা দখল করা চা-ই চাই।

প্রসঙ্গত স্বাধীনতা, দেশভাগ এবং সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে তখনকার রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। কংগ্রেসের একমাত্র বক্তব্য ছিল 'দ্বিজাতি তত্ত্ব ভুল'। যা ঘটে ঘটুক, অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা তাদের চাই। হিন্দু মহাসভা বলছে, দ্বিজাতি তত্ত্ব সঠিক। তাবলে এই তত্ত্বকে ভিত্তি করে দেশ ভাগ হতে দেওয়া হবে না। কমিউনিষ্টরা একদিকে মুসলিম লীগ এবং অপরদিকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সুভাস বসু, কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভার বিরোধিতায় মশগুল। তাদের মতে দারিদ্র দূরীকরণের 'অমোঘ বিধান' (?) 'মার্কসবাদ' প্রতিষ্ঠিত হলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার মত পুচকে সমস্যা আর থাকবে না।

দ্বিজাতি তত্ত্ব-ভিত্তিক রাজনীতির প্রবর্তক মুসলিম লীগ ও মিঃ জিন্নাহ্‌র মতে (আসলে কোরানের দৃষ্টিতে) হিন্দুরা মানবেতর জীব। তাদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করা যায় না। তাই তাঁদের বক্তব্য ছিল, পাকিস্তান চাই-ই চাই। গোটা বাংলা ও গোটা পাঞ্জাব নিয়েই পাকিস্তান চাই। মিঃ জিন্নাহ্‌র সদম্ভ উক্তি — 'হয় পাকিস্তান আদায় করে নেব, নয়ত ভারতকে ধ্বংস করে দেব।' লাহোর প্রস্তাব উত্থাপনের আগে মিঃ জিন্নাহ্‌ একটি থিসিস লেখেন। এর নাম 'Western Democracy Unsuited For India'। এই থিসিস এবং লাহোর অধিবেশনে তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতা থেকে জানা যায়, তাঁর বিচারে ভারতবর্ষের ঐক্যবদ্ধ কোন রূপ নেই; এখানে হিন্দু-মুসলিম দু'টি পৃথক জাতি আছে এবং ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে সমাধান করা সম্ভব নয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মুসলিম লীগের হয়ে মিঃ জিন্নাহ্‌ ঐ সময় ব্রিটিশ সরকারের কাছে যে সব দাবি করেছিলেন তার মধ্যে তিনটি মারাত্মক দাবি হচ্ছে — [19]

১। ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন পুরোপুরি বাতিল করতে হবে।

২। মুসলিম লীগের সম্মতি নিয়ে শাসনতন্ত্রের সংস্কার করতে হবে।

৩। কোন মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে ভারতীয়, বিশেষ করে মুসলিম সৈন্য ব্যবহার করা চলবে না।

ডঃ আম্বেদকর এ ব্যাপারে যা বলেছিলেন, আমরা তা এই বই-এর বিভিন্ন জায়গায় বিশদ ভাবে উল্লেখ করেছি। এখানে একটি কথা বলাই যথেষ্ট যে, বাবাসাহেব 'মুসলমানদের মানসিকতা' এবং 'ভারতের প্রতিরক্ষার কথা' বিবেচনা করে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাজন এবং প্রস্তাবিত হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের মধ্যে সংখ্যালঘু বিনিময় সহ দেশ-ভাগ করাই সমীচীন

বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। বাবাসাহেব বলেছেন — "মুসলমানদের কাছে হিন্দু হচ্ছে কাফের। এই কাফের সম্মানের যোগ্য নয়। জন্মগতভাবে সে হীন। সম্মানজনক কোন অবস্থানই নেই তার।" [20] এ সব ব্যাপার সঠিকভাবে অনুধাবন করেই বাবাসাহেব আড়াই বছর আগে (ডিসেম্বর, ১৯৪০) সাম্প্রদায়িক শান্তি রক্ষার জন্য ইউরোপের তুরস্ক, গ্রীস ও বুলগেরিয়ার মত ভারতেও দেশ ভাগের সঙ্গে সংখ্যালঘু বিনিময়ের প্রস্তাব রাখেন এবং বলেন এটাই একমাত্র শান্তির স্থায়ী পথ। [21] রাজনৈতিক কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন যেকোন নেতা সেদিন এ সব খবর রাখতেন। যোগেনবাবুও এ খবর রাখতেন নিশ্চয়ই।

ডঃ আম্বেদকরের এই সব বক্তব্য সেদিন সারা ভারতে আলোড়ন সৃষ্টি করলেও যোগেনবাবুরা সেদিন এসব কথা কানে তোলেননি। ইসলাম কি তা তিনি বুঝতে যাননি, ইসলামের ইতিহাস পড়তে যাননি কিংবা দ্বিজাতি তত্ত্বের মর্মও বুঝতে যাননি। মুসলিম লীগের দলীয় মেনিফেস্টো জানতে যাননি। লীগের মাধ্যমে তফসিলী সমাজের মুক্তির দোহাই দিয়ে তিনি সেদিন মুসলিম লীগের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের অংশীদার হয়েছিলেন।

২৮ মার্চ, ১৯৪৩। গভর্ণর স্যার জন হার্বার্ট ফজলুল হককে ডেকে পাঠান। রাত ৭-৩০ মিঃ থেকে ৯টা পর্যন্ত গভর্ণরের সঙ্গে জাতীয় ক্যাবিনেট গঠন করার বিষয়ে তিনি কথা বলেন। গভর্ণর কয়েকটি প্রস্তাব তাঁর কাছে রাখেন। আত্মসম্মানে আঘাত লাগায় ফজলুল তা গ্রহণ করতে অক্ষম হন। গভর্ণর তাঁকে পদত্যাগ পত্র দাখিল করতে বলেন। ফজলুল হক বলেন, নিজের দল ও সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার সময় না পেলে তা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু গভর্ণর তাঁকে কোন সময় দিতে চাননি। তখন গভর্ণর একটি টাইপ করা পদত্যাগ পত্র ফজলুল হককে স্বাক্ষর করার জন্য দেন। আর এই কথা বলেন, তিনি যদি এই কাগজে স্বাক্ষর না দেন, তবে তিনি তাঁকে পদচ্যুত করবেন। ফজলুল হক অভিযোগ করেন, এক গভীর ষড়যন্ত্র করে গভর্ণর তাঁকে এই পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করেন। ঐ দিন এই পদত্যাগ পত্র গ্রহণের খবর রাত দশটায় ফজলুল হকের বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়া হয়। ১৯৯৭-এ প্রকাশিত 'Towards Freedom' -এ সংযোজিত নথি-পত্র দেখে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, গভর্ণর সুপরিকল্পিত ভাবে নাজিমুদ্দিনকে ক্ষমতায় বসিয়েছেন। [22] অবশ্য যোগেন বাবুর সঙ্গে মুসলিম লীগের দহরমমহরম (পড়ুন 'গোপন আঁতাত') '৪৩-এর প্রথমেই। ["In February, 1943, I agreed to work with them *(Muslim League)* in the Bengal Legislative Assembly." - said Mr. J. N. Mandal in his R.L., Clause-1]

২৪ এপ্রিল, ১৯৪৩। দিল্লীতে মুসলিম লীগ অধিবেশনে মিঃ জিন্নাহ্ তিন ঘন্টাব্যাপী দীর্ঘ ভাষণে ফজলুল হক, গান্ধীজী ও কংগ্রেসকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন। আর পাকিস্তান রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারিত করে একটি বড় মানচিত্রও এই সভায় টাঙানো হয়। ভারতের মাটিতে এই প্রথম পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের মানচিত্র জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়। [23]

এদিকে ঐ ২৪ এপ্রিল তারিখেই কোলকাতায় ১৩ সদস্য বিশিষ্ট লীগ-মন্ত্রিসভা গঠন করেন মিঃ জিন্নাহ্‌র একান্ত আপন স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন। এই মন্ত্রিসভায় তিনটি আসন লাভ করেন লীগ পন্থী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল* এবং তাঁর অনুগামীরা। তিনটি আসন লাভ করেন স্বঘোষিত বর্ণ হিন্দুরা। আজ কেউ কেউ বলেন সেদিনের ঐ মন্ত্রিসভা ছিল 'কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা'। কিন্তু তৎকালীন বাংলার মুসলিম লীগের সম্পাদক মিঃ আবুল হাশিম এটিকে 'খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সরকার' বলে চিহ্নিত করেছেন। [24] ঐতিহাসিক অমলেন্দু দে বলেন, "সবদিক থেকে একে লীগ মন্ত্রিসভা বলাই সঙ্গত।" [25] সেদিন ২১ জন তফসিলী সদস্য সহ নাজিমুদ্দিনের পক্ষে ছিলেন ১৪০ (১৪১) জন সদস্য এবং বিপক্ষে ছিলেন ১০৮ জন সদস্য। [26] দেখা যাচ্ছে ঐ ২১ জন যোগেন্দ্র অনুগামী বিরোধী শিবিরে যোগ দিলে লীগ তার হিংস্র নখ ও দাঁত নিয়ে বাংলার গদিতে বসতে পারত না। **কারণ সেক্ষেত্রে বিরোধীদের সংখ্যা হত ১২৮ জন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ৮/৯ জন তফসিলী সদস্য যোগেনবাবুকে প্রত্যাখান করে লীগের বিরোধী পক্ষেই ছিলেন।**

লীগের সহযোগী হিসাবে বাংলার লীগ কেবিনেটে তফসিলীরা সেদিন পেয়েছিলেন তিনজন তফসিলী মন্ত্রী — যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল (সমবায় ও ঋণদান), প্রেমহরি বর্মণ (বন ও আবগারী) এবং পুলিন বিহারি মল্লিক (প্রচার)। অতি উৎসাহীরা যাকে বলতেন, এখনও বলছেন, 'তিনটি স্বর্ণ সিংহাসন'। এ ছাড়া পেয়েছিলেন তিনজন পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী আর তফসিলীদের উন্নয়নের জন্য ৫ লক্ষ টাকার বরাদ্দ। সেক্রেটারিত্রয় হচ্ছেন অনুকূল চন্দ্র দাস, রায়বাহাদুর বঙ্কুবিহারী মণ্ডল ও রসিক লাল বিশ্বাস। যে কোন বিচারে এর নাম 'ভিক্ষা'; অধিকার আদায় নয়। তিনজন বর্ণ হিন্দু ঐ মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরাও ধোয়া তুলসী পাতা ছিলেন না। এঁদের অবিমৃষ্যকারিতার ফলেই অপেক্ষাকৃত অসাম্প্রদায়িক শক্তি শেরে বাংলা ফজলুল হকের শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে যায়। এবং গঠিত হয় সারা ভারতের মধ্যে মুসলিম লীগের একমাত্র মন্ত্রিসভা।

লীগ মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ার পর যোগেনবাবু প্রথম যে বড় দু'টি কাজ করলেন তা হচ্ছে ঃ ১৯৪৩-এর মে মাসে 'বঙ্গীয় তফসিলী ফেডারেশন' গঠন করা এবং জুন মাসে 'জাগরণ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৪২ সনে ডঃ আম্বেদকরের নেতৃত্বে 'নিখিল ভারত তফসিলী ফেডারেশন' গঠিত হয়েছিল। তখন

*** ১৯৩৭ সনে তফসিলী ও বর্ণহিন্দু সমাজের যে সব মানুষেরা স্বতন্ত্র প্রার্থী যোগেনবাবুকে ভোট দিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন মুসলিম লীগ বিরোধী। তাঁরা কি ঘুণাক্ষরেও জানতেন যে, মণ্ডল মশাই পরবর্তীকালে চরম সাম্প্রদায়িক মুসলিম্‌ লীগের সহযোগী হিসাবে কাজ করতে যাবেন? তাঁর এ কাজকে ভবিষ্যতের ইতিহাস কিভাবে মূল্যায়ন করবে যোগেন্দ্র অনুগামীরা যেন ভেবে দেখেন — অনুরোধ রইলো।**

যোগেনবাবুর সঙ্গে বাবাসাহেবের পরিচয়ই ছিল না। উভয় নেতার মধ্যে প্রথম পরিচয় ঘটে ১৯৪৩-এর অক্টোবর মাসে।

যোগেনবাবুর পত্রিকা যতটা না নির্যাতিত শ্রেণীর জনগণকে জাগরণের পথ দেখিয়েছে, সঠিক তথ্য প্রকাশ না করে তার চেয়ে মুসলিম লীগের নিপীড়নের সুযোগ করে দিয়েছে অনেক অনেক বেশি। আর একটি বড় মাপের অপকর্মের অংশীদার হয়েছিলেন যোগেনবাবু ও তাঁর সঙ্গীরা অর্থাৎ স্বর্ণ সিংহাসন প্রাপকরা। এঁরা সেদিন প্রায় ১৫ লক্ষ * মানুষের মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী হয়েছিলেন, সেই লীগের খাতায় নিজেদের নাম লিখিয়ে ঐতিহাসিক কু-কীর্তির অংশীদার হয়েছিলেন। হ্যাঁ, আমরা তখনকার 'মনুষ্য সৃষ্ট' ভয়াবহ পঞ্চাশের (বাংলা ১৩৫০) মন্বন্তরের কথা বলছি। ঐ ১৫ লক্ষ হতভাগ্যদের সিংহভাগ ছিলেন বাংলার অতি গরীব তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং গরীব মুসলমান। ঐ সময় খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও সরবরাহের দায়িত্ব পেয়েছিল দুর্নীতিপরায়ন লীগের মহাস্তম্ভ ইস্পাহানি গোষ্ঠী এবং লীগের অন্যান্য পেটোয়া ব্যবসায়ীরা। তাদের মাধ্যমে লীগ বিরাট অঙ্কের টাকা পেয়ে তাদের তহবিলের কলেবর স্ফীত করে নিয়েছিল। একটি হিসাবে বলা হয়েছে ঐ টাকার পরিমাণ ১৫০ কোটি। পাকিস্তান আদায়ের জেহাদে খরচ করার জন্যই এই তহবিল গঠন করা হয়েছিল। লীগের বিচারে '৪৬-এর সাধারণ নির্বাচন ছিল ঐ জেহাদেরই একটি অংশ।

তবে আজ যোগেন্দ্রপন্থীরা এই বলে গর্ব করতে পারেন যে, বিদেশী ইংরেজদের সহায়তায় লীগ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে যত সংখ্যক গরীব মানুষকে খুন করুক না কেন, লীগের সঙ্গে যোগেনবাবুর বোঝাপড়া থাকার জন্যই ঐ সময় নমঃ সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকজন যুবক ফুড ও রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টে চাকুরী পেয়েছিলেন।

বলা যায় মন্ত্রিত্বের লোভেই সেদিন যোগেনবাবু অসাম্প্রদায়িক কৃষক প্রজা সমিতির নেতা শেরে বাংলা ফজলুল হককে সমর্থন না করে তাঁর তফসিলী সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগের হাত শক্ত করেছেন। বাংলার গদিতে সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রবেশের ব্যবস্থা পাকা করেছেন। লীগ বাংলার মাটিতে পা রাখার সুযোগ পেয়ে অর্থ ও কূট-কৌশলের জোরে তিন বছরেই এখানে তার অবস্থান করে তোলে সুদৃঢ় এবং কবি ইকবাল পরিকল্পিত 'মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাস ভূমি' বাস্তবায়িত করার কাজ সুরু করতে পেরেছিল অবাধেই।

১৯৪৫-এর ২৮ মার্চ কৃষি বাজেট পাশ করাতে না পারার জন্য নাজিমুদ্দিন মন্ত্রি সভার পতন ঘটে। তাই ১ বছরের জন্য যোগেনবাবুকে মন্ত্রিত্বের স্বর্ণসিংহাসন হারাতে হয়েছিল। কিন্তু লীগের কৃপায় মন্ত্রিত্বের ঠাট-বাট ও সুযোগ সুবিধা প্রায় পুরোটাই বজায় ছিল। লীগের কাছে তাঁর কদর কমেনি এতটুকু। লীগের হিতাকাঙ্খী বিধায় ইংরেজ সরকারের কৃপাদৃষ্টিও বহাল ছিল।

---

* বাংলার ভূতপূর্ব লাট স্যার জন উডহেড-এর নেতৃত্বে গঠিত ইণ্ডিয়ান ফেমিন কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে।

'৪৬-এর ২৩ মার্চ লণ্ডন থেকে তিন সদস্য বিশিষ্ট কেবিনেট মিশন ভারতে আসে। এই মিশনের প্রধান ছিলেন স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপ্স। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে অখণ্ড ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তরের একটা বাস্তব সম্মত পথ খুঁজে বের করা। তাই এই মিশন ভারতের বিভিন্ন দল, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁরা ডঃ আম্বেদকরের সঙ্গেও আলোচনা করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়েও ব্যক্তি যোগেনবাবুর ভূমিকা ছিল শূন্যের কোঠায়। কারণ তার বিদ্যা বুদ্ধি ও চিন্তা চেতনা নিয়োজিত ছিল মুসলিম লীগের অবিমিশ্র সেবায়।

১৯৪৬-এর সাধারণ নির্বাচন
এবং পুনরায় স্বর্ণসিংহাসন প্রাপ্তি

'আমরা চাই অখণ্ড ভারত।' - কংগ্রেস। আমরা পাকিস্তান আদায় করে নেব; নয়ত ভারতকে ধ্বংস করে দেবো।" — মিঃ জিন্নাহ্। [27]

১৯৪৫-এর ৩১ মার্চ থেকে ৯৩ ধারা অনুসারে বাংলায় গভর্ণরের শাসন চলে। এরই মধ্যে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। বাংলায় এই নির্বাচন হয় থেমে থেমে। জানুয়ারি থেকে ২০ মার্চ ('৪৬) পর্যন্ত। এখানকার মোট ২৫০-টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ১১৩, কংগ্রেস ৮৬, ইউরোপীয় ২৫, স্বতন্ত্র - ১২, অ-লীগ মুসলমান - ৯ (৪জন কৃষক প্রজা পার্টির সদস্য সহ), হিন্দু মহাসভা-১, কমিউনিষ্ট-৩, তফসিলী ফেডারেশন - ১টি আসন* (যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল), জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা অর্থাৎ কংগ্রেস পন্থী মুসলমানরা-০০, এবং র‍্যাডিকাল ডেমোক্রাটিক দল-০০ আসন লাভ করে। (N.N.Mitra's Annual Register, 1946, Vol. I, page-231) শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হকের সমর্থকরা সকলেই মুসলিম লীগে যোগ দেন। ফলে তিনি যে বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন, তা পারলেন না। ফজলুল হক জোরালো আহ্বান জানালেও বাঙালি মুসলমানরা সাড়া দেয়নি।

১৯৪৬-এর নির্বাচনের একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে বাংলায় অখণ্ড

---

* স্বাভাবিক ভাবে ১৯৪৬-এর সাধারণ নির্বাচনে ৩০টি সংরক্ষিত আসনে তফসিলী ফেডারেশনের ৩০ জন প্রার্থী দেবার কথা। কিন্তু ফেডারেশন মাত্র ৫ জন প্রার্থী দিতে পেরেছিল। এরা হচ্ছেন সর্বশ্রী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (বরিশাল), চন্দ্রমাধব সরকার (ঢাকা), উপেন্দ্রনাথ মল্লিক (যশোহর), মনোহর ঢালী ও কামিনী প্রসন্ন মজুমদার (গোপালগঞ্জ)। এঁদের মধ্যে একমাত্র যোগেনবাবুই জয়ী হয়েছিলেন। তাই তিনি একাই '৪৬-এর লীগ মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছিলেন। এর অর্থ তফসিলীদের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ সেদিন যোগেনবাবুর সঙ্গে ছিলেন। মণ্ডল মশাই একাই লীগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরবর্তী আগস্টে কলকাতা ও অক্টোবরে নোয়াখালির নারকীয় হত্যাকাণ্ড সহ লীগের ভাল-মন্দ-ঘৃণ্য যাবতীয় কাজের অংশীদার হয়েছিলেন। অথচ আজ অনেকের দৃষ্টিতে সেদিনের এবং আজকের সমগ্র তফসিলী সমাজ কলঙ্কিত হতে যাচ্ছে। বলা হচ্ছে দেশ ভাগের প্রাক্কালে যোগেনবাবুর নেতৃত্বে তফসিলীরা পাকিস্তান চেয়েছিল। আজ মণ্ডল মশাইর কার্যাবলীর যথাযথ বিশ্লেষণ না করে 'আপামর তফসিলী মানুষেরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন' এমন প্রচার ঐ ভিত্তিহীন দোষারোপকে সত্যি বলে চিহ্নিত করবে না কি?

ভারতের সমর্থক জাতীয়তাবাদী কোন মুসলমান প্রার্থী জয়লাভ করেননি। অধিকন্তু তাঁদের প্রায় সকলের জামানত পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। সমগ্র ভারতে মাত্র ১৬ জন 'অখণ্ড ভারতের সমর্থক' মুসলমান অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী মুসলমান জয়লাভ করেন। পক্ষান্তরে 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' এবং 'মারকে লেঙ্গে পাকিস্তান' শ্লোগানের উদ্গাতা মুসলিম লীগের ১১৩ জন জিতেছিলেন বাংলা থেকে এবং সমগ্র ভারতে জিতেছেন ৪২৫ জন। গান্ধীজী পরিকল্পিত হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সম্ভাবনা বিলীন হয়ে গেল।

মুসলিম লীগের শহিদ সরোয়ার্দি বাংলার মন্ত্রিসভা গঠন করেন ২৪ এপ্রিল, ১৯৪৬। এই মন্ত্রিসভায় যোগেনবাবুকেও নেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৩-এ যোগেনবাবুকে নেওয়া হয়েছিল মেজরিটির প্রয়োজনে, ষড়যন্ত্রের শরিক হিসাবে। এবারে ব্যাপারটা সম্ভবত একটু অন্যরকম। কোন কোন রাজনৈতিক মহলের মতে '৪৩-এ মুসলিম লীগকে বাংলার ক্ষমতায় এনে দেওয়ার পুরস্কার হিসেবে এবং তফসিলীদের সঙ্গে পাওয়ার লক্ষ্যে যোগেনবাবুকে নিয়েছিল লীগ। লীগের পরিবর্তে হক সাহেব ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলে বাংলায় পাকিস্তানের দাবি প্রসার লাভ করতে পারতো না। মুসলিম লীগও মেজরিটির অবস্থানে যেতে পারতো না। এবং পরিণামে পাকিস্তান হওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়তো। এই সময় যোগেনবাবুর ভূমিকাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সমীক্ষকরা তাঁকে 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তানী' বলে পরিহাস করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

"মুসলিম লীগ একমাত্র বাংলায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পাঞ্জাব, বেলুচিস্তানে ও সীমান্তে লীগ হেরে যায় এবং একমাত্র সিন্ধু প্রদেশে এক ভোটে মুসলিম লীগ এগিয়ে ছিল। পশ্চিম অঞ্চলে মুসলিম লীগ পাকিস্তানের দাবিতে একক ভাবে জয়লাভ করতে পারেনি। বাংলার ভোট দিয়ে পাকিস্তান অর্জিত হয়েছিল। অথচ পাকিস্তানের সুযোগ সুবিধা ভোগ করছিল পশ্চিম পাকিস্তান।" [28]

১৯৩৭ সনের নির্বাচনের যোগেনবাবু আর ১৯৪৬ সনের নির্বাচনের যোগেনবাবুর মধ্যে রাজনৈতিক পার্থক্য অনেক। '৩৭ এর নির্বাচনে কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ কর্মীরাই উঠতি এ্যাডভোকেট যোগেন মণ্ডলকে বরিশাল সদর নির্বাচনী এলাকা থেকে নাম ডাকের জমিদার সরল দত্তের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়যুক্ত করিয়েছিলেন। তার নিজ গ্রাম মৈস্তারকান্দি ও থানা গৌরনদীও ছিল ঐ সাধারণ নির্বাচনী এলাকার অন্তর্গত।

কিন্তু '৩৭ থেকে '৪৬ — এই দশ বছরের রাজনৈতিক হাওয়া অন্য খাতে বইতে সুরু করেছে। '৪৩ সনে কংগ্রেস ও কৃষক প্রজা পার্টির বিরুদ্ধে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে মুসলিম লীগকে বাংলার ক্ষমতায় বসিয়ে সন্ত্রাসী মৌলবাদকে প্রশ্রয় দেওয়ায় কংগ্রেসী ভোটাররা এবার মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন — এ ব্যাপারটি অনেকাংশেই বুঝতে পেরেছিলেন যোগেনবাবু। তাই '৪৬ এর নির্বাচনে তিনি কিন্তু কেবল মাত্র তাঁর আগের নিজ নির্বাচনী এলাকার জেনারেল সীটে দাঁড়াতে ভরসা পেলেন না। ফলে তাকে প্রার্থী হওয়ার জন্য খুঁজতে হয়েছে অন্য কোন এলাকার একটি রিজার্ভ সীট।

পাশেই রিজার্ভ সীট পিরোজপুর নির্বাচনী এলাকা [Bakerganj, South-West, Constituency No. 72]। ঐ এলাকার তফসিলী নেতৃবৃন্দ তাদের প্রার্থীদের সম্ভাব্য প্রাথমিক তালিকা তৈরীর জন্য সভায় বসেন পিরোজপুর আদর্শ হিন্দু বিদ্যালয়ে। এটি ডাবল সীটেড্ নির্বাচনী কেন্দ্র। দু'টো সীটের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য যে দু'জন প্রার্থীর নাম ঐ তালিকায় স্থান পায়, তারা হলেন এ্যাডভোকেট ললিত কুমার বল ও এ্যাডভোকেট উপেন্দ্র নাথ এদবর।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা গেছে, সভা যখন ভাঙ্গার মুখে তখন হঠাৎ সেখানে ঢুকে পড়েন মুসলিম লীগের কৃপাধন্য যোগেনবাবু ও তাঁর সঙ্গী 'লড়া' গ্রামের (নাজিরপুর থানার অন্তর্গত) মাতব্বর মাধব বাগচী। ওনাদের দেখেই সভা হয়ে ওঠে উত্তপ্ত। মাধববাবু অনুরোধ জানালেন 'ঐ তালিকায় যোগেনবাবুর নামটাও রাখা হোক'। সভার লোকজন যোগেনবাবুকে দেখে ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। নানা কথা বলাবলি চলতে থাকে। এর মধ্যে একজন একটি অশোভন উক্তিও করলেন, যা আমরা এখানে উহ্য রাখছি। উত্তরে মাধববাবু হাত জোড় করে অনুরোধ করে বললেন, ওনার মন্ত্রিত্বের অভিজ্ঞতা আছে, লীগের বিশ্বস্ত উনি। ওনার নামটা যখন প্রস্তাব হয়েছে তখন না রাখলে ওনাকে অপমান করা হবে। কিন্তু না, তাতেও কারও মন গলেনি। যোগেনবাবুকে এক রকম মাথা নত করেই ফিরে যেতে হল। ঐ সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন এম. এল. সি. এ্যাডভোকেট রায়সাহেব ললিত কুমার বল, প্রাক্তন এম. এল. এ. এ্যাডভোকেট উপেন্দ্র নাথ এদবর, কামিনী কুমার সমদ্দার, আমরাজুড়ি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হেমন্ত কুমার মৃধা, মোক্তার শরৎ চন্দ্র মৃধা, মোক্তার যামিনী কান্ত মণ্ডল ও ছাত্র যুব নেতা চিত্তরঞ্জন সুতার। এ ছাড়া নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধি স্থানীয় আরও অনেক নেতৃবৃন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

যোগেনবাবু এখানে অপমানিত হলেও পরবর্তী সময় নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়তে না পড়তেই দেখা গেল তিনি লীগের কৃপায় এই সীট থেকেই প্রার্থী হয়েছেন। তারপর ঐ সাম্প্রদায়িক শক্তির আশীর্বাদে সুরু হল বঙ্কিম চন্দ্রের সেই 'মুদ্রা দেবীর' খেলা। ক্ষুব্ধ যোগেনবাবু তফসিলীদের মন জয় করার লক্ষ্যে তাঁবু গাড়লেন বরিশাল সার্কিট হাউসে। বহু লোক থাকা খাওয়া করতে পারে এমন একটা 'পানসি নৌকা' ভাসিয়ে রাখা হল কীর্তন খোলা নদীর জলে। হোটেল খোলা হল ঐ পানসিতে। যে-ই আসুক না কেন তার জন্য হোটেলের দরজা খোলা।

সেদিন তফসিলী সমাজের মানুষের কাছে মন্ত্রী হওয়া ছিল একটা ভয়ঙ্কর ধরনের গৌরবের ব্যাপার। তারপর যদি তাঁর কোন অনুগ্রহ পায় তো মন্ত্রীর চার ধারে ভিড় জমাবার লোকের অভাব হতো না মোটেও। যোগেনবাবু তখন মন্ত্রী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর চলন-বলন দেখে সাধারণ মানুষ বুঝতেই পারতেন না যে উনি মন্ত্রী নন। যোগেনবাবু বিভিন্ন এলাকার মাতব্বর ও যুব কর্মীদের ডাকালেন। কথা বললেন একান্তে। শুনলেন এলাকার বিভিন্ন অভাব অভিযোগের কথা — রাস্তা, পুল, স্কুল পাঠশালার দুরবস্থার কথা। প্রতিশ্রুতি

দিলেন সব অভাব অভিযোগ দূর করে দেবেন। প্রতিশ্রুতি পেয়ে সবাই নির্বাচনের কাজে লেগে যান হাসি মুখে। অপর প্রার্থী রায়সাহেব ললিত কুমার বল মহাশয়কেও নিজের দলে টানতে পেরেছিলেন অল্প আয়াসেই। তাঁকে আশ্বাস দেওয়া হল কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক আইন সভায় সদস্য করে নেবেন নমিনেশন কোটায়। তাছাড়া নির্বাচনের প্রস্তুতিকালীন সময়ে তাঁর ওকালতিতে যে আয় হবে বলে মনে করা যায়, সে অঙ্কটাও তাঁকে দিয়ে দেওয়া হবে নগদে। বিনা খরচে আইন সভার মেম্বার হওয়ার আশা এবং ওকালতি না করেও সম্ভাব্য আয়ের নিশ্চয়তা পেয়ে ভদ্রলোক ওকালতি বন্ধ করে যোগেনবাবুর পক্ষে নির্বাচনী কাজে লেগে যান পুরোদমে।

তফসিলী প্রার্থীদের মধ্যে একমাত্র যোগেনবাবুর সৌভাগ্য হয়েছিল মাইক লাগানো মোটর লঞ্চে চড়ে খাল-বিল পরিপূর্ণ বরিশালের গ্রামে গ্রামে গিয়ে নির্বাচনী প্রচার চালানোর। এর ফলে সাধারণ জনগণের কাছে ওনার গুরুত্ব অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল।

ঐ সময় সাধারণত তারিখ ও সময় দিয়ে নির্বাচনী সভা হত না। অন্য কোন প্রার্থীর মাইক ছিল না। তাঁদের কর্মীরা চোঙ্গা ফুঁকে ফুঁকে প্রচার চালাতো হাটে হাটে। তা ছাড়া যেখানে যখন জনসমাগম হত (যেমন শ্রাদ্ধের বাড়ী, বিয়ে বাড়ী), নেতা-কর্মীরা সেখানে উপস্থিত হয়ে নিজ নিজ প্রার্থীর পক্ষে প্রচার করতেন।

সেদিন সাধারণ জনমানসে রাজনৈতিক চিন্তার ভিত আজকের মত শক্ত হয়ে ওঠেনি। ফলে দু'দিন আগে যাঁরা প্রকাশের অযোগ্য ভাষায় গালাগাল দিয়েছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই যোগেনবাবুর নির্বাচনের সর্বক্ষণিক কর্মী হয়ে যান। বিভিন্ন এলাকায় তাঁর কিছু সংখ্যক পেটোয়া লোক ছিল। তারা এসে নিজ নিজ এলাকার বিভিন্ন অভাব অভিযোগের কথা জানাত। মন্ত্রী মহাশয় নিজে বা তাঁর প্রতিনিধি গিয়ে তা অবশ্য পূরণের প্রতিশ্রুতি দিতেন মুক্ত কণ্ঠে। এভাবে মন্ত্রীর লাগামহীন প্রতিশ্রুতির জোরে এবং মুদ্রা দেবীর প্রভাবে যোগেনবাবু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী উপেন এদবর মহাশয়কে হারিয়ে পার হয়ে গেলেন নির্বাচনী বৈতরণী।

তখনকার দিনে সাধারণ মানুষ একজন মন্ত্রীকে মন-প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতেন। কোন মন্ত্রী মিথ্যা কথা বলতে পারেন বা ভাঁওতা দিতে পারেন, তা তাঁরা ভাবতেই পারতেন না। যোগেনবাবুর এলাকার অনেক মানুষই বিশ্বাস করতেন যে, মণ্ডল মশাই আবার মন্ত্রী হয়ে তাঁর আগের প্রতিশ্রুত কাজ অবশ্যই করে দেবেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রায় কোন নেতাই যে তা রক্ষা করেন না এ কথা সমাজের সাধারণ মানুষেরা চিন্তার মধ্যেই আনতেন না। এই সব লোকদের ভোটে নির্বাচিত হবার কাজটি মিটে যাওয়ার পর কিন্তু নেতাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো থেকে যায় চাবি হারিয়ে যাওয়া সিন্দুকে আবদ্ধ প্রতিশ্রুতিতেই।

১৯৪৬-এর সাধারণ নির্বাচনের অন্যতম প্রার্থী রায়সাহেব ললিত কুমার বল মহাশয়কে যোগেনবাবু যখন নিজের দলে নিতে পারলেন, তখন যোগেনবাবুর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে একবার রায়সাহেব বরিশাল জিলার (বর্তমানে পিরোজপুর জিলা) স্বরূপকাঠী থানার চাঁদকাঠী-

বাটনাতলা এলাকায় গেলেন। ওখানে গিয়ে ব্যাপক 'মণ্ডল বিরোধী' বক্তব্য শুনলেন। এর মধ্যেই রায়সাহেব স্থানীয় সমস্যার কথা জানতে চাইলেন। ওখানকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা কেউ কেউ অনেক সমস্যার কথা তুলে ধরলেন রায়সাহেবের কাছে। তার মধ্যে একটি ছিল এই — বাটনাতলা উচ্চবিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি বিদ্যালয়ের স্থায়ী স্বীকৃতি (Permanent Recognition) পাবার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত করতে চেয়েছিলেন। দরখাস্তের সঙ্গে নগদে তিন হাজার টাকা জমা দিতে হত তখন। কিন্তু কমিটীর ১৫০০ টাকার অভাব ছিল। রায়সাহেব ললিতবাবু বললেন, নির্বাচনে জিতে এলে যোগেনবাবু এই টাকার ব্যবস্থা করে দেবেন। এই আশ্বাস পেয়ে এলাকার মানুষেরা সোৎসাহে যোগেনবাবুকে ভোট দিয়েছেন।

নির্বাচন হয়ে গেল। যোগেনবাবু জিতলেন। নতুন করে মন্ত্রীও হলেন সরোয়ার্দি সাহেবের কেবিনেটে। কিন্তু ঐ টাকার ব্যাপারে উনি নীরব। স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রদ্ধেয় ভূপেন্দ্র নাথ সিকদার মহাশয় ভাবলেন কাজের ব্যস্ততার জন্য মন্ত্রী মহোদয় হয়ত কথাটা ভুলে গেছেন। তাই একটি চিঠি লিখে স্থানীয় যুব নেতা কোলকাতার স্কটিস চার্চ কলেজের ছাত্র শ্রীচিত্তরঞ্জন সুতার মহাশয়কে কোলকাতা পাঠালেন যোগেনবাবুর কাছে। চিঠি নিয়ে চিত্তবাবু যেদিন যোগেনবাবুর সংগে দেখা করলেন তার দু'দিন আগেই খবর এসেছে যে, তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্য (মন্ত্রী) হয়েছেন। চিঠি পড়ে রাগত ভাবে চিত্তবাবুকে বললেন - 'দেখ, আমি এখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। সারা ভারতে আমাকে ঘুরতে হবে। কাজ অনেক অনেক বেড়ে গেল। তাছাড়া হিন্দী শিখতে হবে। এখন কার গরু মারা গেল বা মুরগী পালিয়ে গেল তা দেখার সময় আমার নেই।' গত ১৫.১০.'০২ তারিখে এক টেলিফোন সাক্ষাতকারে ঘটনাটি জানালেন দীর্ঘ দিনের সংগ্রামী রাজনীতিবিদ বয়োবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন সুতার মহাশয়। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন শ্রী দেবজ্যোতি রায়।

এখানে আর একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। রায় সাহেব ললিত কুমার বল মহাশয়কে পরবর্তীকালে বলতে শোনা গেছে, 'আমাকে আইন সভায় সদস্য পদে মনোনয়ন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি যে ফাঁকা বুলি ছিল তা আদৌ বুঝতে পারিনি। আমরা উকিলরা মানুষের নাক চোখ মুখের ভাষা দেখে বুঝতে পারি লোকটা মিথ্যা বলে না সত্য বলে। কিন্তু যোগেনবাবুর নাক চোখ মুখ দেখে আদৌ বোঝার উপায় নেই যে ঐ আশ্বাস ছিল ফাঁকা বুলি মাত্র।' এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, এই ললিতবাবু ১৯৭১-এ ইয়াহিয়া বাহিনীর হাতে খুন হন। মৃত্যুর আগে তিনি কাকুতি মিনতি করে প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিলেন এই বলে যে তিনি বরাবর মুসলিম লীগের সমর্থক ছিলেন; পাকিস্তান অর্জনে তাঁর দান আছে। উত্তরে শুধু বুলেট নয়, তিনি বেয়নেটও পেয়েছিলেন। প্রথমে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষত বিক্ষত করে পরে বুলেট মেরে খুন করেছিল যোগেনবাবু কথিত পবিত্র ভূমির সেনারা।

* * *

লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও কোলকাতায় নারকীয় দাঙ্গা

"হে মুসলমানগণ, একবার ভেবে দেখো আজ আমরা কাফেরদের অধীন। কাফেরদের ভালবাসার পরিণাম ভাল নয়। হে কাফেরগণ! সুখ বা গর্ব অনুভব কর না। তোমাদের শেষ বিচার বেশি দূরে নয়। সার্বিক ধ্বংস ঘনিয়ে আসছে। আমাদের হাতের তরবারির দ্বারা জয়ের বিশেষ শিরোপা অর্জন করব।" — মুসলিম লীগ।

'সুযোগ এলে অবশ্যই অমুসলমানদের রক্ত ঝরানো হবে।'

— মিঃ আবদুর রব নিস্তার। [29]

"বাংলার তফসিলী জাতি ফেডারেশন কোলকাতা জিলা মুসলিম লীগের ঘোষিত কার্যক্রমে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত লইয়াছে।" — বাংলা তফঃ জাতি ফেডারেশন।

মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশ পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশে ১৯৪৬-এর নির্বাচনে ব্যর্থ মুসলিম লীগ নেতা মিঃ জিন্নাহ্ বুঝতে পারলেন যে, নির্বাচনে জয়ী হওয়া এবং হিন্দুদের সঙ্গে যুক্তি-তর্কে জেতা, দু'টোই খুব কঠিন কাজ। তাই ঐ বছর ১৬ আগষ্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালনের ডাক দেন। '৪৬-এর ২৭-২৯ জুলাই বোম্বেতে অনুষ্ঠিত সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগের সভায় দু'টো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর দ্বিতীয়টিতে বলা হয়, 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ কাউন্সিল গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বিশ্বাস করে যে, পাকিস্তান অর্জনের লক্ষ্যে, বৃটিশদের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার তাগিদে এবং ভবিষ্যতে বর্ণ হিন্দুদের দমনমূলক শাসন থেকে অব্যাহতি পেতে মুসলমানদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামার সময় এসে গেছে। এই কাউন্সিল সমগ্র মুসলিম সমাজকে আহ্বান জানাচ্ছে যে, তারা যেন তাদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক সর্বোচ্চ সংগঠন সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের পক্ষে এসে দাঁড়ান এবং সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকেন।' [30]

কাউন্সিল ওয়ার্কিং কমিটীকে এই মর্মে নির্দেশ দিচ্ছে যে, তারা যেন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য উপরোক্ত নীতিমালার আলোকে একটি কার্যক্রম তৈরী করে এবং যখনই প্রয়োজন হবে তখনই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য মুসলিমদের সংগঠিত করে।' [31] লীগের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব দিল্লী থেকে তাদের কাজ কর্ম পরিচালনা করত এবং দিল্লী থেকেই দেশের সর্বত্র প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রচার চালাত। [32]

লীগ অনেক হিসেব-নিকেশ করে দেখল যে, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু করার সর্বোৎকৃষ্ট জায়গা হচ্ছে বাংলা। কারণ এখানকার শতকরা ৫৪.৩ জন মুসলমান। প্রিমিয়ার হচ্ছেন মিঃ

সরোয়ার্দি। দাঙ্গা করার প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে তার। 'সুরাবর্দি ১৯২৬-এ শ্বশুর মহাশয়ের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্য কলকাতায় দাঙ্গা বাধিয়েছিলেন, ... কলকাতার নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্র বেকার মুসলমান, পশ্চিমা মুসলমান, সমাজবিরোধী মুসলমান, সরকারী পুলিশ তো তাঁর হাতে ফ্রাঙ্কেস্টাইনের দৈত্য।' ('স্বাধীনতা সংগ্রামে....', অমলেশ ত্রিপাঠী, পৃ-৪৪২)।

তাই বাংলার কোলকাতাকেই বেছে নেওয়া হল। তখন রমযান মাস চলছিল। ১৬ তারিখ ছিল শুক্রবার। মুসলমানদের কাছে অতি পবিত্র দিন। এই পবিত্র দিনেই সুরু হবে পাকিস্তান আদায়ের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। এই উপলক্ষে লীগ সরকার যে আমন্ত্রণ-পত্র বিলি করে তাতে দিনটিকে 'মুক্তি দিবস' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। যোগেনবাবু ছিলেন সেদিনের ঐ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর অংশীদার। মুসলিম লীগের একান্ত আপনজন হিসেবে যোগেনবাবু ময়দানের সভা-মঞ্চে উপস্থিত থেকে তাদের আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছিলেন। এখানেই থামেননি, লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলা তফসিলী ফেডারেশনের সভাপতি হিসাবে মন্ত্রী যোগেনবাবু আনুষ্ঠানিক ভাবে ঐ প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে সমর্থন করলেন। একটি চিঠি দিয়ে কোলকাতা জিলা মুসলিম লীগের সেক্রেটারী মিঃ এস্. এম্. ওসমানকে জানালেন —

"যেহেতু মুসলিমদের প্রতি বৃটিশ সরকারের ভ্রান্ত নীতি ও নিদারুণ ভাবে বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ তার প্রতিবাদের নিদর্শন স্বরূপ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সিদ্ধান্ত লইয়াছে, সেহেতু ভারতের তফসিলী জাতি সমূহ ও অন্যান্য সংখ্যালঘুরা ১৬ আগষ্ট শুক্রবার 'সারা ভারত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত লইয়াছে এবং বাংলার তফসিলী জাতি ফেডারেশন কোলকাতা জিলা মুসলিম লীগের ঘোষিত কার্যক্রমে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত লইয়াছে।" [33]

যোগেনবাবুর লেখা এই চিঠি পড়লে মনে হয় সমগ্র ভারতের তফসিলী এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুরাও লীগের ঘোষিত ১৬ আগস্টের কার্যক্রমের অনুরূপ ঐ তারিখে 'সর্বভারতীয় ভাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আসলে তেমন কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কি? কোন প্রমাণ দিতে পারবেন কেউ? তাছাড়া ড. আম্বেদকরের অনুমতি নিয়ে কি বাংলা তফসিলী ফেডারেশন কোলকাতা জিলা মুসলিম লীগের ঘোষিত কার্যক্রমে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কি? বাবাসাহেব এই ধরনের অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন না। কারণ, বাবাসাহেব বরাবরই বলে এসেছেন যে, মুসলমানদের রাজনীতির সঙ্গে দলবদ্ধ গুন্ডামী ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত। ["The third thing that is noticeable is the adoption by the Muslims of the gangster's method in politics." -- Dr. Ambedkar, Vol. 8, page-269]

২৯ জুলাই থেকেই লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তুতি সুরু হয়ে যায়। এই প্রস্তুতির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন পাঞ্জাব হাই কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীগোপাল দাস খোসলা তাঁর 'স্টার্ণ রিকনিং'-এর ৪১ থেকে ৮৬ নং পৃষ্ঠায়। এ ছাড়া ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ তাঁর

'শ্যামাপ্রসাদ ঃ বঙ্গবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ' শীর্ষক গ্রন্থে (পৃঃ ৮৫-১৩৯) কোলকাতার নারকীয় দাঙ্গার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে আমরা নির্ভরযোগ্য ঐ দু'খানা গ্রন্থ থেকে লীগের প্রস্তুতির খানিকটা উল্লেখ করছি। 'আমরা নিয়মতান্ত্রিক পন্থা-পদ্ধতি পরিহার করছি। আমাদের হাতে পিস্তল আছে এবং তা ব্যবহার করব।' সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, **প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন "আমি নীতি শাস্ত্র আলোচনা করতে যাচ্ছি না"**। এই ধরনের ধ্বংসাত্মক মনোভাব নিয়েই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন লীগের সর্বাধিনায়ক মিঃ জিন্নাহ্। খাজা নাজিমুদ্দিন বললেন, 'আমরা যখন অহিংসায় বিশ্বাস করি না তখন একশ' পথে যন্ত্রণা সৃষ্টি করতে পারছি। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বলতে কি বুঝায় তা বাংলার মুসলমানরা খুব ভালভাবেই জানেন।' লিয়াকত আলি খান বলেছিলেন, "**প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বলতে বুঝায় আইন ভেঙ্গে যে কোন কাজ করা।**"

৪ আগস্ট কোলকাতা, হাওড়া, হুগলী, মেটিয়াবুরুজ এবং ২৪ পরগনার লীগ নেতাদের ডেকে ১৬ তারিখের কর্মসূচীর চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয় এবং সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে তা মুসলিম সংবাদ মাধ্যমের সাহায্যে প্রচার করা হয়। কোলকাতার মেয়র তথা লীগ সম্পাদক এস. এম. ওসমানের নামে অনেকগুলি প্রচারপত্র ছেপে বিলি করা হয়।

একটি প্রচারপত্রে বলা হয় — "মুসলমানদের অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে এমন এক রমযান মাসেই কোরান নাযেল হয়েছিল। এমন এক রমযান মাসেই খোদা 'জেহাদ' করার অনুমতি দেন। এক রমযান মাসেই বদরের যুদ্ধ হয়েছিল। এটিই মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে প্রথম প্রকাশ্য যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জন মুসলমান নিয়ে মহানবী জয়লাভ করেছিলেন। আবার এমন এক রমযান মাসেই পবিত্র মহানবী ১০,০০০ মুসলমান নিয়ে মক্কা জয় করে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করেছিলেন; স্থাপন করেছিলেন মুসলিম কমনওয়েল্থ। মুসলিম লীগের সৌভাগ্য যে, এমন একটি পবিত্র মাসেই তারা সংগ্রাম শুরু করেছে।"

'জেহাদের জন্য প্রার্থনা' এই শিরোনামে অন্য একটি প্রচারপত্রে উপরোক্ত বক্তব্যের সঙ্গে আরও বলা হয় - "খোদার দয়ায় ভারতে আজ মুসলমানদের সংখ্যা ১০ কোটি। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমরা আজ হিন্দু ও ব্রিটিশদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছি। হে মহান খোদা, আমরা এই রমযান মাসেই জেহাদ সুরু করছি। কসম খেয়ে বলছি - আমরা তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল; দেহে এবং মনে আমাদের শক্তিশালী কর; আমাদের সকল কাজে তুমি সাহায্য কর। কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয়ী কর, ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপন করার সামর্থ দাও এবং জেহাদের জন্য প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা দাও। খোদার দয়ায় পৃথিবীর মধ্যে আমরা যেন **ভারতকে সবচেয়ে বড় মুসলিম সাম্রাজ্যে পরিণত করতে পারি।**"

আর একটি প্রচারপত্রে ভাল, মন্দ, চোর, গুন্ডা-বদমায়েসদেরও জেহাদে অংশ গ্রহণ করে স্বর্গে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয় এই ভাষায় — "যারা চোর, গুন্ডা, চরিত্র বলে বলীয়ান নয়, যারা নামাজ পড়ে না — তারাও এসো। স্বর্গের আলোকজ্জ্বল দরজা তোমাদের

জন্যও খোলা আছে। এসো আমরা হাজারে হাজারে সেখানে প্রবেশ করি। এসো পাকিস্তান আদায়ের জন্য, মুসলিম জাতির জয়ের জন্য এবং যে সব সেনারা জেহাদ শুরু করেছে তাদেরকে জয়ী করার জন্য চীৎকার করে মোনাজাত (প্রার্থনা) করি।"

তরবারি হাতে মিঃ জিন্নাহ্‌র ছবিসহ একটি প্রচার পত্র বিলি করা হয়েছিল। এই প্রচার পত্রে জিন্নাহ্ সাহেব যেন বলছেন — "স্বর্গেও ইসলামের তরবারি সূর্যকিরণের ন্যায় জ্বলজ্বল করবে এবং সব অশুভ পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে দেবে। আমরা মুসলমানরা রাজমুকুট পরে দেশ শাসন করেছি। উৎসাহ হারিও না। প্রস্তুত হও এবং হাতে অস্ত্র তুলে নাও। হে মুসলমানগণ, একবার ভেবে দেখো আজ আমরা কাফেরদের অধীন। কাফেরদের ভালবাসার পরিণাম ভাল নয়। হে কাফেরগণ! সুখ বা গর্ব অনুভব কর না। তোমাদের শেষ বিচার বেশি দূরে নয়। সার্বিক ধ্বংস ঘনিয়ে আসছে। আমাদের হাতের তরবারির দ্বারা জয়ের বিশেষ শিরোপা অর্জন করব।"

এর মধ্যে গোপন কোন ব্যাপার ছিল না। সবই ছিল প্রকাশ্য প্রচার। এ সব জেনে শুনেও যোগেনবাবু লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে সমর্থন করলেন লিখিত ঘোষণার মাধ্যমে। কারণ সম্ভবত এই, তিনি সেদিন বুঝতে পারেননি যে, তফসিলী হলেও তিনি কাফের এবং সূর্যালোকে আলোকিত ইসলামী বেহেশতে তাঁর বা কোন হিন্দুরই স্থান হবে না। তিনি সেদিন এ সব চিন্তা-ভাবনা না করেই লীগের কাজের সঙ্গে এমনভাবে একাত্ম হয়ে গেছিলেন যে দীর্ঘদিন তিনি বাবাসাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেননি।

যাক, ১৬ আগস্ট ময়দানের সভা শেষ হতে না হতেই সুরু হয়ে যায় দাঙ্গা। তিন দিন ধরে কলকাতার বুকে চলে হিন্দু ও শিখ হত্যা। পৃথিবী অবাক হয়ে দেখলো বিরাট হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ কোলকাতার সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানেরা অবাধে চালাচ্ছে হত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও নারী ধর্ষণ। অবশ্য তিন দিন পরে হিন্দুরাও কিছুটা প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। ইতিহাস ইতিমধ্যেই এই নারকীয় ঘটনাকে 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' বলে চিহ্নিত করেছে। সেদিন নিহত হয়েছিলেন পাঁচ থেকে ছ'হাজার নিরপরাধ মানুষ। লর্ড ওয়াভেল বলেছেন, পলাশীর যুদ্ধে যত লোকের মৃত্যু হয়েছে তার চেয়ে বেশি সংখ্যক লোকের মৃত্যু হয়েছে কোলকাতার দাঙ্গায়।[34] শহিদ সরোয়ার্দীর সুচতুর নেতৃত্বেই এ অঘটন সেদিন সম্ভব হয়েছিল। এ সময় পুলিশ প্রশাসনকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছিল। দরকার হয়ে পড়েছিল কলকাতার পুলিশ প্রশাসনের আমূল রদবদল। আর সরোয়ার্দী মার্কা ঐ চরম সাম্প্রদায়িক অশুভ শক্তির অনুগত সমর্থক ছিলেন দূরদর্শী (!!) মিঃ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, আজ যাকে 'মহাপ্রাণ' বলে প্রচার করা হচ্ছে এবং 'মহাত্মা' বলে প্রচার করতে না পারার জন্য অনুশোচনা করা হচ্ছে। আর এই অনুশোচনা করছেন 'মার্কস্‌বাদী' অভিধাযুক্ত একজন মন্ত্রী। তাঁর কাছে আমাদের প্রশ্ন — এই সময় যোগেনবাবু যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তার মধ্যে আমাদের অধিকার আদায়ের বিন্দু বা বিসর্গ-ব কিছু মাত্র যোগ আছে কি?

সুচতুর শহিদ সাহেব আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। ১৬ আগষ্ট শুক্রবারকে তিনি সরকারী ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করেন। তিনিই রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁর নির্দেশে কোলকাতার ২৪-টি থানার সবক'টি থেকেই হিন্দু পুলিশ অফিসার সরিয়ে তাদের জায়গায় বাইশটিতে মুসলমান অফিসার এবং দু'টিতে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান অফিসার নিয়োগ করা হয়েছিল। [35]

১৬ আগষ্ট সাধারণ ছুটির দিন ঘোষণা করার বিরুদ্ধে আলোচনার জন্য আইন সভার নিম্ন কক্ষে কংগ্রেসের ডেপুটি লিডার মিঃ ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের আনীত মুলতুবি প্রস্তাব ১১ আগষ্ট স্পীকার আলোচনা করতে দিতে অস্বীকার করায় অনেক বাকবিতণ্ডা হয় এবং প্রতিবাদে কংগ্রেস সভাকক্ষ ত্যাগ করে।

অযৌক্তিক ছুটি ও সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে ১৫ আগষ্ট আলোচনার দাবি করে বাংলার আইন সভার উচ্চ কক্ষে মুলতুরি প্রস্তাব উত্থাপন করেন বিধায়ক শ্রীহরিদাস মজুমদার (রায়েরকাঠী, বরিশাল, বর্তমানে পিরোজপুর জিলা)। কিন্তু এই প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত ৩১/১৩ ভোটে হেরে যায়। [36]

উত্তরে মিঃ সরোয়ার্দি সাহেব অত্যন্ত ভাল মানুষটির মত বললেন, "সংঘর্ষ যাতে না হয় তার জন্য তিনি ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সকল শ্রেণীর মনুষের সহযোগিতা কামনা করছেন।" [37]

কিন্তু এই সহযোগিতা চাওয়ার অন্তরালে যে গণহত্যার মত একটা রক্ত-ঝরা বর্বরতা লুকিয়ে ছিল তা হিন্দুরা তখনও অতটা বুঝতে পারেননি। তাঁদের ধারণা ছিল বরাবরের মত একটা হরতাল হবে এবং হরতাল সর্বাত্মক হলে মুসলিম লীগের পাকিস্তান পাওয়ার দাবি একটা বড় প্রচার পেয়ে যাবে। এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।

আর বুঝতে না পারার প্রধান কারণ হল অমুসলমাদের প্রতারণার লক্ষ্যে হরতাল পালনকারীদের প্রতি ৮ আগষ্ট প্রিমিয়ার শহিদ সরোয়ার্দির এক আপাতভদ্র ঘোষণা।

ঐ ঘোষণায় বলা হয়েছে, "সকল বিক্ষোভ, শোভাযাত্রা, প্রতিবাদ, দোকানপাট বন্ধ করণ, হরতাল পালন, ইত্যাদি সকল কাজ সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে করা হইবে। কোন রকমের হিংসার আশ্রয় নেওয়া হইবে না, অথবা কাহারও উপর কোনরূপ জুলুম করা হইবে না। .... আমাদের অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ন হইতে হইবে। পৃথিবীকে আমরা দেখাইতে চাই যে, আমরা আমাদের কাজ সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ভাবে করিতে পারি এবং আমাদের নিজেদের উপর আমাদের পর্যাপ্ত দখল আছে।" [38]

শহরে সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল, কিন্তু তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছিল পুলিশ কেন্দ্রগুলোতে। এদের রাখা হয়েছিল হত্যালীলা থামাতে নয়, প্রতি আক্রমণ বন্ধ করার লক্ষ্যে। রাত ৯ টা থেকে ভোর ৫ টা পর্যন্ত কারফিউও জারি করা হয়েছিল। [39] আবুল কালাম আযাদ জানাচ্ছেন 'সমগ্র কোলকাতা শহরে যখন নারী পুরুষ খুন হচ্ছিল তখন পুলিশ ও মিলিটারি নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল। [40]

শ্রীদেবজ্যোতি রায় লিখেছেন — "মিঃ জিন্নাহ্‌র নির্দেশে মিঃ সোহরাওয়ার্দি কোলকাতায় নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালালেন। কিভাবে এই হত্যাকাণ্ড চালাতে হবে তার গোপন নির্দেশ দিয়ে মিঃ জিন্নাহ্ গান্ধীজীকে আলোচনার অছিলায় ব্যস্ত রেখেছিলেন।" ('কেন উদ্বাস্তু হতে হল', পৃষ্ঠা-৩২) পাকিস্তানের বর্তমান শাসকরা একই কৌ শল অবলম্বন করছেন এখনও। ঐ গোপন নির্দেশ এরূপ —

১) ভারতের প্রত্যেকটি মুসলমান পাকিস্তান আদায়ের দাবিতে মৃত্যু বরণ করবে।

২) পাকিস্তান আদায়ের পর সমগ্র ভারত দখল করতে হবে।

৩) ভারতের সকল মানুষকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে হবে।

৪) সমগ্র পৃথিবীতে ব্রিটিশ ও আমেরিকা যে আধিপত্য বিস্তারের কর্মসূচী নিয়েছে, মুসলিম বিশ্বকে তার সঙ্গে হাত মেলাতে হবে।

৫) পাঁচজন হিন্দু যে অধিকার ভোগ করছে, একজন মুসলমানকে সেই অধিকার ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ পাঁচজন হিন্দুর সমান একজন মুসলমান।

৬) যতদিন পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলি নিয়ে যেতে হবে।

   ক) হিন্দু মালিকানাধীন সব কারখানা ও দোকান পুড়ে ধ্বংস করে দিতে হবে, লুট করতে হবে এবং লুটের মাল লীগ অফিসে জমা দিতে হবে।

   খ) সকল মুসলিম লীগ সদস্য সঙ্গে অস্ত্র রাখবে।

   গ) জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা যদি লীগে যোগদান না করে তবে তাদেরকে গোপনে খুন করতে হবে।

   ঘ) হিন্দুদের সংখ্যা কমাবার জন্য তাদেরকে অবিরতভাবে খুন করে যেতে হবে।

   ঙ) সব মন্দির ধ্বংস করে দিতে হবে।

   চ) ভারতের প্রত্যেক গ্রামে ও শহরে (জিলায়) মুসলিম লীগের গোয়েন্দা ছড়িয়ে দিতে হবে।

   ছ) গোপনে প্রতি মাসে একজন করে কংগ্রেসীকে খুন করতে হবে।

   জ) মুসলিম গেস্টাপো বাহিনীর এক একজনকে দিয়ে কংগ্রেসের বড় অফিসগুলি ধ্বংস করে দিতে হবে।

   ঝ) ১৯৪৬-এর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে করাচী, বম্বে, কোলকাতা, মাদ্রাজ, গোয়া, ভিশাখাপত্তম প্রভৃতি শহর অচল করে দিতে হবে। এ কাজের দায়িত্বে থাকবে মুসলিম লীগের স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ।

   ঞ) কোন মুসলমানকেই হিন্দুর অধীনে সেনা বা নৌ-বাহিনীতে কিংবা সরকারী বা আধা-সরকারী অফিসে চাকুরী করতে দেওয়া হবে না।

   ট) চূড়ান্ত আক্রমণের লক্ষ্যে সমগ্র ভারত ও কংগ্রেস সরকারের মধ্যে অন্তর্ঘাত চালিয়ে যেতে হবে।

ঠ) এ সব কাজে অর্থ জোগাবে মুসলিম লীগ ...

ড) বম্বে, কোলকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, লাহোর, করাচী প্রভৃতি শহরের মুসলিম লীগ অফিসে সব অস্ত্র-শস্ত্র পৌঁছে দিতে হবে।

ঢ) হিন্দুদেরকে ভারত ছাড়া করার উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগের সকল শ্রেণীর সদস্যরা সব সময়ের জন্য অস্ত্র বহন করবে; অন্তত পকেটে রাখার মত একটি ছোরা।

ণ) সকল প্রকার যান বাহন হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করতে হবে।

ত) আগামী ১৮ অক্টোবর (১৯৪৬) থেকে হিন্দু মহিলা ও মেয়েদের ধর্ষণ করবে, অপহরণ করবে এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করবে।

থ) হিন্দু সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিতে হবে।

দ) সকল লীগ সদস্যকে সব সময়ের জন্য হিন্দুদের ব্যাপারে নিষ্ঠুর হতে হবে এবং তাদেরকে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সব ব্যাপারেই বয়কট করতে হবে।

ধ) কোন মুসলমান কোন হিন্দুর দোকান থেকে কিছুই কিনবে না। হিন্দুর তৈরী সিনেমা দেখবে না। মুসলিম লীগের সব সদস্যই এই নির্দেশ মেনে চলবে এবং ১৯৪৬-এর ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কাজে নেমে পড়বে।

(উৎস ঃ পাঞ্জাব হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি গোপালদাস খোসলার 'Stern Reckoning', New Delhi- 110 001, পৃ- ৩১৩-১৪।)

কিন্তু পাকা অভিনেতার মতই ভণ্ড ও কপট রাজনীতিক মিঃ জিন্নাহ্ কোলকাতায় দাঙ্গার কথা শুনে অবাক হয়ে যান এবং ঐ অমানুষিক দাঙ্গার নিন্দা করে ১৭ আগষ্ট এক বিবৃতিতে বলেন, "হিংসার কাজকে আমি খোলাখুলি ভাবে নিন্দা করছি এবং ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য গভীর সহানুভূতি জানাচ্ছি।" [41]

অবাক করা ব্যাপার হল পাকিস্তানের দাবিতে কোলকাতায় মুসলিম লীগের পরিকল্পিত নারকীয় হত্যাযজ্ঞের প্রস্তুতি যখন ষোল কলায় পূর্ণ ঠিক সেই সময় ১৫ আগস্ট সন্ধ্যায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসকে কোন রূপ আমল না দিয়ে ক্ষমতা পাগল পণ্ডিত নেহেরু বোম্বেতে মিঃ জিন্নাহ্র বাসভবনে বসে একত্রে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করার ব্যাপার নিয়ে তাঁর সঙ্গে তোষামুদে আলোচনা চালাচ্ছিলেন। জিন্নাহ্র মন ছিল কোলকাতার দিকে। কাজেই আশি মিনিটের এই আলোচনায় ফল হয়েছিল একটি বড় আকারের শূন্য। তবু নেহেরু ছিলেন আশাবাদী।

মুসলিম লীগের সঙ্গে কেন্দ্রে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ব্যাপারে যতটুকু অগ্রগতি হয়েছিল, কোলকাতার নারকীয় হত্যাকাণ্ডের পর তা বরবাদ হয়ে যেতে পারে বলে অনেকে ভাবলেও সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিত নেহেরু এই ঘটনার কোন গুরুত্বই দেননি। বরং তিনি বললেন, "কারা সামান্য কয়েকজন লোক কোলকাতায় একটু দুর্ব্যবহার করেছে বলে

আমাদের পরিকল্পনার কোনরূপ পরিবর্তন হবে না কিছুতেই।" [42]

১৬ আগষ্ট মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস'-এর ৭২ ঘন্টার নারকীয় হিংসাকে পণ্ডিত নেহেরুরা যত গুরুত্বহীন এবং তুচ্ছ ভাবুন না কেন, 'The Last Days of the British Raj' -এর লেখক লিওনার্ড মোসলে কিন্তু বিদেশী হয়েও পরবর্তীকালে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এর মূল্যায়ন করে বলেছেন, ঐ হিংসার ঘটনা ভারতের আকৃতি ও ইতিহাস বদল করে দিয়েছে এবং অখণ্ড ভারতের মিলনের সূতো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে দিয়েছে। (পৃ-১) তিনি লিখেছেন —

"১৯৪৬ সনের আগষ্ট মাসের ঐ কুৎসিত ও ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ কলিকাতাকে যে ৭২ ঘন্টার জন্য অস্থিময় কবরখানায় পরিণত করিয়াছিল উহা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, উহা নিষ্পাপ মানুষকে হত্যা করা ছাড়াও বেশি কিছু করিয়াছে। উহা মানুষের আশাকেও হত্যা করিয়াছে। উহা ভারতের আকৃতি ও ইতিহাসের গতি বদল করিয়া দিয়াছে। চৌরঙ্গী স্কোয়ারে পুরুষ, নারী ও শিশুর পুঁতিগন্ধময় মৃতদেহগুলি নর্দমায় পড়িয়াছিল যে পর্যন্ত না ভারতের বিশ্বস্ত নোংরা-পরিষ্কারক শকুন উহা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। উহারা প্রতি মুখভর্তি ঠোকরে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছে এক ভারতের মিলনসূত্র যে ভারতকে দেড় শতাধিক বৎসর ধরিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে বৃটেন এবং পরিশেষে তাহা ছিঁড়িয়া দ্বিখণ্ডিত করিল।"

'খুন, ধর্ষণ ও অগ্নি-সংযোগে মেতে উঠল কোলকাতা। হাজার হাজার মানুষ হলেন গৃহহারা। ধর্ষিতা ও অপহৃতা মহিলাদের খোঁজ নেবার কেউ ছিল না। কোলকাতার এখানে সেখানে জমে উঠল লাশের পাহাড়। এগুলো সরিয়ে নেবার কেউ ছিল না। স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার সাংবাদিক কিম্ ক্রিস্টেন লিখলেন - যা ঘটেছে তা তো দাঙ্গা নয়। এটা এমন কিছু যা বোঝাবার জন্য মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে শব্দ চয়ন করা দরকার। তা হচ্ছে 'বর্বরতা' .... [43] এই বর্বরতা সেদিন চোখে পড়েনি যোগেনবাবু বা তাঁর অনুগামীদের। তাই তাঁরা চিঠি লিখে ঐ দাঙ্গাকে সমর্থন করেছিলেন (একটু আগেই বলা হয়েছে)। এর ফলে তাঁরা একটি নারকীয় দাঙ্গা এবং তার সঙ্গে ভারত-ভাগের অংশীদার হয়ে গেলেন ইতিহাসের পাতায়। *

বস্তুত ১৯৪৬-এ কোলকাতায় নারকীয় দাঙ্গা ঘটিয়ে মুসলিম লীগ ভারত-বিভাজনকে সুনিশ্চিত করেছিল। এই নারকীয় দাঙ্গার বিবরণ দিয়েই মাউন্টব্যাটেন অখণ্ড ভারত তত্ত্বে অনড় গান্ধীজীকে ঘায়েল করে দিতে পেরেছিলেন। তিনি বলছেন—

'গান্ধীজীর একমাত্র অবদান, যা তিনি অনেক আগেই আমাকে বলেছেন, তা হচ্ছে আমি যেন ভারত-বিভাজনের কথা স্বপ্নেও না ভাবি।' আমি বললাম, 'অন্য কোন পথ পেলে আমি কোন ক্রমেই ভারত ভাগের দিকে যাব না।' কিন্তু 'আপনি ১৬ আগষ্টের (১৯৪৬) কথা

---

* অবশ্য যোগেনবাবু পরবর্তীকালে কোলকাতার ঐ পাশবিক ঘটনাকে 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' বলে বর্ণনা করেছেন এবং এর জন্য মুসলিম লীগকেই দায়ী করেছেন। কিন্তু আজ তাঁর অনুগামী বলে পরিচয় দিয়ে এক দল কলমচি ঐ দাঙ্গার কারণ 'রহস্যাবৃত' বলে মনে করেন। কি বলতে চান এনারা?

ভুলে যাবেন না যেদিন মিঃ জিন্নাহ্ কেবল মাত্র মহড়া হিসাবে কোলকাতায় ৫ হাজার লোককে খুন করেছিলেন এবং ১৫ হাজার লোককে আহত করেছিলেন। আমি মনে করি মিঃ জিন্নাহ্‌কে মাঝ পথে থামিয়ে দিতে না পারলে তিনি 'সিভিল ওয়ার' করবেন। এ ক্ষমতা তাঁর আছে।' উত্তরে গান্ধীজী বললেন, 'হ্যাঁ, আমি আপনার সঙ্গে সহমত পোষণ করছি। ......' [44]

যাক্, পরদিন শনিবার রাতে দাঙ্গা সম্পর্কে কোলকাতা থেকে এক বেতার ঘোষণায় মুসলিম লীগের শুভাকাঙ্ক্ষী বাংলার গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ জানাচ্ছেন, "এক বছর সময়ের মধ্যে কোলকাতার হাঙ্গামা তৃতীয়বার ভয়াবহ আকার ধারণ করল। গতদিন এবং আজ আমি নিজে হাঙ্গামার জায়গাগুলো ঘুরেছি এবং নিজের চোখে দেখেছি দাঙ্গাকারীর দল ('riotous mob') কীভাবে ব্যাপক ক্ষতি ('havoc') সাধন করেছে। উচ্ছৃঙ্খল গুণ্ডাবাহিনী জীবন ও সম্পদের যে নির্বিচার ধ্বংস করেছে সব রাজনৈতিক দলের নেতারা একযোগে তার নিন্দা করেছেন। এখন পর্যন্ত যতটা খবর পাওয়া গেছে, কোলকাতাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ স্থান যেখানে অধিকতর শান্তি ভঙ্গের কারণ হয়েছে।" [45]

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় গভর্ণর তাঁর বেতার ভাষণে উল্লেখ করেছেন 'riotous mob' অর্থাৎ দাঙ্গাকারী জনতার কথা; আর 'havoc' কথার দ্বারা ব্যাপক ধ্বংসের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ভারতের জাতীয়তাবাদী প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা পাগল কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত নেহেরু হত্যাকারী ঐ গুণ্ডাদের বলেছেন 'a few persons'। হত্যা করাকে বলেছেন 'misbehave' অর্থাৎ দুর্ব্যবহার করা। একেই বলে স্ববিরোধী খোসামুদে রাজনীতির ভণ্ডামী।

পণ্ডিত নেহেরুর এই ভূমিকা খুবই দুঃখজনক। গান্ধীজীর ভূমিকাও অনুরূপ দুঃখজনক। কোলকাতার মহাদাঙ্গার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তিনি ২৮ আগষ্ট (১৯৪৬) বললেন - "এখন আমার নীরব থাকাই বাঞ্ছনীয়।" তিনি আরও বলেন, "আমরা ভয় ভীত হয়ে পালিয়ে যাই। এটা উচিত নয়। যারা পালিয়ে যায় ঈশ্বরের উপর তাদের বিশ্বাস নেই। ঈশ্বর যখন আমাদের অন্তরে আছেন, তখন পালিয়ে যাবার প্রয়োজন কোথায়? মানুষ যখন মারা যায়, তখন বুঝতে হবে ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই এটা ঘটে। আমাদের যদি কেউ পেটায় তখন বুঝতে হবে ঈশ্বরই এটা ঘটান। যে ব্যক্তি সব সময়ই ঈশ্বরের কথা ভাবে সে পালিয়ে বাঁচতে যাবে কেন?" [46]

আরও লক্ষ্য করার বিষয় কোলকাতায় অতো বড় একটা নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে কেউ তার তেমন কোন আমলই দিলেন না। মুসলিম লীগ তার নেতা মিঃ জিন্নাহ্ ও শহিদ সরোয়ার্দী এমন গোপন এবং শঠতার সঙ্গে সব কাজ সম্পন্ন করলেন যেন সব কিছু স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে গেল। নেতারা যেন সব ধরা ছোঁয়ার বাইরে। জিন্নাহ্ সাহেব যেন কোলকাতার দাঙ্গার কথা খবরের কাগজেই শুনেছেন এবং শুনেই নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছেন।

এই সময়ে গুণ্ডাদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ, যেমন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিরপরাধ মনুষদের হত্যা, সম্পত্তি লুঠ ও ধ্বংস করার বিরুদ্ধে কঠিন ভাষায় নিন্দা জ্ঞাপন করে এবং যে কোন মূল্যে ত্বরিত শান্তি ফিরিয়ে আনার আবেদন জানিয়ে 'জাগরণ' পত্রিকার তৎকালীন

সম্পাদক শ্রীঅপূর্বলাল মজুমদার এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রেসে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর ক্ষমতাবলে যোগেনবাবু ঐ লেখাটি প্রকাশ করতে দেননি। কারণ তিনি চেয়েছিলেন কোলকাতায় দাঙ্গা চলুক। যেহেতু তাঁর মতে ঐ দাঙ্গা তপসিলীদের বিরুদ্ধে ছিল না। ওটা ছিল বর্ণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে। এ ব্যাপারে অপূর্ববাবু লিখেছেন —

"আমি জানতে পারলাম যে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল একটি আপত্তি তুলে বলেছেন যে, ঐ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলতে দেওয়া উচিত। এ কথা শুনে আমার মনে চরম বিস্ময় জাগল। তাঁর মতে ঐ দাঙ্গা মুসলমান ও বর্ণহিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ওর মধ্যে তপসিলী ভাইয়েরা জড়িত নেই। সুতরাং তথাকথিত ঐ দাঙ্গা সম্পর্কে কোন কথা বলার প্রয়োজন নেই।" [47]

দাঙ্গাকারী লীগের শীর্ষ নেতা মিঃ জিন্নাহ্ এবং শহিদ সরোয়ার্দিও অন্তত কৌশলগত ভাবে দাঙ্গার নিন্দা করেছেন। যোগেনবাবু কিন্তু ঐ নারকীয় ঘটনার নিন্দা করতে যাননি। লীগের কাছে তাঁর দেওয়া দাসখত তাকে একটি কথাও বলতে দেয়নি। লীগের নেতারাও ওভাবে হীনমন্যতার পরিচয় দেননি।

কোলকাতার দাঙ্গার চতুর্থ দিনে হিন্দু ও শিখেরা প্রতিরোধ ও প্রতিশোধ নিতে শুরু করলে শহিদ সাহেব আর নিষ্ক্রিয় থাকেননি। তড়িঘড়ি করে নামিয়ে দিলেন পুলিশ ও মিলিটারী। থেমে গেল দাঙ্গা। পরে ডিসেম্বরে মিঃ জিন্নাহ্ গিয়েছিলেন লণ্ডনে। ওখানে উনি ব্রিটিশ কেবিনেটের এক মন্ত্রীকে বললেন (৩.১২.'৪৬) হিন্দুরাই আগস্টে কোলকাতার দাঙ্গা বাঁধিয়েছিল। ('Jinnah had argued that the Hindus had organised the Calcutta riots in August.' T.P. Vol. 9, page- 254.)। পাকিস্তানের কোন কোন ইতিহাস বই-এ এই তথ্য এখন ফলাও করে লেখা হচ্ছে। শুধু পাকিস্তানেই নয়, এই কোলকাতায়ই পাকিস্তানী ঐ সুর বাজতে সুরু করেছে। জিন্নাহ্-যোগেন্দ্র ভক্তদের কেউ কেউ '৪৬-এর কোলকাতা-দাঙ্গার জন্য হিন্দুদের দায়ী করার পাঁয়তারা কষছেন।

নোয়াখালি এবং ত্রিপুরায় পাশবিক নির্যাতন

[The Rape of Noakhali and Tippera]

"On October 10, 1946, riots broke out in Noakhali. ...... There were reports of murders, destruction of property, kidnapping, molestation of women, forced marriages and conversion on a large scale. All this was being done with the active support of Muslim League Ministry in Bengal."

—A. Kripalani [48]

"I have seen heaps of bones in a house where 307 persons, mainly women and children, were driven by the invading mob, locked up and then burned alive."- A. Kripalani [49]

কোলকাতা হত্যাকাণ্ডের পরেও হিন্দুরা ভারত ভাগের দিকে তেমন এগোচ্ছে না। দু'একজনে বাংলা ভাগের কথা বলছেন মাত্র। কি করা যায়? হ্যাঁ, আর একটা হিন্দু গণহত্যা ঘটাতে হবে। যথারীতি পরিকল্পনা দাঁড় করিয়ে ৫৪ দিন পরে মুসলিম লীগের প্রাক্তন এম. এল. এ কুখ্যাত জেহাদী দাঙ্গাবাজ গোলাম সরোয়ারের নেতৃত্বে নোয়াখালির হিন্দু নিধন যজ্ঞের উদ্বোধন হয় '৪৬-এর ১০ অক্টোবর। সেদিন ছিল বৃস্পতিবার। হিন্দুদের লক্ষ্মীপুজোর দিন। মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড সহ তার কয়েক হাজার প্রশিক্ষিত গুণ্ডা খুব দৃঢ়তার সঙ্গে একাজে অংশ নেয়। থানা পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে। নোয়াখালি ও কুমিল্লা জেলার রামগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, সোনাইমুরি, রাইপুর ও সেনবাগ থানা সহ আরও অনেক এলাকা নিয়ে বিশাল অঞ্চল ঘেরাও করে হিংসার তাণ্ডব চললো অনেক দিন ধরে। হিন্দুদের ধর্মস্থান অপবিত্র করা ও ধ্বংস করা ছাড়াও অত্যাচারের এমন কোন ধরন বাকি নেই যা এখানে ঘেরাও হওয়া হিন্দুদের উপর প্রয়োগ করা হয়নি। হত্যা, লুটপাঠ, গণধর্ষণ, অপহরণ, অগ্নিসংযোগ এবং ধর্মান্তরকরণ। হিন্দু অঞ্চল ঘেরাও করে অর্থাৎ পালিয়ে যাওয়ার সকল পথ বন্ধ করে দিয়ে, অসংখ্য হিন্দু মেয়েকে তারা বিয়ের নামে রক্ষিতা করে নিয়েছে। হিন্দুরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে তার জন্য রাস্তাগুলি খুঁড়ে রাখা হয়েছিল। জলপথে যাতে অপবিত্র পৌত্তলিক হিন্দুরা পালিয়ে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল নৌকার মাঝিদের দিয়ে। ঐ মাঝিরা সবাই ছিলেন মুসলমান। দু'চারজন সাহসী ব্যক্তি ঐ এলাকায় গিয়েছিলেন বন্ধু বা আত্মীয়দের সাহায্য করার জন্য। তাঁদের অনেকেই খুন হয়ে গেছেন এবং দু'চার জন

আহত হয়ে ফিরে এসেছেন। [50] এ কাজে অন্তত তত্ত্বগতভাবে যোগেনবাবু অংশীদার হয়ে রইলেন! এটা কি দূরদর্শীতার পরিচয়, না অদূরদর্শীতার পরিচয় ?

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তুতি লগ্নে লীগ তৈরী করেছিল 'লড়কে-লেঙ্গে' মার্কা 'মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড', যার প্রচলিত নাম ছিল 'আজরাইল বাহিনী'। এদের রাজনৈতিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে। এদের শিক্ষার ভার ছিল পীর ও কট্টর মোল্লাদের উপর। পাঞ্জাবের তৎকালীন ছোটলাট জেনকিন্স এই ন্যাশনাল গার্ডকে মুসোলিনী ও হিটলারের ঝটিকা বাহিনীর সমগোত্রীয় মনে করতেন। [51] ১৯৪০-এর পর পাকিস্তান আদায়ের জন্য মুসলিম লীগ তৈরী করে 'মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড'। বস্তুত এদের দানবীয় কাজ-কর্মের ফলেই পাকিস্তান সৃষ্টি ত্বরান্বিত হয়েছে। মিঃ লিয়াকত আলি খাঁন ঐ ন্যাশনাল গার্ডকে লীগের 'অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ' বলে ঘোষণা করে বলেছিলেন ন্যাশনাল গার্ডদের উপর কোন প্রকার আক্রমণ মুসলিম লীগের উপর আক্রমণ বলে ধরে নেওয়া হবে। [52]

এই সব দানবীয় কাজ-কর্মের প্রাণ ভ্রমরা লুকিয়ে ছিল (এখনও আছে) জেহাদের মধ্যে। জেহাদের প্রচলিত অর্থ হচ্ছে ইসলাম ধর্ম প্রচার, প্রসার ও রক্ষা করার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া এবং 'বিধর্মীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া'। দলবদ্ধ গুণ্ডামীর ক্ষেত্রে (বাবাসাহেবের ভাষায় 'Gangsterism')* মুসলিম মৌলবাদীর শ্রেষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য অস্ত্র হচ্ছে 'জেহাদ'। সাম্প্রতিক ইরাক-আমেরিকা যুদ্ধে তথাকথিত প্রগতিশীল সাদ্দাম হোসেন শেষ পর্যন্ত ঐ জেহাদের ডাক দিয়েছিলেন। গত ২৫ মার্চ (২০০৩) কাশ্মীরের নদিমার্গে ২৪ জন হিন্দুকে খুন করেছে ওখানকার পাকিস্তান পন্থী জঙ্গী সংগঠন লস্কর-ই-তৈবা। তাদের প্রধান হাফিজ সঈদ বলেছেন, কাশ্মীরে হিন্দুদের হত্যা ভারতের বিরুদ্ধে তাদের ধর্মীয় জেহাদেরই অঙ্গ। এক প্রশ্নের উত্তরে লস্কররা বলেছে, "ভারতীয়রা একটা ভাষাই বোঝে। সেটা হল জেহাদের ভাষা। তাই প্রত্যুত্তরে হিন্দুদের হত্যা করা ছাড়া আমাদের কোনও উত্তর নেই।"

নোয়াখালি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা হওয়ায় কোলকাতার মত হিন্দুদের প্রতিরোধ গড়া সম্ভব ছিল না ওখানে। ঐ মৃত্যু-ব্যুহের মধ্যে থেকে যারা কোন মতে বেরিয়ে পড়তে পেরেছেন তাঁরা চাঁদপুর, ফেণী, বরিশাল সহ আশপাশের অনেক শহর বন্দরে আশ্রয় নিয়েছেন। কুমিল্লার হাইমচরে বহু হাজার নমঃ সম্প্রদায়ের মানুষের বাস। তারাও একই ভাবে অত্যাচারিত ও নির্যাতিত। তাদের অনেক পরিবার আশ্রয় নিয়েছে বরিশাল শহরের স্টীমার ঘাটে। নোয়াখালির এমন বীভৎস অত্যাচার ইতিহাসে বিরল। এই হত্যাযজ্ঞের মূল নায়ক শহিদ সরোয়ার্দি ও তার সরকার বোবা কালা হয়ে বসে আছে। মৃত্যু-ব্যুহ থেকে পালিয়ে আসা লোকেদের কাছে শুনে যখন অত্যাচারের অসংখ্য কাহিনী পত্র পত্রিকায় প্রকাশ হতে লাগলো তখন সরকার একটু নড়ে চড়ে বসলো।

---

* "The riots are a sufficient indication that gangsterism has become a settled part of their *(Muslim's)* strategy in politics." Dr. Ambedkar, Vol. 8/269]

কেন্দ্রে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ১২ সদস্য বিশিষ্ট অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয় ১৯৪৬-এর ২ সেপ্টেম্বর। এই মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছিলেন পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, সর্দার বলদেব সিং, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল, ডঃ জন মাথাই, মিঃ এম. আসফ আলি, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, মিঃ জগজীবন রাম, স্যার সাফায়াত আহমদ খান, সৈয়দ আলি জাহির, মিঃ সি. রাজাগোপালাচারি, মিঃ শরৎ চন্দ্র বোস এবং মিঃ সি. এইচ. ভাবা। শপথ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ওয়াভেল জিদ ধরেন লীগকে মন্ত্রী সভায় আনতে হবে। এবং এর জন্য লীগ তথা মিঃ জিন্নাহ্‌র সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা সুরু করেন। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে রাজী করানো সম্ভব হয়। মিঃ জিন্নাহ্‌ লীগের মনোনীত ৫ জন সদস্যের নাম বড়লাটের কাছে পাঠান ১৪ অক্টোবর। এর ৫ম নামটি যোগেনবাবুর। যোগেনবাবু যে 'বাংলা তফসিলী ফেডারেশনের কেউ' — এমন কোন শব্দের উল্লেখ নেই ঐ চিঠিতে। এ ব্যাপারে পরে আবার বলা হবে।

পরদিন 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকা লিখেছে — 'কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্গঠনের জন্য ভাইসরয়ের প্রাসাদ থেকে প্রচারিত মুসলিম প্যানেলের নামের মধ্যে একজন অমুসলমানের নাম অন্তর্ভুক্তি আজকের বিকেলের প্রেস বিজ্ঞপ্তির বিস্ময়কর ব্যাপার।' [53] এই ১৪ অক্টোবর নোয়াখালির হিন্দু নিধনের বর্ণনা সম্বলিত দু'টো টেলিগ্রাম পান শরৎবাবু। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঐ টেলিগ্রামের কপি পাঠিয়ে দেন ওয়াভেলের কাছে। প্রথম টেলিগ্রামে বলা হয়েছে —

"রামগঞ্জ থানায়, অংশত বেগমগঞ্জে এবং লক্ষ্মীপুরে ব্যাপকভাবে সংগঠিত গুণ্ডামি, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, হত্যা ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ চলছে। পুরো পরিবার সহ রায়সাহেব রাজেন্দ্র লাল রায়, জমিদার সুরেন্দ্র বোস এবং আরও অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি খুন হয়েছেন। থানা বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যোগাযোগ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। পুলিশের কোন সাহায্যই পাওয়া যাচ্ছে না। এক্ষুণি সেনাবাহিনী না পাঠালে হিন্দুরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।" [T.P., Vol.8, p-725]

দ্বিতীয় টেলিগ্রামে বলা হয়েছে — **"পুরো নোয়াখালি জিলা ধ্বংস হয়ে গেছে। জিলা বোর্ডের সভাপতি সহ (? জিলা আইনজীবী সংগঠন) গণ্যমান্য অনেক হিন্দু নিহত হয়েছেন। কয়েক হাজার হিন্দু বাড়ী লুট হয়েছে, পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, মহিলাদের জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। পুলিশ নির্বিকার, অসহায়। জরুরীভাবে মিলিটারি প্রয়োজন। নিশ্চিহ্ন হওয়ার আশঙ্কা থেকে জীবিতদের বাঁচান, এই প্রার্থনা করি।"**[T.P., Vol.8, p-726]

মুসলিম লীগের সমর্থক পত্রিকা 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' নোয়াখালিতে প্রায় ৪০০ লোকের নিহত হওয়ার খবর সহ নানা প্রকার আমানুষিক নির্যাতনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে ২০ অক্টোবর জানাচ্ছে — "রামগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, রাইপুর, লক্ষ্মীপুর এবং সেনবাগ থানা এলাকায় গত দশ দিন ধরে ব্যাপক অত্যাচারে মানুষ হত্যা, তাদের সম্পদ লুট, বাড়ীঘর পোড়ানো, সুরক্ষার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে তাদের নিংড়ে অর্থ গ্রহণ, মহিলাদের অপহরণ এবং জোরপূর্বক তাদের

নতুন বিশ্বাসে ধর্মান্তরকরণ শেষ করে উত্তেজিত অত্যাচারী জনতার অধিকাংশ এখন ত্রিপুরা জেলার ফরিদগঞ্জ-চরহাইম-চাঁদপুর এলাকায় ঢুকে পড়েছে। নোয়াখালি জেলায় দখলকৃত এলাকায় পাহারা দেওয়ার জন্য রেখে যাওয়া হয় তাদের একটা অংশ। উদ্দেশ্য ওখানকার অধিবাসীরা তাদের কর্তৃত্ব মানতে না চাইলে আবার চালাতে হবে অত্যাচারের রোলার।"

মুসলিম লীগের এই পশুসুলভ আচরণের কথা যোগেনবাবুও জেনেছিলেন। ১৪.১০.'৪৬ তারিখে চাঁদপুর থেকে ত্রিপুরার এম. এল. এ. যোগেন্দ্র চন্দ্র দাস মহাশয় মণ্ডল মশাইকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে যে ঐ এলাকার (নোয়াখালি জিলার রামগঞ্জ থানা) তফসিলী সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ হাজার হাজার মুসলমান গুণ্ডা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। গুণ্ডারা তফসিলীদের বাড়ী ঘর লুট করে জ্বালিয়ে দিচ্ছে এবং জোর করে তাদের মুসলমান বানাচ্ছে।" [54] এ সব খবর তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। তিনি এই মুসলিম লীগের 'নোমিনী' হয়ে মন্ত্রিত্ব লাভ করে গৌরব বোধ করেছিলেন। এর ফলে যে দুঃখজনক রেকর্ড সেদিন সৃষ্টি হয়েছিল, ইতিহাসে তা বিরল।

দেখা যাক, এ সময় ডঃ আম্বেদকরের ভূমিকা কি ছিল। কেবিনেট মিশন যে তফসিলীদের প্রতি মোটেও সুবিচার করেনি, ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী আর্ল ক্লেমেন্ট রিচার্ড এ্যাটলির কাছে এবং বিরোধী দলীয় নেতা উইনস্টন চার্চিলের কাছে সে অভিযোগ জানাতে এবং প্রতিকার পাওয়ার আশায় লন্ডন গিয়েছিলেন তিনি। নির্যাতিত শ্রেণীর রাজনৈতিক অধিকার লাভের তুলনায় মন্ত্রিত্ব পাওয়াটা তাঁর কাছে ছিল অতি তুচ্ছ ব্যাপার। পরবর্তীকালে (১৯৫২) নেহেরু মন্ত্রিসভার মন্ত্রিত্ব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন।

একজন তফসিলী প্রতিনিধি সহ মুসলিম লীগ যে কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ দিয়েছে সে ব্যাপারে রয়টারের লন্ডন প্রতিনিধি তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি জানালেন —

"মন্ত্রিসভা শান্তিতে কাজ করতে পারবে কিনা সে বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। একথা একদম নিশ্চিত যে, ওরা আমাদের বন্ধু নয় — ওরা আমাদের মিত্রও নয়।" তিনি আরও বলেন, "কোন্ লোকরা বন্ধু না হয়েও মিত্র তা আমরা চিনি। কিন্তু মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস দল কেন্দ্রীয় সরকারে ঢুকেছে পরস্পর শত্রু হিসাবে। এদের কাছ থেকে আমরা কি আশা করতে পারি! এটাকে কেউ কোয়ালিশন সরকারও বলতে পারে না। সত্যিকার অর্থে এটি এক দেশে দু'টি জাতির সরকার।" [55]

কিছুদিন পরেই বাবাসাহেবের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হল। ঐ সরকার কাজ করতে পারেনি। বলা যায় রাজনৈতিক কাণ্ডজ্ঞানের অভাবেই যোগেনবাবু সেদিন এ কথা বুঝতে পারেননি।

ওদিকে মন্ত্রিসভায় লীগের যোগদানের ফলে মিঃ শরৎ চন্দ্র বোস, স্যার সাফায়াত আহমদ খান এবং সৈয়দ আলি জাহির মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়েন। শরৎবাবু মনে মনে প্রচণ্ড ভাবে রেগে যান। রেগে গিয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন এবং

নভেম্বর মাসেই 'সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান পার্টি' গঠন করেন। এবং জানুয়ারি ('৪৬) মাস থেকে লীগ নেতাদের সঙ্গে ঘন ঘন আলাপ আলোচনা সুরু করেন যার বিষময় ফল দেখা যায় ১৯৪৭-এর মে মাসে। এটিও ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়। পরে তা উল্লেখ করা হবে।

নোয়াখালির ধ্বংস যজ্ঞ যে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং বাংলার লীগ সরকারের পূর্ব পরিকল্পিত এবং গভর্ণর বারোজ সাহেবের আশীর্বাদপুষ্ট ছিল এটা অত্যন্ত পরিষ্কার। ধ্বংসলীলা সুরু হওয়ার পরপরই প্রিমিয়ার সরোয়ার্দি সাহেব এবং গভর্ণর বারোজ সাহেব চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন। সম্ভবত ঐ কু-কর্ম ঠিকমত চলছে কিনা তা দেখার জন্য। ওদিকে গান্ধীজীর পরামর্শে কংগ্রেস সভাপতি আচার্য জে. বি. কৃপালনী শরৎ বোসকে নিয়ে ১৯ অক্টোবর প্লেনে চড়ে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন। পথে অল্প সময়ের জন্য কুমিল্লায় নেমেছিলেন। তখন কয়েক হাজার ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু তাঁদের সঙ্গে দেখা করে মুসলিম গুণ্ডাদের পাশবিক অত্যাচারের বর্ণনা দেন। এরপর তাঁরা চট্টগ্রামে গিয়ে বারোজ সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে সরোয়ার্দি সাহেবও ছিলেন। দুর্ঘটনার বিবরণ জানতে চাইলে বারোজ সাহেব বললেন প্রিমিয়ার তাঁকে বলেছেন 'সব কিছুই শান্তিপূর্ণ এবং সুশৃঙ্খল ভাবে চলছে।' কৃপালনী হিন্দু মহিলাদের অপহরণ প্রসঙ্গ তুললে গভর্ণর বললেন, 'এ সব হবারই কথা। কারণ, হিন্দু মহিলারা মুসলমান মহিলাদের তুলনায় দেখতে সুন্দরী।'[56]

গভর্ণর এবং প্রিমিয়ারের অনীহার ফলে ওনারা নোয়াখালি যেতে পারলেন না। ফিরে আসতে হয়েছিল কোলকাতায়। একই প্লেনে সরোয়ার্দি সাহেবও এসেছিলেন। প্লেনটি নীচু হয়ে আসছিল বলে ঘর বাড়ী পোড়ার চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। এ ব্যাপারে সরোয়ার্দি সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি স্কুলে পড়া ছাত্রদের মত নির্লিপ্ত থেকে নিজের ক্যামেরা দিয়ে ফটোর পর ফটো তুলে যাচ্ছিলেন। [57]

এগারো দিন ধরে নোয়াখালিতে হিন্দু নিধন যজ্ঞ ও নারী ধর্ষণ চলার পরে সরেজমিনে তদন্ত করে রিপোর্ট করার জন্য ২১ অক্টোবর কয়েকজন মন্ত্রী ও লীগ নেতাদের এক টিম পাঠানো হল নোয়াখালিতে উপদ্রুত অঞ্চলের উদ্দেশ্যে। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভায় লীগের মনোনীত সদস্য মিঃ যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল। ২১ অক্টোবর '৪৬ 'স্টেট্স্ম্যান' পত্রিকার রিপোর্ট অনুসারে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ নিয়ে এই টীম গঠিত হয়েছিল —

মিঃ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (নতুন কেন্দ্রীয় সরকারে মনোনীত মন্ত্রী), মিঃ সামসুদ্দিন আহমদ (বাংলার শ্রম মন্ত্রী), মিঃ আবুল হাশেম (সেক্রেটারি, বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগ), মিঃ ফজলুর রহমান, মিঃ হামিদুল হক চৌধুরী, মিঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, ডঃ এ. মালেক এবং বি. ওয়াহিদুজ্জামান। [The Statesman, dt. 21 October, 1946.]

বাংলার সরকার ও তৎকালীন লীগ নোয়াখালির হিন্দু নিধন যজ্ঞের কথা গোপন করার চেষ্টা করছিল। তবে কোলকাতায় মুখে মুখে খবর এসে গেছিল। রটনাটা এভাবে হচ্ছিল যে, ওখানে যা ঘটছে তা (কোলকাতার মতই) বর্ণহিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

তফসিলীরা কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি। সেই সময় নোয়াখালি থেকে বিশেষত তফসিলী অধ্যুষিত হাইমচর থেকে চলে আসা নমঃ সমাজের কয়েকশ' অত্যাচারিত মানুষ আশ্রয় নিয়েছে বরিশাল স্টীমার ঘাটে। এঁদের মধ্যে রিলিফের কাজ চালাতে গিয়ে ছাত্রনেতা শ্রীচিত্তরঞ্জন সুতারের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকরা ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের একটা তালিকা তৈরী করে। স্থানীয় ছাত্র সংগঠনের সভায় এঁদের নিয়ে আলোচনার পর ঠিক হয় যে, এই তফসিলী হিন্দু উদ্বাস্তুদের কথা কোলকাতায় ছাত্র ফেডারেশন অফিসে জানাতে হবে। পূর্বোক্ত শ্রীচিত্তরঞ্জন সুতার ঐ তালিকা নিয়ে কোলকাতায় আসেন। তখন এখানে ফেডারেশনের অফিসে ছাত্র ফেডারেশনের অধিবেশন চলছিল। চিত্তবাবু ঐ অধিবেশনে হাইমচরের ঘটনা এবং বরিশালের বিরাট সংখ্যক নমঃদের আশ্রয় গ্রহণের কথা জানান এবং তাঁদের কাছে তালিকাটি পেশ করেন। তখনকার ছাত্রনেতারা হাইমচরের অত্যাচারের ঘটনা এই প্রথম শুনলেন। সভায় উপস্থিত ছাত্ররা অবাক হয়ে বললেন — 'আমরা তো জানি ওখানে নমঃশূদ্ররা কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি, যোগেনবাবু তো তেমন খবরই দিয়েছেন।' চিত্তবাবু বললেন, 'উনি তো মুসলিম লীগের মন্ত্রী হিসাবে খবর দিয়েছেন। ওটাকে সত্য বলে ধরে নিলে মারাত্মক ভুল হবে।'

এরপর ছাত্র ফেডারেশনের নেতা মিঃ অপূর্বলাল মজুমদারের নেতৃত্বে একদল ছাত্র রিলিফ নিয়ে চলে যায় হাইমচরে। ওখানে তাঁদের যে অভিজ্ঞতা হয় তা বর্ণনা করতে গিয়ে অপূর্ববাবু লিখেছেন, "বড় গ্রামগুলোর মধ্যে একটিতে (হাইমচর) প্রায় ২০ হাজার লোকের বাস এবং তারা সকলেই নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের। আমরা এমন কোন বাড়ী খুঁজে পাইনি যার ক্ষতি সাধন করা হয়নি বা অংশত তচ্নচ্ করা হয়নি, লুট হয়নি বা ভেঙ্গে দেওয়া হয়নি।......... অনুসন্ধান করে জানা গেছে, কিছু গ্রামবাসী নিখোঁজ, কিছু লোক গুরুতর ভাবে আহত এবং অনেকেই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছেন।" [58]

অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার, মুসলিম লীগের পাঠানো যোগেনবাবুর নেতৃত্বাধীন তদন্তকারী দল অত্যাচারিত বিধ্বস্ত অঞ্চলে আদৌ প্রবেশ করেনি। তারা কয়েকটি উদ্বাস্তু শিবির ঘুরে এসে এবং প্লেনে উপদ্রুত অঞ্চলে এক চক্কর মেরে তদন্তের প্রহসন করে কোলকাতায় এসে তাঁদের তদন্ত রিপোর্ট পেশ করলেন। আশ্চর্য! লীগের প্রকাশিত ঐ রিপোর্টের সঙ্গে বাস্তব ঘটনার বিন্দুমাত্র মিল নেই। সর্বৈব মিথ্যা এবং বানোয়াট। ঐ রিপোর্ট 'স্টেটস্ম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ২৫ অক্টোবর। এই রিপোর্টে বলা হয়েছেঃ

"... পরিস্থিতি তেমন জরুরী বা ভয়াবহ নয়। ধর্ষণ এবং অপহরণ আদৌ হয়নি। মৃত্যুর সংখ্যা কুমিল্লায় ১৫ এবং নোয়াখালিতে ১০০ এর কম। সাধারণ ভাবে হত্যা এবং অগ্নিসংযোগ ঘটেনি। জমিদার মহাজনদের দু'চারটা বাড়ী লুট হয়েছে। পুড়িয়ে দেওয়া বাড়ীর সংখ্যা দু'শতাধিক নয়। ক্যাম্পে থাকা উদ্বাস্তুদের কাউকে আহত অবস্থায় দেখা যায়নি। অবশ্য ধর্মান্তরিতকরণ ও জবরদস্তিমূলক বিবাহের কিছু ঘটনা আছে।" [59] কিন্তু বাস্তব অবস্থা ছিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত অবস্থার চেয়েও অনেক বেশি ভয়াবহ। শত শত

মানুষকে নির্বিচারে খুন করা হয়েছে। ধর্ষণ ও অপহরণ করা হয়েছে অসংখ্য। লুট হয়েছে সকল বাড়ী। এমন কোন বাড়ী বাকি ছিল না যেখানে অগ্নিসংযোগ করা হয়নি। আর নমঃসম্প্রদায়ের নরদী নেতা তদন্তকারী টীমের প্রধান মিঃ যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল তদন্ত রিপোর্টে জানালেন "তফসিলীদের একজন লোকও নিহত বা আহত হয়নি।" আরও জানালেন যে, কয়েকজন জমিদার ও মহাজনদের বাড়ী লুট হয়েছে; কোন শিশু বা মহিলা নিহত হয়নি। [60] কিন্তু ১৯৫০-এর অক্টোবরে তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত কথা শুনিয়েছেন সকলকে। তাঁর পদত্যাগ পত্রের ৩নং অনুচ্ছেদে লিখেছেন, "কলকাতা হত্যাযজ্ঞের পরেই '৪৬-এর অক্টোবরে সংঘটিত হয় নোয়াখালির দাঙ্গা। সেখানে তফসিলী সহ অনেক হিন্দু নিহত হয়। এবং শত শত মানুষকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়। হিন্দু মহিলাদের অপহরণ ও ধর্ষণ করা হয়। আমার সম্প্রদায়ের (নমঃশূদ্র) লোকেরাও অনেকে জীবন ও সম্পদ হারিয়েছেন।" [61]

এই দুই বক্তব্যের অবস্থান দুই বিপরীত মেরুতে। এর একটি 'সত্য' হলে অপরটি 'মিথ্যা' হয়ে যায়। আর এই দুই পরস্পর বিরোধী বক্তব্য এক সঙ্গে সত্য বা মিথ্যা হতেই পারে না। মিথ্যাচারকে এখানে ঠেকানো কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

গান্ধীজী নোয়াখালির দুর্গত এলাকায় যাওয়ার পথে কোলকাতায় (সোদপুরে) এলেন অক্টোবরের শেষে। লীগ বা সরোয়ার্দি কারও কাছে এ কাজ মোটেই ভালো লাগছিল না। কিন্তু সরাসরি বাধা দিতেও পারছিলেন না। তাই যতটা সম্ভব দেরী করাবার ফন্দি ফিকির খুঁজছিলেন। অনুনয় বিনয় করে সরোয়ার্দি গান্ধীজীকে কলকাতায় ধরে রাখলেন 'বকর-ই-ঈদ' শেষ না হওয়া পর্যন্ত। ইংরেজী দৈনিক 'স্টেট্স্‌ম্যান' খবরটি পরিবেশন করেছে এই ভাবে, 'আজ প্রার্থনার পর সমবেত শ্রোতাদের গান্ধীজী বলিলেন যে, বাংলার প্রধানমন্ত্রী 'বকর-ই-ঈদ' শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহার নোয়াখালি যাত্রা বিলম্বিত করিতে বলিয়াছেন এবং তিনি তাহাতে রাজি হইয়াছেন।' [62]

শেষ পর্যন্ত ৬ নভেম্বর ('৪৬) গান্ধীজী নোয়াখালির উদ্দেশ্যে কোলকাতা ত্যাগ করলেন। ১১ নভেম্বর (অত্যাচার সুরু হওয়ার ১ মাস পরে) তিনি এক জনসভায় যোগ দিলেন নোয়াখালির দত্ত পাড়া গ্রামে। সভা লোকে লোকারণ্য। শ্রোতারা সবাই মুসলমান। সভার শেষের দিকেসমবেত জনতার কাছে এক প্রশ্ন তুলে ধরেন গান্ধীজী। তিনি জিজ্ঞেস করেন 'আপনারা কি চান না যে, যে সমস্ত হিন্দুরা তাঁদের ঘর বাড়ী ছেড়ে চলে গেছেন তারা আবার স্ব স্ব গ্রামে ফিরে আসুক এবং আপনাদের সঙ্গে আগের মত পাশাপাশি শান্তি ও সৌহার্দ নিয়ে বসবাস করুক?'

সভা নীরব। সভায় গণ্যমান্য বিশিষ্ট বহুলোক উপস্থিত ছিলেন। তারা কেউ কোন উত্তর দিচ্ছে না দেখে গান্ধীজী সোচ্চারে বললেন, 'পাকিস্তান হওয়া না হওয়ার ঝগড়া নিয়ে আমি এখানে আসিনি। জনগণ চাইলে ওটা হবে তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। আমি কেবল আপনাদের সহজ সরল কথাটা জানতে চাই যে হিন্দুরা ফিরে আসুক এটা আপনারা চান কিনা।'

গান্ধীজী একটু বিরতি দিয়ে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু কেউ কোন উত্তর দিচ্ছে না দেখে আবার বলতে সুরু করলেন, 'হিন্দুরা ফিরে আসুক এটা যদি আপনারা না চান তবে তাও বলুন। আমি আপনাদের কথাটা ওদের জানাবো যাতে আর ওরা এখানে ফিরে না আসে।' হিন্দু মুসলমানের মিলনের প্রতীক গান্ধীজী সাধ্যমত চেষ্টা করেও এই সভায় মুসলমানদের কাছ থেকে কোন উত্তর আদায় করতে পারেননি। ১২ নভেম্বর 'স্টেটস্‌ম্যান' লিখেছে — 'সভার সকলে গান্ধীজীর কথা শুনলেন। তারপর ধীরে ধীরে চলে গেলেন।' [63]

সেদিন নোয়াখালিতে গান্ধীজীর যতটা না প্রয়োজন ছিল, তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল একজন মুসলমান নেতার। তিনি যদি বলতে পারতেন যে, 'তোমরা যা করছো তা ইসলাম ধর্ম বিরোধী' তাহলে হয়ত অবস্থা সামাল দেওয়া যেত। কিন্তু মুসলিম লীগের বা কংগ্রেসের কোন মুসলমান নেতা ওখানে আদৌ যাননি। তাই তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনী দুঃখ করে বলেছেন —

" What was needed in Noakhali was not a Hindu leader .... The need was for a Muslim leader, preferably a member of the Muslim League, who could have spoken to them with religious authority and told them that they had misconcieved Islam. ..... But no Muslim leader from outside, whether belonging to the League or the Congress, ever visited Noakhali." [From 'Gandhi: His Life and Thought, page-262.]

আমাদের মধ্যে অনেকেই গান্ধীজীর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ উত্থাপন করছেন। একটি অভিযোগ হচ্ছে 'তিনি অস্পৃশ্য জনগণের অধিকার দিতে রাজি ছিলেন না। তিনি তৎকালীন অস্পৃশ্যদের উন্নতির জন্য কিছুই করেননি।' অন্য একদল বলছেন,'গান্ধীজী খুব অনৈতিক ভাবে মুসলিম তোষণ করেছেন। তাঁর একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞান ছিল যেকোন ত্যাগের বিনিময় হিন্দু মুসলমান ঐক্যের মাধ্যমে ভারত বিভাজন ঠেকানো।' সেই গান্ধীজী কিন্তু নোয়াখালি পরিভ্রমণকালে নমঃ এলাকায় ধ্বংস দেখে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। ৩.১.১৯৪৭ তারিখে তাঁর ডায়রীতে লিখলেন,"ঘুরতে গিয়ে আমি নমঃশূদ্র এলাকায় ধ্বংসযজ্ঞ দেখলাম। ভাবছি, মানুষ তার ধর্ম বা নিজের স্বার্থের কারণে এত নীচে নামতে পারে!" [64] কিন্তু, নমঃদের উদ্ধারকর্তা বলে যিনি দাবি করতেন সেই যোগেনবাবু ঐ সময় নোয়াখালিতে তাঁর স্বজাতি নমঃদের কোন ক্ষতি হয়েছে, এমন কোন প্রমাণ খুঁজে পাননি।

আজ কল্পলোকের গল্পকথার নায়কদের দূরবীণে ধরা পড়েছে যে, বিভাগ-পূর্ব বাংলার অধিকাংশ মুসলমানদের মধ্যে ছিল (এখনও আছে সম্ভবত) একটা প্রগতিমনস্কতা আর উদার সহনশীলতা, যা নাকি মিলনপন্থী ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণ। সম্ভবত আজকের এই সব নায়করা ১৯৭১-এ নিষ্পাপ কচি খোকা ছিলেন। একটু খোঁজ নিলে এরা আজ জানতে পারবেন

তাঁদের বাবা-কাকা এবং নিজেরাও এই ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু কেন? প্রগতিমনস্ক, সহনশীল, উদারপন্থী এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ বর্জিত পাকিস্তান বা বাংলাদেশ কেন ত্যাগ করলেন তাঁরা? এনারা কি উত্তর দেবেন বা আদৌ উত্তর দেবেন কিনা জানি না। তবে এর উত্তর রয়েছে কোরানের ৯/২৮ নং আয়াতে যেখানে খুব পরিষ্কার করে বলা হয়েছে — "পুতুল পুজারীরা অপবিত্র।" এঁরা ১৯৪৬ সনের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল দেখলে বুঝতে পারবেন, সেদিন বাংলার প্রায় সব মুসলমান ভোটদাতা ভারত ভেঙ্গে পাকিস্তান গড়ার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। ফলে অখণ্ড ভারতের দাবিদার জাতীয়তাবাদী মুসলিম প্রার্থীদের প্রায় সকলের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। লীগ মুসলিম ভোটারদের কোরানের অপরিবর্তনীয় 'পবিত্র-অপবিত্র তত্ত্ব' ঠিক ঠিক বোঝাতে পেরেছিল বলেই এ কাজ সম্ভব হয়েছিল।

'পুতুল পুজারীরা অপবিত্র'; কিন্তু তাদের মা-বোন-স্ত্রীদের ধর্ষণ করতে এতটুকু বাধা নেই। মানবতা-বিরোধী এই জঘণ্যতম অপকর্ম করলে পূণ্য হয়, এমন বিধান দেবার অনেক মোল্লা আছে তাদের মধ্যে। প্রতিটি দাঙ্গার সময় এই বিধান প্রচারিত হয় পাড়ায় পাড়ায়। ২০০৩-এর জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেও একদল মৌলবাদী নরপশু বাংলাদেশে মোড়েলগঞ্জের বহরবুনিয়া গ্রামে স্বামীকে বেঁধে রেখে এক সন্তানের 'যুবতী-মা' সবিতা হালদারকে ধর্ষণ করতে করতে মেরে ফেলেছে। গত ৭ ও ৮ জুন ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা 'জনকণ্ঠে' এ খবর প্রকাশিত হয়েছে। [website: www.janakantha.net] যোগেন্দ্র-পন্থী নায়করা ইচ্ছে করলে আমাদের জানাতে পারেন যে, বর্তমান বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমানরা কোন পক্ষে — সবিতা হালদারদের ধর্ষণ করার পক্ষে, না বিপক্ষে?

অনেকেই হয়ত জানেন যে, সাংবিধানিক ভাবে হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতা দূর হয়েছে ১৯৪৭-এর ২৯ এপ্রিল। ["Untouchability" is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disabilty arising out of "Untouchability" shall be an offence punishable in accordance with law." Article-17, Constitution of India.] এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দীর্ঘ দিনের আন্দোলনের ফলে এই ঐতিহাসিক বিধান পাশ করা সম্ভব হয়েছে। এর প্রধান কৃতিত্ব অবশ্যই ডঃ আম্বেদকরের। তবে এ ব্যাপারে গান্ধীজী এবং অন্যান্য বর্ণ হিন্দুদের অবদান কম নয়। প্রমাণ হিসাবে বলা যায় যে, ১৯৩২-এর ২৪ সেপ্টেম্বর বম্বেতে অনুষ্ঠিত হিন্দু নেতাদের এক কন্‌ফারেন্সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বলা হয় যে, 'এখন থেকে জন্মের কারণে কাউকে অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা যাবে না।'[65] এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল গান্ধীজীর নির্দেশেই। কিন্তু মুসলিম ধর্মশাস্ত্র মতে 'পুতুল পুজারীরা অপবিত্র', 'হীন' — এ সব ঘৃণ্য বিধি বিধান পরিবর্তনের জন্য আজ পর্যন্ত কতজন মুসলমান এগিয়ে এসেছেন? দু'একজন সামান্য সাধারণ প্রতিবাদ করলেও তার বিন্দু মাত্র মূল্য আছে কি? প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মন-প্রাণ ঢেলে লীগের সেবা করেও হিন্দু হিসাবে নিম্নতম সম্মানটুকুও

পাননি যোগেনবাবু।

নোয়াখালির হিন্দু নিধন যজ্ঞ শেষ হতে না হতেই হাজার হাজার হিন্দু উদ্বাস্তু হয়ে কোলকাতায় আশ্রয় নিতে সুরু করেন। মুসলিম লীগ এবং সরোয়ার্দির পরিকল্পিত হিন্দু গণহত্যার পর চারদিকে যে প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে তাতে সরোয়ার্দি ও এই কুখ্যাত দাঙ্গাবাজের সহযোগী হওয়ার অপরাধে যোগেনবাবুর জীবন সংশয় হয়ে ওঠে। চার দিক থেকে আসতে থাকে খুনের হুমকি। সেদিন যোগেনবাবুকে আশ্রয় খুঁজতে হয়েছিল তাঁর প্রতিবেশী কাষ্ঠ হিন্দুদের কাছে যাদের গালাগালি করাই ছিল তাঁর রাজনীতির একমাত্র মূলধন। এই দুঃসময়ে বর্ণ হিন্দুরাই তাঁকে উন্মত্ত হিন্দু জনতার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। যোগেনবাবুর ভাষায়, "এ কথা স্বীকার না করিয়া পারিতেছি না যে, উন্মত্ত হিন্দু জনতার রোষ হইতে কাষ্ঠ হিন্দুরাই আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।" [Mr. Mandal's R.L., clause -3]

১৯৪৬-এ মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা স্যার ফিরোজ খান নুন ডঃ আম্বেদকরের কাছে একটি চিঠি দিয়ে তফসিলী জাতিকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানায়। [66]

পশ্চিমবঙ্গের 'দলিত' সহ হিন্দুদের অনেকেই বুঝতে চান না যে, 'প্রগতিমনস্কতা' বা বিধর্মীদের ব্যাপারে 'সহিষ্ণুতা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' মুসলমানদের অভিধানে একেবারেই অনুপস্থিত। মুসলমান নেতাদের সঙ্গে কাজ করতে করতে যোগেনবাবু এই ব্যাপারটি খুব পরিচ্ছন্নভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই চোখের জল ফেলতে ফেলতে লিখেছেন, "মহান শরিয়তী বিধানে কেবলমাত্র মুসমানদেরই শাসক হওয়ার কথা আছে। সেখানে হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মের সংখ্যালঘুরা 'জিম্মী' হিসাবে বসবাস করতে পারে।" বাবাসাহেব লিখেছেন,'বাস্তববাদীরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে মুসলমানরা হিন্দুদের কাফের হিসাবেই গণ্য করে। এই কাফেরদের রক্ষা করার চেয়ে মেরে ফেলাই উচিত'। [67]

সামান্য সাধারণ ব্যতিক্রম ছাড়া মুসলমানরা যা যা করে তার সবই ইসলাম ভিত্তিক। তাদের ধর্মীয় নেতারা ইসলামের যে ব্যাখ্যা দেন, মুসলমান নেতা ও কর্মী, এমনকি সাধারণ গৃহস্থরাও তার বাইরে কিছুই ভাবতে পারে না। তাদের চিন্তা চেতনা, রাজনীতি, সমাজনীতি, ইহকালের আশা আকাঙ্খা, পরকালের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি সবই ইসলামিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে। তারা যে রাষ্ট্রে থাকবে তা হবে 'ইসলামিক রাষ্ট্র'। শুধু 'মুসলিম পেনাল কোড'-টি অপছন্দের। তাদের প্রত্যাশিত অর্থনীতি হচ্ছে 'ইসলামিক অর্থনীতি'। তাদের যে কনফারেন্স হয় তার নাম 'ইসলামিক কনফারেন্স'। এ ব্যাপারে কোন আপোষের জায়গা নেই তাদের অভিধানে।

তবে আমরা এ কথা বলছি না যে, মুসলিম সমাজে কোন প্রগতিমনস্ক মানুষ নেই। সীমান্ত গান্ধী গফফার খান, করিম ভাই চাগলা (এম. সি. চাগলা), কাজী আবদুল ওদুদ, কবি নজরুল ইসলাম, রেজাউল করিম সাহেবদের মত কিছু সংখ্যক প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এখনও হয়ত ২/৪ জন আছেন। কিন্তু এঁরা মুসলমান মোল্লা-মৌলভী-রাজনীতিকদের বিচারে

পাক্কা কাফের। এঁরা কোন দিন কোন জেহাদী দাঙ্গাকে থামাতে পারেননি। আজকের বাংলাদেশে অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, আহমেদ শরীফ (বর্তমানে প্রয়াত) ও শাহরিয়ার কবীরের লেখার সঙ্গে আমরা বিশেষ পরিচিত। এঁরা পণ্ডিত ব্যক্তি এবং সজ্জন মানুষ। কিন্তু যখন দাঙ্গা সুরু হয় তখন কোন হিন্দুকে বাঁচানো তো দূরের কথা, নিজেদেরকেই পালিয়ে বাঁচতে হয়। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী তো পালিয়েও বাঁচতে পারেননি। কবি দাউদ হায়দার ও লেখিকা তসলিমা নাসরিণকে নির্বাসনে যেতে হয়েছে। পক্ষান্তরে বিগত ১০০ বছরের মধ্যে গান্ধীজী, নেহেরুজী, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, গুলজারি লাল নন্দাজী ছাড়াও শত শত হিন্দু দাঙ্গা থামাতে গিয়েছেন। আজও ভারতে দাঙ্গা থামাবার কাজে হিন্দুরাই এগিয়ে যান। বাংলাদেশে আজও যখন একতরফা হিন্দু গণহত্যা বা হিন্দু নারী ধর্ষণ হয় তখন প্রগতিমনস্ক মুসলমানরা নিরাপদ দূরত্বে থেকে নিরাপদ ভাষায় বিবৃতি দেওয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারেন না। ওখানকার লীগ বা জামাতপন্থী রাজনৈতিক নেতাদের বিবৃতিগুলো এমন রঙে রাঙানো থাকে যার পরিষ্কার অর্থ 'দাঙ্গা চালিয়ে যাও'। এ ব্যাপারে কেউ অন্য রকম তথ্য জানালে খুশি হব।

আজ পর্যন্ত পৃথিবীর যে সব দেশে সংখ্যালঘু বিনিময় হয়েছে তার এক দিকে মুসলমান এবং অপরদিকে অমুসলমান। যে সব দেশে মুসলমানরা সংখ্যায় কিছুটা ভারী সে সব দেশের সরকার তাদের নিয়ে চরম বিপদের মধ্যে আছেন। ভূমধ্য সাগরের সাইপ্রাস দ্বীপে যে লোক বিনিময় হয়েছে তার এক পক্ষ মুসলমান এবং অপর পক্ষ অমুসলমান (খৃস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী)। '৪৭-এ ভারতের পাঞ্জাবে বেসরকারী ভাবে যে লোক বিনিময় হয়েছে তার এক পক্ষ মুসলমান এবং অপর পক্ষ হিন্দু, শিখ এবং অন্যান্যরা। ১৯২৩ সনে ইওরোপের বুলগেরিয়া, তুরস্ক ও গ্রীসেও অনুরূপ প্রেক্ষাপটেই লোক বিনিময় হয়েছে।

ইহুদিদের আরব ছাড়া করার নির্দেশ দিয়েছিলেন নবী মোহাম্মদ নিজেই। যোগেনবাবুও এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন তার পদত্যাগ পত্রে (অনু-২৪)। মহানবী বলতেন, "একমাত্র মুসলমান ছাড়া ইহুদী খৃষ্টান সবাইকে আমি আরব ছাড়া করব।" [68]

মহানবী যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখনও তিনি ইহুদীদেরকে আরব ছাড়া করার কথা বলেছেন। (হাদীস নং ২৮৮, বুখারী শরীফ, খণ্ড-৪, পৃ-১৮৩) নবী মোহাম্মদ বলতেন, "তোমাদের জানা উচিত এই পৃথিবীর মালিক আল্লা এবং তাঁর রসুল।"

এ সব তথ্য প্রমাণ করে যে, ইসলাম অনুসারীদের সিংহ ভাগ প্রগতিমনস্ক তো নয়ই; বরং চূড়ান্ত ভাবে অসহিষ্ণু, রক্ষণশীল ও সাম্প্রদায়িক। তাদের আচার আচরণ রীতি-নীতি বিশ্ব মানবতার কাছে যত আপত্তিকরই হোক না কেন, তাদের নিজেদের কাছে তা অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয়। অমুসলমানদের কাছে তাদের সাফ ফরমান 'ইসলাম অথবা মৃত্যু'। কেবল ধর্মগুরু হানিফা-পন্থী মুসলমানরা একটি বিকল্প দিয়েছেন। তা হচ্ছে জিজিয়া কর প্রদানের বিনিময়ে 'জিম্মী' হয়ে বেঁচে থাকা। এটাই হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক এবং নৃশংস মৌলবাদ। এই মৌলবাদ পৃথিবী থেকে বৌদ্ধধর্ম বিলীন করে দিয়েছে। [69] মুসলিম

দেশগুলি থেকে হিন্দুদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। কিছুটা ব্যতিক্রম বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়া। আজ যারা পদত্যাগ পরবর্তী যোগেনবাবুকে আলোচনার বাইরে রেখে পদত্যাগ-পূর্ব যোগেনবাবুর ভ্রান্ত নীতির অনুগামী হয়ে মুসলমানদের মধ্যে প্রগতিমনস্কতা ও সহনশীলতা আবিষ্কার করছেন নিঃসন্দেহে তাঁরা ভ্রান্তদর্শী। তাঁরা কি বাবাসাহেবের চিন্তাধারা, যোগেনবাবুর পদত্যাগপত্র কিংবা বাংলাদেশ হিন্দু শূণ্য করার পরিকল্পনা থেকে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করবেন না?

শনিবার, ১২ এপ্রিল, ২০০৩ তারিখে কোলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পাতায় প্রকাশিত একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ইরাকের সাদ্দাম ভক্ত একজন মহিলা তার তর্জনী তুলে জনৈক মার্কিন ট্যাঙ্ক কমান্ডারকে ধমক দিয়ে বলছেন, 'এই মুক্তি চাই না।' উত্তরে ঐ কমান্ডার নীরব। অনেক যোগেন্দ্র ভক্ত আমেরিকার ইরাক আক্রমণকে কোন প্রকারে সমর্থন করেন না। এ ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে আমরা একমত। কিন্তু একটি প্রশ্ন রাখছি তাঁদের কাছে — বিগত ১ হাজার বছরের মধ্যে ভারত বার বার মুসলমান দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মুসলমানরাই জিতেছে। ২/৪ জন দেশদ্রোহী ছাড়া কোন হিন্দুই মুসলমানদের ঐ বিজয়কে মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন পুরুষ বা মহিলা কোন বিজয়ী মুসলমানকে ঐ ধরনের প্রশ্ন করতে পেরেছে কি? তাছাড়া এই ধরনের প্রশ্ন শোনার মত মানসিকতা ও সহনশীলতা আছে কি কোন মুসলমানের? স্মরণ করে দেখুন, যোগেনবাবু ১৯৪৭-এর ১০ আগস্ট ১ দিনের সভাপতিত্ব পেয়ে গণপরিষদে উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, "The people of the minority communities in Pakistan may be assured as they have been in the past by the Muslim League leaders and particularly by Mr. Jinnah that the people of the Minority Communities ***will not only be treated justly and fairly, but they will be treated generously too."*** (ম. যোগেন্দ্রনাথ-২, পৃ-৯২-৯৩) এর আগে, '৪৬-এর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে মুসলমান এবং মুসলিম লীগের নেতা-পাণ্ডারা নোয়াখালির তফসিলী সহ সর্বস্তরের হিন্দুদের উপর কতটা ***'justly, fairly and generously'*** আচরণ করেছে, তা ঐ সময় নিশ্চিত ভুলে গেছিলেন মণ্ডল মশাই। মন্ত্রিত্ব এবং গাড়ী-বাড়ীর মোহই কি তাঁকে ঐ পাপবিদ্ধ বিস্মরণের পথে নিয়ে যায়নি ?

লিয়াকত সাহেবদের সহনশীলতা, প্রগতিমনস্কতা ও মিলনপন্থী সংস্কৃতির দৌড় এত বেশি ছিল যে, যোগেনবাবু পাকিস্তানের মাটিতে বসে পদত্যাগ পর্যন্ত করতে পারেননি। তাঁর লক্ষ লক্ষ ভাই-বোনদের নেকড়ের মুখে ফেলে রেখে এসে পদত্যাগের কাজটি তাঁকে করতে হয়েছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী এই ভারতে বসে। সৃষ্টিকর্তা মহান খোদার শ্রেষ্ঠ বান্দা মুসলমানদের অধীনে দীর্ঘ দিন ধরে মন্ত্রিত্বের চাকুরী করার পরে তাঁকে বলতে হয়েছিল, "পাকিস্তানী নেতারা কবে হইতে সত্য ও সততার আর্য মন্ত্রের ভক্ত হইয়া পড়িলেন? তাঁহাদের ইসলামী

গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের একি নতুন রূপ।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২/৩২৯) তিনি আরও বলেছিলেন, "পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ এমন সব লোকই চান যাহারা তাঁহাদের প্রত্যেকটি কথায় সায় দিয়া চলিবে এবং কোন কিছু না ভাবিয়া সর্বক্ষণ ইসলামী সাম্য সৌভ্রাতৃত্বের গুণগান করিবে।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২/৩২৯) যাঁরা এখনও বলছেন 'দলিত-মুসলিম ঐক্যের কোন বিকল্প নেই' তাঁরা জেনে রাখুন, মহম্মদ বিন কাশিম, সুলতান মাহমুদ থেকে আহমদ শাহ্ আবদালি পর্যন্ত বর্বর আক্রমণকারীদের হাতে যে কোরান ছিল, সেই একই কোরান ছিল জিন্নাহ্‌র হাতে এবং ঐ একই কোরানের উচ্চ আদর্শ বাস্তবায়নের কথা বার বার বলতেন লিয়াকত আলি সাহেব। ইরাকের সাদ্দাম হোসেন, পাকিস্তানের পারভেজ মোশারফদের হাতেও ঐ একই কোরান আছে। আজ আপনারা যাদের সঙ্গে ঐক্য করতে চান তাদের হাতেও ঐ একই কোরান আছে। এই কোরানের বিচারে আপনারা অপবিত্র (কোরান- ৯/২৮)। অপবিত্র কাফের হিসেবে আপনাদেরকে তাঁদের প্রত্যেকটি কথায় সায় দিয়ে চলতে হবে এবং কোন কিছু না ভেবেই সর্বক্ষণ ইসলামী সাম্য সৌভ্রাতৃত্বের গুণকীর্তন করতে হবে।

* * *

অন্তর্বর্তী সরকারের স্বর্ণ সিংহাসন

" তফসিলী সম্প্রদায় থেকে লীগের মনোনীত ছিলেন মিঃ মণ্ডল, যিনি একজন ল' মেম্বার *(মন্ত্রী)* .... (ব্যক্তিগত মন্তব্য পরিহার করা হল)। তিনি সাধারণত দেশের তফসিলী এলাকায় ঘুরে ঘুরে সভা করতেন। যখন তিনি কেবিনেট মিটিং-এ আসতেন তখন তিনি চুপ থাকতেন অথবা বোকার মত আচরণ করতেন। **[..... he is silent or silly] "** — লর্ড ওয়াভেল। [70]

কোলকাতার গণহত্যা লীগের বন্ধু মণ্ডল মশাইকে বিচলিত করতে পারেনি। তিনি মুসলিম লীগের সেবায় নিজেকে অটল অচল রাখতে পেরেছেন। না পেরেই বা উপায় কি! মন্ত্রিত্ব, পত্রিকা ও প্রেস — এ সব ঠিক রাখতে অচলা ভক্তির যে একান্ত প্রয়োজন।

যোগেনবাবু তফসিলী সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে মুসলিম লীগের প্রতি একটা ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতার ভাব সৃষ্টি করার চেষ্টা করতেন। এর জন্য তিনি ১৬ আগষ্ট ('৪৬) কোলকাতার শহীদ মিনারে মুসলিম লীগ আহুত সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং লীগ নেতাদের সঙ্গে হরতাল সহ অন্যান্য কার্যক্রম সফল করার জন্য সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। দাঙ্গায় নিহত এবং ধর্ষিতা হতভাগ্যদের কথা তার পত্রিকায় প্রকাশ করা হতো না; এমনকি চাঁদপুরের হাইমচর সহ অন্যান্য স্থানে শত শত তফসিলীদের নিহত হওয়ার সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকা সত্ত্বেও না। এ কারণেই তাঁর 'জাগরণ' পত্রিকার সেদিনের সম্পাদক শ্রীঅপূর্ব লাল মজুমদারের সঙ্গে মতভেদ ঘটে। ফলে তাঁকে পত্রিকার সম্পাদনা ছেড়ে দিতে হয়। এভাবে সঠিক তথ্য প্রকাশ না করে লীগের প্রতি যোগেনবাবুর কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্যের প্রমাণ দিতে হয়েছে কঠোরভাবে। হাইম চরের নারকীয় ঘটনাকে চাপা দিতে যোগেনবাবুকে মিথ্যাচারের আশ্রয় নিতে হয়েছে। এর বর্ণনা দিয়েছেন অপূর্ববাবু এই ভাবে —

" আমি কোলকাতা পৌঁছে ছাত্র-কর্মীদের সঙ্গে দেখা করি। তারা আমাকে জানাল যে, শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল প্লেনে চড়ে নোয়াখালি পরিদর্শন করেছেন এবং তিনি এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, হাইমচরের ২০ হাজার নমঃশূদ্রদের মধ্যে কেউ কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হননি; কারও সম্পদের এতটুকু ক্ষতি হয়নি। কোন লুঠপাট হয়নি। হাট, বাজার, স্কুল সব ঠিকঠাক চলছে।" [71]

নোয়াখালিতে তাণ্ডব শুরু হয় ১০ অক্টোবর। আর যোগেনবাবুর নাম সহ মুসলিম লীগের পাঁচজন মনোনীত সদস্যের (Nominee) নাম ভাইসরয়ের কাছে পেশ করা হয় ১৪

অক্টোবর। সেদিন জিন্নাহ্ সাহেব 10 AURANGZEB ROAD, NEW DELHI থেকে যে চিঠি লিখেছিলেন লর্ড ওয়াভেলের কাছে তার ভাষা হচ্ছে এই —

Dear Lord Wavell,

I thank you for your letter of October 13. I am now sending you names of 5 nominees on behalf of the Muslim League as in our interview of yesterday.

1. Mr. Liakat Ali Khan.
   Hon. Secretary, All India Muslim League, M.L.A. (Central).
2. Mr. I. I. Chundrigar, M.L.A (Bombay)
   Leader, Muslim League Party in the Bombay Legislative Assembly and President of the Bombay Provincial Muslim League.
3. Mr. Abdur Rab Nishtar, Advocate (N.W.F.P.), Member Working Committee All India Muslim League, Committee of Action and Council.
4. Mr. Ghazanfar Ali Khan, M.L.A. (Punjab), Member, Council All India Muslim League, Council Provincial Muslim League and Member of the Punjab Provincial Muslim League Working Committee.
5. Mr. Jugandra *(Jogendra)* Nath Mandal, Advocate (Bengal), at present Minister of the Bengal Government.

Yours sincerely,
M. A. JINNAH

[Document No. 453. Page 726 of Transfer of Power, Vol . 8.
Mr. Jinnah to Field Marshal Viscount Wavell R/3/1/118: f 161]

(যোগেনবাবুকে একজন 'Advocate' হিসাবে দেখানো হয়েছে। তিনি যে তফসিলী ফেডারেশনের প্রতিনিধি এমন কোন প্রমাণ নেই এই চিঠিতে।)

মিঃ মণ্ডল যেভাবে মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন এবং মন্ত্রিত্ব রক্ষার জন্য যে ধরনের পন্থা-পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, মুসলিম লীগের অনেক নেতাদের কাছেই পরবর্তীকালে তা' ঘৃণিত হয়েছে। প্রখ্যাত মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশিমের ভাষায় — '১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত .... দু'তিন জন মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন লোক দেখানো এবং গৃহ শত্রু।' [72]

কোলকাতা ও নোয়াখালির হিন্দু গণহত্যার পর দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে বাংলার বিভিন্ন

স্থানে। দাঙ্গা শুরু হয় বিহার উড়িষ্যা সহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও। এই সব ঘটনা মুসলিম লীগের দলবদ্ধ গুণ্ডামির ফল। এরই পরবর্তী ফল লোক বিনিময়হীন দেশ ভাগ এবং পাকিস্তানে গণহত্যা ও হিন্দু বিতাড়ন। তারপর থেকে উপমহাদেশে উদ্বাস্তু সমস্যা, কাশ্মীর সমস্যা, বিচ্ছিন্নতার সমস্যা, আতঙ্কবাদী সমস্যা সহ অনেক জটিল জটিল সমস্যার জন্ম হয়ে চলেছে দিনের পর দিন। **দেশ ভাগ থাকা পর্যন্ত এর নিরসন হবে বলে আমরা মনে করি না।** যোগেনবাবু ও তার তফসিলী সহযোগীরা মুসলিম লীগের দেওয়া যে তিনটি স্বর্ণ সিংহাসনে বসে ক্ষণিকের জন্য রাজকীয় সুখ অনুভব করেছিলেন পরবর্তী কালে তারই মাশুল হিসাবে হায়েনার মুখে ছেড়ে দিতে হল পাকিস্তানের সকল হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান সহ তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের লোকজনকেও। **ঐ 'স্বর্ণ সিংহাসন' এই নিরীহ মানুষদের জীবনে উপহার দিয়েছে হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, অপমান ও মাতৃভূমি থেকে বিতাড়ন।**

কোলকাতার নারকীয় গণহত্যার পর কুখ্যাত মৌলবাদী মুসলিম লীগ সরকারকে গদিচ্যুত করার একটি সুযোগ এসেছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভায় সরোয়ার্দি মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ওঠার মাধ্যমে (২০ সেপ্টেম্বর,'৪৬)। অধিকাংশ সদস্য এত ক্রোধান্বিত হয়ে উঠেছিলেন যে লীগ মন্ত্রিসভার পতন অবধারিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সেদিন ৮ জন বিধায়ক (৪ জন কংগেসী এবং ৪ জন ইওরোপিয়ান) ভাগিয়ে মুসলিম লীগের পক্ষে এনে কুখ্যাত লীগ সরকারকে গদিতে রেখেছিলেন লীগের একনিষ্ঠ সেবক যোগেনবাবু। তিনি তার পদত্যাগ পত্রের ৩ নং অনুচ্ছেদে গভীর হতাশা নিয়ে লিখেছেন, "হিন্দুদের অসহনীয় দুর্দশা আমাকে গভীরভাবে শোকাভিভূত করিয়াছে। তথাপি আমি তখনও পর্যন্ত মুসলিম লীগের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি বজায় রাখিয়া চলিয়াছি। কলিকাতায় ব্যাপক নরহত্যার পরপরই সরোয়ার্দি মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আইন সভায় অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। তখন কেবলমাত্র আমারই চেষ্টায় চার জন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও কংগ্রেস দলের চারজন তফসিলী জাতির বিধায়কের সমর্থন আদায় করা সম্ভব হইয়াছিল, অন্যথায় লীগ মন্ত্রিসভার অবশ্যই পতন ঘটিত।"[73] কংগ্রেস থেকে আগত বিধায়করা হলেন — সর্বশ্রী দ্বারিকা নাথ বারুরী (ফরিদপুর), ভোলানাথ বিশ্বাস (যশোহর), হারাণ চন্দ্র বর্মণ (পাবনা-বগুরা) ও গয়ানাথ বিশ্বাস (ময়মনসিংহ)। তাঁদের সেদিনের মহান (!) ভূমিকার জন্য প্রত্যেকেই পুরস্কৃত হন। এঁরাও অকৃতজ্ঞ (!) ছিলেন না। ১৯৪৭-এর ২০ জুন পবিত্র শুক্রবার বাংলা ভাগের বিপক্ষে ভোট দিয়ে সমগ্র বাংলাকে পবিত্র ভূমি পাকিস্তানের মধ্যে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই সময় ('৪৬-এর ২৫ জুলাই থেকে) ডঃ আম্বেদকরের সঙ্গে যোগেনবাবুর যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। যোগেনবাবুর কাছে বাবাসাহেবের লেখা ১৩.১০.'৪৬ তারিখের চিঠিই তার বড় প্রমাণ। বাবাসাহেব লিখেছেন — " দীর্ঘদিন পর্যন্ত আপনার সঙ্গে যোগাযোগ নেই। তাই আপনার শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কে আমি চিন্তিত। আপনি এর মধ্যে ওয়ার্কিং কমিটির কোন সভায়ই যোগ দিতে পারেননি।

আমি আপনার কাছে ১ খানা বা ২ খানা চিঠিও লিখেছিলাম। জানি না আপনি সে চিঠি পেয়েছেন কি না।" (পরিশিষ্ট-৫, পৃঃ ১২৫)

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ১৯৪৩-এ মুসলিম লীগকে বাংলার গদীতে আসীন করা এবং ১৯৪৬-এ অবধারিত বিপর্যয়ের হাত থেকে মুসলিম লীগকে রক্ষা করার ব্যাপারে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন যোগেনবাবু। এর সঙ্গে দলিতদের অধিকার আদায়ের কি সম্পর্ক তা যদি বামপন্থী মন্ত্রী মহোদয় বা অন্য কেউ ব্যাখ্যা করে বলেন, তাহলে অনেকেই উপকৃত হবেন।

কোলকাতায় হিন্দু ও শিখ হত্যা, নোয়াখালিতে হিন্দু হত্যা (তফসিলী সহ) লুণ্ঠন, ধর্ষণ, বিতাড়নের পরেও যোগেনবাবুর মোহভঙ্গ হয়নি। অখণ্ড ভারতের অন্তর্বর্তী সরকারে মুসলিম লীগের 'নোমিনি' হিসাবে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করার সরোয়ার্দি মারফত মিঃ জিন্নাহ্‌র পাঠানো 'অফার' (কার্যত লোভনীয় টোপ) সরোয়ার্দি নির্ধারিত এক ঘন্টার মধ্যেই (!) গলাধকরণ করে নিলেন কারুর সঙ্গে আলোচনার অপেক্ষা না করেই। তাঁর স্বীকৃত নেতা ডাঃ আম্বেদকরের সঙ্গেও কোন আলোচনা হল না।

মুসলমান ভিন্ন কেউ মুসলিম লীগের সদস্য হতে পারে না। কিন্তু যোগেনবাবু হিন্দু হয়েও কী করে লীগের সদস্য হলেন এ প্রশ্ন সেদিন সকলের মুখে মুখে ফিরছিল। তাঁর সমবয়সী হিন্দু মুসলমান সমালোচকেরা অনেকেই সেদিন তাঁকে 'যোগেন আলি মোল্লা' বলে উপহাস করতেন। সম্প্রতি একজন দলিত নাট্যকার ব্যাপারটিকে গৌরবের কাজ বলে চিহ্নিত করেছেন তার একটি একাঙ্ক নাটকে। এ ছাড়া এক যোগেন্দ্র অনুগামী উঠতি হিন্দু কবি নিজেকে দলিত হিসেবে পরিচয় দিয়ে নিজের নামের সঙ্গে 'আলি' যোগ করেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯৪৫ সনের নির্বাচনে ইংলন্ডের ক্ষমতায় বসে শ্রমিক দল (Labour Party)। এই দল দীর্ঘকাল বিরোধী দলের ভূমিকায় থাকাকালীন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করে আসছিল। এবার ক্ষমতায় এসে সে কথা তারা ভোলেননি। দলের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এ্যাটলি ১৯৪৭-এর ২০ ফেব্রুয়ারি এক ঘোষণায় জানালেন যে, ভারতের শাসন ক্ষমতা ভারতবাসীর হাতে তুলে দেওয়া হবে ১৯৪৮ সনের জুনের মধ্যে। মিঃ এ্যাটলির ভাষণের বয়ানের জন্য দেখুনঃ ট্রান্সফার অব পাওয়ার, নবম খণ্ড, পৃ-৭৭৩।

ক্ষমতা হস্তান্তর সুনিশ্চিত। কিন্তু কিভাবে এবং কাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে সেটাই প্রশ্ন। অসাম্প্রদায়িক নীতির প্রবক্তা হিসেবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দাবি অখণ্ড ভারত। তাঁরা চান ধর্মনিরপেক্ষ ভারত। অপর দিকে সাম্প্রদায়িক আদর্শের ধারক মুসলিম লীগ ভারত ভাগ করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের দাবিদার। এই দুই দলের অবস্থান অনেকটা দুই ভিন্ন মেরুতে।

তারপর ভারতে পাঠানো হল বৃটিশ কেবিনেটের তিন মন্ত্রীর এক মিশন যার নাম 'কেবিনেট মিশন'। এই মিশন সকল দল মত ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের মতামত শুনে

একটি সূত্র বের করে এক পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এর নাম 'কেবিনেট মিশন প্লান'। এর মধ্যে অখণ্ড ভারত এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান দু-ই ছিল।

প্রথমে লীগ আপত্তি করলেও পরে উভয় দল এই প্লান মেনে নেয়। কিন্তু বিতর্ক দেখা দিল মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা নিয়ে। লীগ চায় কংগ্রেসের সম-সংখ্যক মন্ত্রী। শুনে সকলে চোখ ছানা বড়া করে বললো — মামা বাড়ীর আবদার নাকি! তোমরা জনসংখ্যার মাত্র এক চতুর্থাংশ, পঞ্চাশ ভাগ দাবি ওঠে কোন যুক্তিতে! যাই হোক, অনেক বিতর্কের পর লীগকে সরকারে টেনে রাখার স্বার্থে কংগ্রেস তা মেনে নেয়। তারপর গোল বাধে মুসলমান মন্ত্রীর সংখ্যা নিয়ে। কংগ্রেস ইতিমধ্যেই একাধিক মুসলমান মন্ত্রী নিয়েছে। লীগ বলছে ঐ সব 'মুসলমান' তাদের মুসলমান নয়। তাদের মন্ত্রীকে অবশ্যই মুসলিম লীগার হতে হবে। অপর দিকে লীগেরও এক আধজন হিন্দুকে মন্ত্রী করা প্রয়োজন। তা না হলে ভবিষ্যতে কিছুটা অসুবিধা দেখা দেবে। কি করা যায়? মুসলিম লীগে তো কোন হিন্দু নেই! হ্যাঁ উপায় একটা আছে। সেই ১৯৪৩-এ যোগেনবাবুকে লীগের সহযোগী সদস্যপদ দিয়ে রাখা হয়েছিল। সুতরাং তাঁকে এখন মন্ত্রী করা যেতেই পারে। যোগেনবাবু মন্ত্রী হলেন। এই রাজনীতিকে একজন মার্কসবাদী নেতা যখন দলিতদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম বলে চালাতে চান তখন তা অকল্পনীয় বিস্ময় উৎপাদন করে বৈ কি!

অমুসলমান যোগেনবাবুকে মুসলিম লীগের পক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করার প্রস্তাব নিয়ে মুসলিম লীগ নেতারা ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি রেগে আগুন হয়ে যান। কারণ অনেক চেষ্টার পর দু'পক্ষকে সমঝোতায় আনা গেছে। এই অযৌক্তিক প্রস্তাবে কংগ্রেস যদি বেঁকে বসে তো সমঝোতা ভেস্তে যাবে। কিন্তু মিঃ জিন্নাহ্ গোঁ ধরে বসলেন যে, এ ব্যাপারে তাদের অর্থাৎ লীগের স্বার্থ দেখতে হবে। লর্ড ওয়াভেল ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন এ ভাবে —

"আমি চাই তাঁরা একটি দল হিসাবে যতটা সম্ভব সৌহার্দ্য নিয়ে কাজ করবে। জিন্নাহ্ বললেন, এ কথা তিনি স্বীকার করেন ... কিন্তু তাঁদেরকে নিজেদের স্বার্থের কথা ভাবতে হবে।" [74] ওয়াভেল ব্যাপারটা বুঝলেন এবং যোগেনবাবুর নমিনেশন যে লীগের স্বার্থে তা মেনে নিলেন। যোগেনবাবু মন্ত্রিত্ব পেলেন। কিন্তু তখনই তিনি দিল্লী গিয়ে স্বর্ণ সিংহাসনে বসতে পারলেন না। তাঁর ডাইরেক্ট চাকুরীদাতা সরোয়ার্দি সাহেবের নির্দেশে তাঁকে পূর্ববঙ্গের বিশেষত নোয়াখালির দাঙ্গা দুর্গত এলাকায় গিয়ে লীগের কু-কীর্তি ঢেকে রাখার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল। এ ব্যাপারে পরে আরও আলোচনা করা হবে।

* * *

প্রথম কর্তব্য মুসলিম লীগের সেবা করা

"শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল আমাদেরকে শুধুমাত্র বিভ্রান্তই করেননি, তিনি তপসিলী ফেডারেশন তার সঙ্গে ডঃ বি. আর. আম্বেদকরকেও প্রতারিত করেছেন।"
— অপূর্বলাল মজুমদার।

১৯৪৬-এর ১৩ অক্টোবর যোগেনবাবু মুসলিম লীগ ও তাঁর নেতা মিঃ জিন্নাহ্ সাহেবের দয়ার দান গ্রহণ করলেন। তখন তিনি এতটাই উৎফুল্লিত হয়েছিলেন যে, লীগের প্রতি তাঁর অনুপম আনুগত্য প্রকাশ করে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেন, —'আমার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে মুসলিম লীগের সেবা করা।' **['MY FIRST DUTY MUST BE TO THE MUSLIM LEAGUE" - 'The Star of India', October 18, 1946]** তিনি ঐ বিবৃতিতে আরও বলেছেন যে, তাঁর দ্বিতীয় কাজ হবে ভারতের সেবা করা এবং তৃতীয় কাজ হিসাবে তিনি তফসিলীদের বিষয়াদি নিয়ে ভাববেন।

মুসলিম লীগের পত্রিকা 'স্টার'-এ ঐরূপ বিবৃতি দেখে সকলে অবাক। কারণ, নীতিগত ভাবে মুসলিম লীগের একজন মুসলমান সেবকের পক্ষেই ঐরূপ বিবৃতি সংগত ও স্বাভাবিক। ছাত্রনেতা শ্রীঅপূর্বলাল মজুমদার ছুটে যান শ্রীমণ্ডলের বাস ভবনে। সঙ্গে যান সর্বশ্রী খগেন বিশ্বাস, সন্তোষ কুমার মল্লিক, নগেন হীরা এবং আরও অনেক তফসিলী ছাত্র। তাঁরা তাঁর কাছে জানতে চান যে, সংবাদ মাধ্যমকে 'মুসলিম লীগের সেবা করা সংক্রান্ত' কোন বিবৃতি তিনি দিয়েছেন কিনা। এই প্রসঙ্গে অপূর্ববাবু শ্রীমণ্ডলকে বললেন, "আপনি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যাবেন না যে, আপনি তফসিলী জাতি ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতির সদস্য এবং তফসিলীদের ভোটে নির্বচিত। আপনার প্রথম কাজ হবে নির্যাতিত শ্রেণীর মানুষদের সেবা করা।" [75] উত্তরে যোগেনবাবু বললেন, তিনি ঐ ধরনের বিবৃতি দেননি। তখন প্রমাণ হিসাবে অপূর্ববাবু 'স্টার' পত্রিকায় প্রকাশিত মণ্ডল মশাইর ঐ বিবৃতি দেখালে তিনি তা অস্বীকার করেন এবং পরদিন ঐ পত্রিকায় এক প্রতিবাদ পত্র পাঠাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। ছাত্ররা চেয়েছিলেন প্রতিবাদ পত্রটি তাদের হাতে দিয়ে দেওয়া হোক। মণ্ডল মশাই তা দেননি। বললেন — পরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু হায়! তাঁর 'প্রতিবাদ পত্র' কোনদিন আলোর মুখ দেখতে পায়নি। আসলে ঐ বিবৃতি তাঁরই দেওয়া। প্রতিবাদ করে বিবৃতি দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাহলে তাঁর নেতা মিঃ জিন্নাহ্‌র সন্দেহের কারণ ঘটতে পারে এবং তাঁর প্রতি দয়ার দান ফেরত যেতে পারে। আর ওরকম প্রতিশ্রুতিভঙ্গ তাঁর মনে কোন দাগ কাটে না। ওসব তাঁর কাছে কথার কথা। তাই অবাক বিস্ময়ে ক্ষোভে দুঃখে

তাঁর অনেক দিনের সহযোগী অপূর্ববাবু পরবর্তীকালে লিখেছেন, — "শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল আমাদেরকে শুধুমাত্র বিভ্রান্তই করেননি, তিনি তফসিলী ফেডারেশন তার সঙ্গে ডঃ বি. আর. আম্বেদকরকেও প্রতাড়িত করেছেন।" [76]

ঐ সময় রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন ওঠে যে, লীগে অনেক যোগ্য যোগ্য প্রার্থী (অবশ্যই মুসলমান) থাকা সত্ত্বেও এত সব বিস্ময় বিরক্তি ও অসংগতির বোঝা ঘাড়ে নিয়ে লীগ প্রধান মিঃ জিন্নাহ্ যোগেনবাবুকে মন্ত্রী করে নেওয়ার ঝুঁকি নিতে গেলেন কেন? এর উত্তরে বলা যায় সেদিন হিন্দু মহাসভা বা কংগ্রেস ততটা না বুঝতে চাইলেও জিন্নাহ্ বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতের জনগোষ্ঠীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ তফসিলী ও আদিবাসীরা একত্রে একটা বিরাট শক্তি, যদিও তারা খুব একটা সংগঠিত নয়। এই শক্তিকে কাছে টানতে পারলে ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক পথেই তারা ভারতের রাজ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারবে। পরিণামে সারা ভারত আবার মুসলমানদের শাসনাধীনে আসতে পারবে। আমাদের বিশ্বাস **মিঃ জিন্নাহ্‌র ঐ তত্ত্বকে ভিত্তি করেই আজ দলিত-মুসলিম ঐক্যের শ্লোগান উঠেছে। পদত্যাগ-পূর্ব যোগেনবাবুকে 'মহাপ্রাণ' করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। যোগেনবাবুর পদত্যাগ পত্রটিকে কালো কাপড়ে ঢেকে রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ঐ একই উদ্দেশ্য নিয়ে তাকে 'মহাত্মা' করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে কি না তা বামপন্থী মন্ত্রী মহোদয়ই ভালো বলতে পারবেন।**

তাছাড়া বাংলা ও পাঞ্জাবের সম্প্রদায়গত জনবিন্যাস জিন্নাহ্ সাহেবকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, লীগের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পুরো বাংলা ও পুরো পাঞ্জাব পাকিস্তানের ভাগে পড়া অসম্ভব। কিন্তু যদি বাংলার তফসিলী ও আদিবাসীরা লীগের পক্ষ নেয় তবে বাংলায় হয়ত লীগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। তাদেরকে পক্ষে নেওয়ার কাজে যোগেনবাবু সহায়ক হবেন এটা ধরে নিয়েই যোগেনবাবুকে মন্ত্রিত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া লীগের প্রতি যোগেনবাবুর বিশ্বস্ততা প্রমাণিত। তিনি বাবাসাহেবের তত্ত্ব কে অস্বীকার করে লীগের আপদে বিপদে পাশে দাঁড়িয়ে বাংলার রাষ্ট্র ক্ষমতায় তাদেরকে টিকিয়ে রেখে একান্ত বিশ্বস্ত বন্ধুর কাজ করেছেন। আর তিনি ভিন্ন অন্য কোন হিন্দুকে দিয়ে পুরো বাংলাকে পাকিস্তানে টেনে নেওয়ার কাজে লাগানো সম্ভব ছিল না। একাজে যোগেনবাবুই যোগ্য এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি।

তফসিলীদের সঙ্গে পাওয়ার চেষ্টা মুসলিম লীগের বরাবরের। এঁরা যখন অস্পৃশ্য হিসাবে পরিচিত ছিলেন সেই ১৯০৯ সনের আদম শুমারীতে তারা তফসিলীদের হিন্দু হিসাবে না দেখানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন ইংরেজকে। এবং ইংরেজ তা মেনেও নিয়েছিল। এবার মিঃ মণ্ডলকে অন্তর্বর্তী সরকারে লীগের 'নোমিনী' করে লীগ প্রমাণ করতেচাইছে যে, হিন্দুরা নয়, মুসলমানরাই তফসিলীদের বড় বন্ধু।

যোগেনবাবু অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর পদত্যাগ পত্রের ৪ নং অনুচ্ছেদে একটা পূর্বশর্তের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, "আমার নেতা ডঃ আম্বেদকর আমার এই কাজ সমর্থন না করলে আমাকে মন্ত্রীপদ থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। অবশ্য সৌভাগ্যক্রমে

লণ্ডন থেকে তার অনুমোদন টেলিগ্রাম যোগে পেয়ে যাই।" এ ব্যাপারে কোন কোন মহল সন্দেহ প্রকাশ করলে যোগেন্দ্র অনুগামীরা একটি টেলিগ্রামের কপি প্রচার করছেন। কিন্তু ডঃ আম্বেদকরের নিজের লেখায় এ সবের সমর্থন মেলে না। কারণ, ২৯. ১০. '৪৬ তারিখে পিপ্‌ল্‌স এডুকেশন সোসাইটির সভাপতি মিঃ যাদবের কাছে লেখা একটি চিঠিতে বাবাসাহেব উল্লেখ করেছেন যে, 'মিঃ জিন্নাহ যে মিঃ মণ্ডলকে মন্ত্রিসভায় নিয়েছেন, এর মধ্যে একটি বিরাট রণকৌশল আছে।.......... কিন্তু আমরা আমাদেরকে বা তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে পারি না।.......... যদিও আমরা দু'টো সীট পেয়েছি, (তবুও বলব) আমরা দু'টো বড় দলের হাতের পুতুল হয়ে গেলাম।" (ম. যোগেন্দ্র., ১/২০৮) এ ছাড়া অন্যত্র তিনি লিখেছেন — "বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারে তফসিলীদের দু'জন প্রতিনিধি রয়েছেন। তাঁদের কারুরই তফসিলী জনগোষ্ঠীর প্রতি কোন আনুগত্য বা দায়বদ্ধতা নেই। একজন কংগ্রেসের মনোনীত এবং অপরজন মুসলিম লীগের মনোনীত।" [77] পরিষ্কারভাবেই এ কথার তাৎপর্য দাঁড়ায় এই, তফসিলীদের প্রতি যোগেনবাবু এবং জগজীবনবাবুর কোন প্রকার দায়বদ্ধতা নেই। কাজেই তাঁরা আমাদের স্বার্থ দেখবেন, তা আশা করা যায় না।

ডঃ আম্বেদকর দেশকে পরীক্ষামূলক ভাবে দশ বছরের জন্য ভাগ করে শাসন করা, ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন অনুকরণে পাঁচজন এক্সপার্ট দিয়ে দেশের সংবিধান রচনা করা, তফসিলীদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা সহ আরও অনেক পরামর্শ দিয়েছিলেন ক্যাবিনেট মিশনকে। তার কোন প্রতিফলন ক্যাবিনেট রিপোর্টে না থাকায় আম্বেদকর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এমন কি ৫০০০ শব্দের ঐ কেবিনেট মিশন রিপোর্টে 'সেডুলড্ কাস্ট' শব্দটা একবারের জন্যও উল্লেখ করা হয়নি। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর সংগঠনের প্রতিক্রিয়া বৃটিশ সরকার ও প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলিকে লিখে জানিয়েছিলেন যে, কেবিনেট মিশন যে ভুল করে গেছে তার কোন প্রতিকার না পেলে তফসিলীরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামতে বাধ্য হবে। ফেডারেশন ঘোষণা করে যে, ক্যাবিনেট মিশন তফসিলীদের প্রতি যেসব অবিচার করেছে তার প্রতিকার করতে লেবার সরকার ব্যর্থ হলে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে [Direct Action] নামা ছাড়া তাদের আর কোন পথ খোলা থাকবে না। [78]

যোগেনবাবু কি বাবাসাহেবের এই প্রতিবাদের কথা জানতেন না? মুসলিম লীগ এ প্রতিবাদের প্রতি তেমন কোন ভ্রুক্ষেপ করেনি। যোগেনবাবু সেই মুসলিম লীগের সেবা করে গেছেন চোখ কান বন্ধ করে।

কেবিনেট মিশন রিপোর্টে তফসিলীদের কোন স্বার্থ রক্ষিত না হওয়ার প্রতিবাদে ২০ জুলাই '৪৬ ফেডারেশনের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে আম্বেদকর সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন পুনা শহরে। অনেক দিন ধরে চলছিল এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন। পশ্চিম ও মধ্য ভারতের অনেক স্থানে ছড়িয়ে পড়ে ঐ আন্দোলন। শত শত সত্যাগ্রহীকে জেলেও যেতে হয়েছিল। বিচারে অনেকের জেল হয়েছিল ১৫ থেকে ৬০ দিন। অনেকের আবার জরিমানা হয়েছিল ২৫ থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত। (অমৃত বাজার পত্রিকা, ২৫/০৭/'৪৬) তফসিলীদের অস্তিত্ব

রক্ষার এই আন্দোলনে বাংলা থেকে সেদিন ক'জন সত্যাগ্রহী যোগেনবাবু পাঠিয়েছিলেন? আমাদের জানা মতে একজনও না। ডঃ আম্বেদকরকে যোগেনবাবু তাঁর নেতা বলে প্রচার করে থাকেন। কিন্তু সেই নেতার আয়োজিত ঐ বিশেষ আন্দোলনে তিনি অংশ নিলেন না কেন? কেন তিনি সেদিন বাবাসাহেবের কাছে একটি চিঠি (২৫.০৭.'৪৬) লিখেই তাঁর কর্তব্য সমাধা করেছিলেন? আমাদের বিচারে সেদিন তিনি লীগ নেতৃত্বের সঙ্গে তাদের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' সাথী হবার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন বলেই ও সব করার সময় পাননি।

মুসলিম লীগের অনুমতি ছাড়া তাঁর কোন কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না। তফসিলীদের সঙ্গে পেতে মুসলিম লীগ আগ্রহী, কিন্তু তাদের সামগ্রিক দাবি আদায়ের সর্বভারতীয় আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিরোধী। তা যদি না হবে, যোগেনবাবু যেমন মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস'-এর আন্দোলনকে তাদের নিজেদের সর্ব-ভারতীয় আন্দোলন বলে একাত্ম হয়েছিলেন, তেমনি তফসিলীদের নিজেদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার এই 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলনের সঙ্গে লীগ একাত্ম হতে পারলো না কেন? মুসলিম লীগ এগিয়ে এলে 'কংগ্রেস' ও 'মুসলিম লীগ' পক্ষ দু'টির মত 'তফসিলী ফেডারেশন'-কে আর একটি শক্তিশালী পক্ষ হিসাবে দাঁড় করানো অসম্ভব হতো না। তখন 'কংগ্রেস' ও 'মুসলিম লীগের'র মত সেডুল্ড কাস্ট ফেডারেশনও সমমর্যাদায় বিবেচিত হত। মুসলিম লীগ কিন্তু এটা চায়নি। কারণ তাদের প্রভু ইংরেজ এ কাজে অখুশী হত। তাছাড়া 'সেডুল্ড কাস্ট ফেডারেশন' সমমর্যাদায় বিবেচিত হলে দেশের রাজনৈতিক আবহ অন্যদিকে ঘুরে যেতে পারতো এবং তা মুসলিম লীগের পক্ষে সুস্বাদু হত না কিছুতেই।

বাংলা থেকে ডঃ আম্বেদকরের গণপরিষদের সদস্য হওয়ার পেছনে যোগেনবাবুর যে একটা ভূমিকা দেখা গেছে তার অন্তরালেও ছিল মুসলিম লীগের ছাড়পত্র। আসলে এটি ছিল ষড়যন্ত্রমূলক ছাড়পত্র। খাজা নাজিমুদ্দিনের ভাই শাহাবুদ্দীন সাহেব বার বার চাপ দেওয়ায় যোগেনবাবু ১১.০৭.'৪৬ তারিখ বিকেলে একটি টেলিগ্রাম পাঠান। এরই সঙ্গে একটি চিঠিও লিখলেন ঐ বিকেলেই। চিঠিতে যোগেনবাবু লিখেছেন, '*I sent you an "Immediate " telegram this afternoon requesting you to come to Calcutta. I was being repeatedly requested and pressed by Mr. Shahbuddin, brother of Sir Nazimuddin to send you the wire.* (পরিশিষ্ট -২, পৃ- ১২০) এর সুদূর প্রসারী লক্ষ্য হল — যোগেনবাবু তো তাদের পকেটে আছেনই। এখন সর্বভারতীয় নেতা ডঃ আম্বেদকরকে হাতে নেওয়া প্রয়োজন। এটা করতে পারলেই লীগের পোয়া বারো। কিন্তু হায়! যোগেনবাবুর মত ডঃ আম্বেদকরকে লীগের পোঁ-ধরা করতে পারা যায়নি কখনো। তফসিলীদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কিছুর সঙ্গে ডঃ আম্বেদকর যোগেনবাবুর মত আপোষ করেননি কোনদিন। অন্তর্বর্তী সরকারে তফসিলীদের ন্যায্য প্রতিনিধিত্বের জন্য যেমন আম্বেদকর লড়েছেন, তেমনি মুসলিম লীগের অন্যায্য দাবির বিরুদ্ধেও

কথা বলতে দ্বিধা করেননি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাবাসাহেব হিন্দু ধর্মের যেমন তীব্র সমালোচনা করেছেন, ইসলাম ধর্মেরও ঠিক তেমনি তীব্র সমালোচনা করেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বর্ণ হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের সম-সংখ্যক প্রতিনিধি রাখার অন্যায্য সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে ২৫ আগষ্ট '৪৬ সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে ডঃ আম্বেদকর বলেন —

"পাকিস্তান হওয়ার বরং যুক্তি আছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বর্ণ হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যা-সাম্যের সুযোগ দেওয়া মোটেও যুক্তিগ্রাহ্য নয়। আর অন্যান্য সংখ্যালঘুদের একত্রে চারটি আসনে সীমাবদ্ধ রাখাও আদৌ যুক্তিসংগত নয়। কারণ এঁদের (হিন্দুদের) মধ্যে একটি সম্প্রদায় হল তফসিলী যারা মুসলমানদের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের অনেক বেশি - - - - কাষ্ট হিন্দুদের সঙ্গে তুলনায় মুসলমানদের সমান দাবি যদি যুক্তিযুক্ত হয় তবে তফসিলীদের পক্ষে মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত প্রতিনিধিত্বের অন্ততঃ ৫০ ভাগ দাবি করা তো আরও যুক্তিযুক্ত।" [79]

এখানে উল্লেখ্য যে, অনেক দর কষাকষি, চিঠি চালাচালি ও তর্ক-বিতর্কের পর ১৪ জন সদস্য নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল। কংগ্রেস মনোনীত ৫ জন, মুসলিম লীগ মনোনীত ৫ জন এবং অন্যান্য ৪ জন। লীগের ধনুক ভাঙ্গা পণ ছিল, তাদের মনোনীত সদস্যকে অবশ্যই মুসলমান এবং লীগের সদস্য হতে হবে।

সামগ্রিক ভাবে তফসিলীদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে যোগেনবাবুর কোন মাথা ব্যথা ছিল না। যে করে হোক কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় একটা পদ এবং ২/৪ জন তফসিলীকে চাকুরী দিয়ে কিছু লোক হাতে রেখেই তিনি খুব খুশী ছিলেন। তফসিলী ফেডারেশনকে জলাঞ্জলি দিয়ে মুসলিম লীগের লোক হিসাবে তিনি কাজ করতে রাজি হয়ে যান। ফেডারেশনের নেতৃত্ব করার চেয়ে তিনি লীগের সেবা করাকেই মূল্যবান বলে বেছে নিয়েছেন। না হলে লীগের প্রতি তাঁর 'প্রথম কর্তব্য' ঘোষণা করলেন কি করে! আর যাঁদের ভোটে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের প্রতি তাঁর তৃতীয় কর্তব্য নির্ধারিত হল কোন ন্যায়তন্ত্রের বিধানে!

যোগেনবাবু মুসলিম লীগের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন। কিন্তু ডঃ আম্বেদকর ছিলেন লীগের বিপরীত ক্যাম্পের দিকে। ১৯৪৬ সনের ৩০ জুন কোলকাতায় ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে এক সভায় কংগ্রেসের সঙ্গে তফসিলী ফেডারেশনের শর্ত সাপেক্ষে একাত্মতা ঘোষণা করে এক আবেদনে তিনি বলেছিলেন, "কংগ্রেস ও তফসিলী ফেডারেশনের মধ্যে নীতিগত (ideological) কোন পার্থক্য নেই। কংগ্রেস তফসিলীদের দাবি 'পৃথক নির্বাচন' মেনে নিলে তারা আলাদা নেতৃত্ব তুলে দিয়ে একত্রে কাজ করতে পারতেন।" [80] মিঃ মণ্ডল এই সভায় সভাপতি ছিলেন।

ভারতের অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীর ভাগ্যে কী ঘটবে না ঘটবে এমন একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বাবাসাহেব যখন লণ্ডনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন ঠিক সেই সময়ে যোগেনবাবু মুসলিম লীগের 'নোমিনী' হিসাবে এবং বাবু জগজীবন রাম

কংগ্রেসের 'নোমিনী' হিসাবে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিয়ে প্রমাণ করে দিলেন যে, অস্পৃশ্যদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আলাদা ভাবে সংগ্রাম করার দরকার নেই। হয় মুসলিম লীগ নয়ত কংগ্রেস এ কাজ করে দেবে। তাই বাবাসাহেব এই দুই ভদ্রলোককেই 'পুতুল' বলে বর্ণনা করেছেন।

ডঃ আম্বেদকর যখন তৎকালীন অস্পৃশ্যদের অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য লণ্ডনে প্রধান প্রধান নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছিলেন, যোগেনবাবু তখন বাংলার বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে মুসলিম লীগের জয়গান গাইছিলেন। এই জয়গানের মূল কথা হচ্ছে, "তফসিলী জাতি হিন্দুদের আওতায় থাকিয়া ঘৃণিত জীবন যাপন করার চেয়ে মুসলমান অথবা অন্য কোন জাতির আওতায় স্বাধীন ও সম্মানের সহিত বাস করিতে বেশি পছন্দ করে।" (ম. যোগেন্দ্রনাথ-১, পৃ-২২০-২১)

ডঃ আম্বেদকর যখন ভারতের গণপরিষদের প্রথম বৈঠকে ভারতকে অখণ্ড ['an Independent Sovereign Republic'] রাখার জন্য শেষ বারের মত মুসলিম লীগকে আহ্বান জানিয়ে ঐতিহাসিক ভাষণ দিচ্ছিলেন (১৭.১২.'৪৬) যোগেনবাবু তখন ভারত ভাগে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ লীগের প্রচার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। সেদিন বাবাসাহেব বলেছিলেন — "আমি জানি, আজ আমরা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বহুধা বিভক্ত হয়ে আছি। আমরা এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা নিজেরাই যুদ্ধরত দল উপদলে বিভক্ত। এমনকি আমি এও স্বীকার করছি যে, সম্ভবত আমি নিজেই তেমন একটি (যুদ্ধরত) উপদলের নেতা। কিন্তু স্যার, এ সব সত্ত্বেও আমার পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস এই যে, কিছুদিন পরে অবস্থার এমন একটি পরিবর্তন হবে যখন আমরা একত্রিত হব। কোন বাধা-বিপত্তিই একে আটকাতে পারবে না। (উচ্চ প্রশংসা ধ্বনি) আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, আমাদের মধ্যে বিদ্যমান জাত-পাত ও কৃষ্টিগত বিভেদ থাকা সত্ত্বেও কোন না কোন ভাবে আমরা একত্রিত হব। (বিপুল হর্ষ ধ্বনি) আমার বলতে দ্বিধা নেই যে, আজ মুসলিম লীগ ভারত বিভাজনের জন্য যে আন্দোলন করছে তাকে ছাপিয়ে একদিন তাদের মনেই যথেষ্ট শুভ বুদ্ধির উদয় হবে এবং তারা নিজেরাই ভাবতে সুরু করবেন যে, অখণ্ড ভারত তাদের জন্যও মঙ্গলজনক।" [81]

শুধু ভারত নয় সমগ্র পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ সেদিন ডঃ আম্বেদকরকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সাধুবাদ জানাতে পারেনি লীগ, মিঃ জিন্নাহ্ এবং তাদের বন্ধু মিঃ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। মিঃ জিন্নাহ্ বলেছিলেন, 'আমরা পাকিস্তানের দাবি থেকে এক ইঞ্চিও সরছি না।' শুধু তা-ই নয়, ঐ সময়ে এক ব্যক্তিগত আলোচনা প্রসঙ্গে আকালি নেতা সর্দার বলদেব সিংহকে সঙ্গে পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন মিঃ জিন্নাহ্। তাঁকে বলেছিলেনঃ "বলদেব সিং, এই দেশলাই বাক্সটি দেখছেন তো! এই আকারের পাকিস্তানও যদি আমাকে দেওয়া হয়, আমি তা সানন্দে স্বীকার করে নেব। কিন্তু আমি আপনার সহায়তা-প্রার্থী। আপনি যদি শিখদের মুসলিম লীগের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজী করাতে পারেন তাহলে আমরা এমন এক

গৌরবজনক পাকিস্তান পাব যার দেউড়ি খাস দিল্লীতে যদি নাও হয় অন্ততঃ দিল্লীর কাছাকাছি হবে।" [82] শিখরা সেদিন মিঃ জিন্নাহ্‌র প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখান করেছিলেন তা ব্যাখা করার প্রয়োজন নেই।

মিঃ জিন্নাহ্‌ যতদিন কংগ্রেসে ছিলেন ততদিন ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর নেতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু যেদিন থেকে ইসলাম ভিত্তিক মুসলিম লীগে যোগদান করলেন যেদিন থেকে তাঁর চিন্তা-চেতনা ও নেতৃত্বের পরিধি সঙ্কুচিত হয়ে গেল। তিনি হলেন কেবল মাত্র লীগপন্থী মুসলমানদের নেতা।

মিঃ যোগেন মণ্ডল সেদিন গণপরিষদে প্রদত্ত বাবাসাহেবের ঐ ঐতিহাসিক বক্তৃতার কাণাকড়িও মূল্য না দিয়ে ৩১ ডিসেম্বর ('৪৬) কোলকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক তফসিলী ফেডারেশনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে মিঃ জিন্নাহ্‌র কণ্ঠে কণ্ঠ মেলাবার জন্য পাকিস্তানের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। বললেন, " মুসলিম লীগের যে পাকিস্তান তাহা হইল পূর্ণ পাকিস্তান।" (মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ- ১, পৃ-২৪৮) ***তিনি যদি সেদিন লীগের সঙ্গ ত্যাগ করে ডঃ আম্বেদকরের সঙ্গে একত্রিত হয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তেন তাহলে ভারতের ইতিহাস অন্য রকম লেখা হত না কি?***

ভারতের নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর সার্বিক মুক্তির পথ নির্দেশের ক্ষেত্রে ডঃ আম্বেদকরের অবস্থান যদি হয় উত্তর মেরুতে তবে যোগেনবাবুর অবস্থান ছিল দক্ষিণ মেরুতে, যদিও কিছু সময়ের জন্য বাবাসাহেব মণ্ডল মশাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। অথচ আজও ২/১ জন দলিত কলমচি বলছেন যোগেনবাবুর প্রতিটি কাজে বাবাসাহেবের সমর্থন ছিল। এখানেই থামেননি ওনারা, অতি আবেগের বশে বলছেন, যোগেনবাবুর প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল উভয়ের পূর্ব পরিকল্পিত। এ সব বক্তব্য অতিরঞ্জিত কল্পনার ফানুস ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ফানুস আপাতত বিভ্রান্তিই ছড়াবে।

যোগেনবাবু মুসলিম লীগের সহযোগী সদস্য হওয়ার পর মুসলিম লীগ এমন ভাবে প্রচার সুরু করে যেন তিনিই (যোগেনবাবু) তখন ভারতের তফসিলীদের অবিসংবাদিত নেতা। এতে লীগের লাভ হয়েছে অনেক। মিঃ জিন্নাহ্‌ তখন বলতে সুরু করেছেন যে, তিনি তফসিলী সহ ভারতে ৫০ ভাগ মানুষের প্রতিনিধি; তাঁর দাবির জোরও যুক্তি ২৫ ভাগ থেকে ৫০ ভাগে পৌঁছায়। ঐ কুকর্ম জিন্নাহ্‌ সাহেবের পাকিস্তান দাবির ভিত মজবুত করেছিল।

যোগেনবাবু তফসিলীদের সভায় কোন রাজনৈতিক বক্তব্য রাখতেন না। ভারতের রাজনীতি কোন দিকে যাচ্ছে, স্বাধীনতা পাওয়ার পর দেশের সামগ্রিক অবস্থা কেমন হবে এবং স্বাধীন ভারতে নির্যাতিত শ্রেণীর মানুষদের অবস্থানটাই বা কী হবে এমন কোন বিষয় তাঁর বক্তৃতায় স্থান পেত না। তাঁর বক্তব্যের প্রধান বিষয় ছিল তফসিলীদের উপর বর্ণহিন্দুদের অত্যাচারের কথা ও তাদের উদ্দেশ্যে গালাগাল, বিষোদ্‌গার এবং সত্য-মিথ্যা জড়িয়ে নোংরা মন্তব্য করা। এ বক্তব্য তফসিলীদের খুশী করত হয়ত, কারণ বহু কাল ধরে তাঁরা বর্ণ হিন্দুদের

হাতে বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হয়ে আসছিলেন। কিন্তু তাই বলে নির্যাতন থেকে মুক্তির উপায় কি মুসলিমদের সংগে একাত্ম হওয়া? এতেই কি মুক্তি আসবে? যোগেনবাবু কিন্তু তা-ই মনে করতেন। তিনি মুসলিম লীগের 'আদর্শ ও কর্মসূচী' পর্যালোচনা না করে কেবল সরোয়ার্দি এবং জিন্নার গালভরা ফাঁকা বুলিকে তফসিলীদের সর্বরোগহর মহৌষধি বলে মনে করতেন। তাই তিনি তাঁর স্বজাতিদের নিয়ে মুসলমানদের কাছাকাছি যেতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন, তফসিলী এবং মুসমান উভয়ই শ্রমজীবী কৃষক, পাশাপাশি জমি চাষ করে. তারা একই রকমের নির্যাতনের শিকার এবং সর্বোপরি উভয়ের দেহে একই রক্তস্রোত প্রবাহিত। তিনি তফসিলী জাতিদের বলতে থাকেন যে, তাঁরা যেন জিন্নাহ্‌কে মনে করেন তাঁদের ত্রাণকর্তা। আমরা আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, আজও (২০০২-০৩) যোগেনবাবুর অদূরদর্শী ও ভ্রান্ত নীতি, যা তিনি নিজেও স্বীকার করে গেছেন, তা সঠিক ও অনুকরণীয় বলে প্রচারের জন্য একদল দলিত বুদ্ধিজীবী তাঁদের শ্রম নষ্ট করছেন এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছেন।

যোগেনবাবু নিশ্চয়ই অবহিত ছিলেন না যে, কোরানের আমোঘ বিধানে মুসলমান ভিন্ন আর কেউ মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না। একই রক্ত প্রবাহ সেখানে নিতান্তই নগণ্য ব্যাপার। এর প্রমাণ তিনি হাতে নাতে পেয়েছিলেন; তবে ততক্ষণে ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। পাক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলিকে লেখা তাঁর পদত্যাগ পত্র এর প্রধান নিদর্শন। এর পরেও আজ যারা কোরান-হাদীসের কথা উহ্য রেখে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে প্রগতিমনস্কতা ও সহনশীলতা আবিষ্কার করে দলিত-মুসলিম ঐক্যের মাধ্যমে আমাদের মুক্তির পথ খোঁজেন তাদের আসল উদ্দেশ্য কী? তাঁরা কি সৌদি আরবের বাদ্‌শার দেওয়া 'ফয়সল পুরস্কার' পেতে চান?

জনসভায় বর্ণহিন্দুদের তুলোধোনা করলেও ব্যক্তি জীবনে যোগেনবাবু ছিলেন এর বিপরীত মেরুর মানুষ। অনেকটাই বর্ণহিন্দু ঘেঁষা। জীবনের অনেক কাজে তিনি বর্ণহিন্দুদের সাহায্য-সহযোগিতা চেয়েছেন এবং পেয়েছেন। এ ধরনের দু'চারটি ঘটনা উল্লেখ করছি —

১৯৩৭ সনে আইন সভার নির্বাচনে বরিশালের একটি অসংরক্ষিত আসনে যাঁরা তাঁকে দাঁড়াতে উৎসাহিত করেন এবং নির্বাচনে জিতিয়ে আনেন, তাঁরা সব উচ্চ বর্গীয় হিন্দু। তাঁরা কংগ্রেস নেতা জমিদার সরল দত্তের বিক্ষুব্ধ কর্মী। '৩৯ সনে বরিশাল শহরে জাতীয় কংগ্রেসের সভায় যাঁরা তাঁকে সভাপতি করেছিলেন সেই নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস এবং তাঁর সহযোগী নেতৃবৃন্দের প্রায় সবাই ছিলেন উচ্চবর্গীয় হিন্দু। অখণ্ড বাংলার মন্ত্রী থাকাকালীন '৪৬ সনে কোলকাতায় ব্যাপক হিন্দু হত্যার পর মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভা থেকে হিন্দুরা তাঁর পদত্যাগ দাবি করেছিলেন। কিন্তু তিনি পদত্যাগ করেননি। তখন ক্ষিপ্ত ও বিক্ষুব্ধ হিন্দুদের আক্রমণের হাত থেকে যাঁরা তাঁকে সেদিন বাঁচিয়েছেন, তাঁরা সবাই কাষ্ট হিন্দু। (আগেও একবার বলা হয়েছে)।

১৯৪০-এ অনুষ্ঠিত কোলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে (৩ নং ওয়ার্ড) বর্ণ হিন্দু

শরৎ চন্দ্র বোস যোগেনবাবুকে মনোনয়ন দেন। এ ছাড়া তাঁকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন উত্তর কোলকাতা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট সুরেশ চন্দ্র মজুমদার ও সম্পাদক হেমন্ত কুমার বসু। এঁরা দু'জনেই ছিলেন বর্ণ হিন্দু।

দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, অশিক্ষা ও কুসংস্কার তফসিলী জাতিকে পঙ্গু ও দুর্বল করে রেখেছে। এগুলির হাত থেকে মুক্তিই যে আসল মুক্তি বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর সে কথা খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন। শিক্ষা দীক্ষায় বর্ণহিন্দুদের সমকক্ষ হওয়াই সামাজিক নির্যাতন থেকে মুক্তি লাভের প্রথম পদক্ষেপ। সামাজিক মুক্তি না হলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির দরজা খুলতে পারে না। হিন্দু সমাজের একটি জনগোষ্ঠী শিক্ষা দীক্ষায় এভাবে পশ্চাৎপদ থাকলে সমগ্র হিন্দু সমাজের যে মঙ্গল হতে পারে না বিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথম ভাগ থেকেই বর্ণহিন্দু সমাজের একটি অংশ একথা উপলব্ধি করতে সুরু করেন এবং এঁদের উন্নতির জন্য উদ্যোগ নিতেও সুরু করেন। তবে এই উদ্যোগ আংশিক মাত্র।

এরূপ একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল বরিশাল জেলার অন্তর্গত পিরোজপুর মহকুমার (বর্তমানে জিলা) নাজিরপুর থানার অন্তর্গত 'লড়া' গ্রামে; ১৯৪৫ সনে। এটি তফসিলী এলাকা। হিন্দু মহাসভার সহযোগিতায় একটি কলেজ স্থাপনের লক্ষ্যে স্থানীয় জনসাধারণ এক বিশাল কনফারেন্সের আয়োজন করেন ঐ 'লড়া' গ্রামে। ব্যাপক স্থান জুড়ে প্যাণ্ডেল করা হয়। স্থাপন করা হয় বিরাট সাদামাঠা মন্দিরে ভারত মাতার মূর্তি। কনফারেন্সে যোগ দেবেন বাংলা তথা ভারতের নামকরা নেতৃবৃন্দ। আমি (লেখক) তখন স্কুলের ছাত্র। বড়দের সঙ্গে আমিও সেদিন ঐ কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলাম। স্বচক্ষে দেখেছি সেই বিরাট আয়োজন।

যোগেনবাবু তখন মুসলিম লীগের স্নেহধন্য শুভাকাঙ্খী। '৪৬-এর নির্বাচনে তাঁদের কৃপাই প্রধান ভরসা। 'লড়া' এলাকায় কলেজ স্থাপিত হলে ওখানকার নমঃ সমাজ বেহাত হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় মুসলিম লীগের ইঙ্গিতে পুলিশ প্রশাসন দিল কনফারেন্স ভেঙ্গে। সাম্প্রদায়িক গোলযোগ হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে জারি করা হলো ১৪৪ ধারা। লীগের একনিষ্ঠ সেবক যোগেনবাবুকে কনফারেন্সের বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই বসিয়ে রাখা হলো ঐ এলাকায়। তাঁর কাজ ছিল কনফারেন্স যাতে না হতে পারে স্থানীয় প্রশাসনকে দিয়ে সেই কাজটি সঠিকভাবে করানো। তিনি তা একশ' ভাগ দায়িত্ব নিয়েই করেছিলেন।

১৪৪ ধারা কিন্তু গণস্রোত ঠেকাতে পারেনি। হাজার কয়েক লোক উপস্থিত হয়েছিল কনফারেন্সের দিন। কোলকাতা থেকে এক বিরাট সুদৃশ্য লঞ্চে করে গিয়েছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। তাঁকে অভ্যর্থনা করা হলো 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দিয়ে। তিনি নামলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনলেন। কিন্তু বক্তৃতা করলেন না। চলে গেলেন। অন্য একটি লঞ্চে করে ওখানে উপস্থিত হয়েছিলেন বর্ধমানের মহারাজা। তিনি অবশ্য লঞ্চ থেকে নামেননি। প্রত্যাশিত সভা হল না। এভাবে নমঃ সমাজের একটা সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতকে নস্যাৎ করে দিল মুসলিম লীগ ও তাদের আজ্ঞাবহ যোগেনবাবুরা।

তথাকথিত অখণ্ড বাংলা

"মিঃ জিন্নাহ ধরে নিয়েছিলেন যে, স্বাধীন বাংলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার ফলে এটি হবে একটি (অধীনতামূলক) উপ-পাকিস্তান।" — লর্ড মাউন্টব্যাটেন। [83]

'বাংলাদেশ বিভক্ত করা যায় না। ... হিন্দুদের স্বার্থের দিক দিয়েও বাংলা-ভাগ হবে আত্মহত্যার সমতুল্য।' — হোসেন শহিদ সরোয়ার্দি। [84]

'বাংলার মুসলমানদের মৃতদেহের উপর দিয়েই কেবল বাংলা ভাগ হতে পারে।'
— মাওলানা আঁকরাম খাঁ। [85]

১৯৪৭-এর ১৪ আগস্টের আগেই যোগেনবাবু হয়ত নব গঠিত পাকিস্তানের আইন মন্ত্রী হয়েছিলেন। তাই ৫ আগস্ট মঙ্গলবার অন্ধকারাচ্ছন্ন (!) দিল্লী ত্যাগ করলেন আলোকজ্জ্বল (!) পবিত্রভূমির উদ্দেশ্যে। নিজের সহধর্মিনীকে বা একমাত্র পুত্রকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেননি। যতদূর জানা গেছে ওনার সহধর্মিনী আগেই গত হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র শ্রীজগদীশ চন্দ্র মণ্ডল ব্রাহ্মণ্যবাদী এই ভারতে (? আসানসোল, পঃ বঃ) পড়াশোনা করছিলেন।*

যাক, পবিত্রভূমিতে গিয়ে যোগেনবাবু ১ দিনের জন্য পাকিস্তান গণপরিষদের সভাপতিও হয়েছিলেন (১০ আগস্ট)। কিন্তু সভাপতির ঐ সিংহাসন তফসিলী তথা হিন্দুদের দুর্গতি বিন্দুমাত্র কমাতে পারেনি। বরং তা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল। তখন এক উত্তাল প্রশ্নের গুঞ্জন উঠলো চারদিকে ঃ নিজ সম্প্রদায়ের সার্বিক মুক্তি ও আলোকজ্জ্বল ভবিষ্যতের নামে পাকিস্তান সমর্থন করে তফসিলীদের কী উপকার হলো ? এবার আঁতে ঘা পড়েছে। যোগেনবাবু তো কাউকে জানিয়ে শুনিয়ে বা আলাপ-আলোচনা করে কখনো কিছু করেননি। এখন কী উত্তর দেবেন তিনি !

এই মৌলিক প্রশ্নটিকে সমূলে বিনাশ করার জন্য এক অভিনব উত্তর নিয়ে এগিয়ে এলেন যোগেনবাবুর অনুগামীরা। তারা বলেন, 'তফসিলীদের চারটি জেলা ছেড়ে দেওয়ার শর্তে জিন্নাহ্ সাহেবের সঙ্গে যোগেনবাবুর একটি চুক্তি হয়েছে। পাকিস্তান সমর্থন করেছিলেন কি এমনি এমনি ?'

কিন্তু কখন কোথায় কিভাবে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তার কোন কাগজ পত্র

*** যোগেনবাবুর পুত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন এই ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতে থেকে যাওয়ার ফলেই ১৯৫০-এ তাঁর কোন এক আপনজন পুত্রের অসুস্থতার কথা টেলিগ্রাম করে জানিয়ে তাঁর ছুটির ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন এবং এখানে এসে দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে রাজনীতিও করেছেন।**

বা অন্য কোন হদিশ তাঁরা দিতে পারেননি কোনদিন। যোগেনবাবু তার পদত্যাগ পত্রে হাজার কথা লিখলেও এই চুক্তির কথা আদৌ উল্লেখ করেননি। কাজেই বিষয়টি যে নির্জ্জলা মিথ্যা এবং অবস্থা সামাল দিতেই যে এই গপ্পটি বানানো হয়েছিল তা দিনের আলোর মতই পরিষ্কার। উদ্বাস্তু আকাশে কান পাতলে সেই নির্ভেজাল মৌলিক প্রশ্ন ও তার অভিনব বানোয়াট উত্তর যে কেউ এখনো শুনতে পাবেন।

কিছুদিন পরেই ঐ চার-জিলা মার্কা গপ্পের ফানুস ফেটে গেল। তার বদলে আমদানি করা হল অখণ্ড স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার তত্ত্ব। রটিয়ে দেওয়া হল — যোগেনবাবু ভারত ভাগ চাননি। তিনি চেয়েছিলেন অখণ্ড স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা। যোগেন্দ্র-অনুগামীদের প্রচার — পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত না করে স্বাধীন বাংলা গড়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন যোগেনবাবু। কিন্তু বর্ণ হিন্দুরা তা মেনে নিতে পারেননি। বর্ণ হিন্দুদের মতে বর্বর মুসলমান ও অসভ্য নিম্নবর্ণ হিন্দুদের যৌথ নেতৃত্বাধীন সরকারকে মেনে নেওয়া যায় না। 'তাই মিথ্যা কলঙ্ক রটিয়ে দেশ ভাগ ও বাংলা ভাগের কলঙ্ক কালিমা ছিটিয়ে দিচ্ছে যোগেনবাবুর গায়ে।'

কিন্তু যোগেনবাবু কবে, কোথায়, কখন কার কাছে স্বাধীন বাংলা গড়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তার নিদর্শন কল্পলোকের গল্পকথার ইতিহাস ছাড়া আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। ঐ স্বাধীন বাংলা বা বঙ্গভূমি গড়ার প্রচেষ্টা নিয়ে এখন পর্যন্ত বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ঐতিহাসিক ডঃ অমলেন্দু দে ('স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা ঃ প্রয়াস ও পরিণতি', ১৯৭৫)। তিনি এমন একটি বাক্যও লেখেননি যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যোগেনবাবু ঐ পরিকল্পনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। গত ১১.০৩. '০৩ তারিখে আমরা টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান যে, 'স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের আলাপ আলোচনার মধ্যে মণ্ডল মশাই ছিলেন না।'

এ ছাড়া আবুল হাশিম, আবুল মনসুর আমহদ এবং মহিউদ্দিন আহমেদ তাঁদের স্মৃতিকথায় স্বাধীন বাংলা গঠনের প্রয়াস সম্পর্কে বেশ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এঁরাও কেউ বলেননি যে, যোগেনবাবু ঐ কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

নির্ভরযোগ্য ইতিহাসে এ পর্যন্ত যা নথিভুক্ত আছে তা হচ্ছে এই — মুসলিম ধর্মশাস্ত্র সম্মত দ্বিজাতি তত্ত্বকে ভিত্তি করে পাকিস্তান প্রস্তাব পাশ করে জিন্নাহ্ সাহেবরা বলতে থাকেন গোটা পাঞ্জাব ও গোটা বাংলা সহ পাকিস্তান তাঁদের চাই-ই চাই। কোন রকম বিকলাঙ্গ বা পোকায় কাটা পাকিস্তান তাঁরা নেবেন না। কিন্তু ডঃ আম্বেদকর অকাট্য যুক্তি তর্ক দিয়ে বললেন, যে যে যুক্তিতে জিন্নাহ্ সাহেবরা পাকিস্তান চান ঠিক সেই সেই যুক্তিতে পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাজন হতে হবে। এই দু'টো প্রদেশের কোন কোন অংশ নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হতে পারে এবং কোন কোন এলাকা ভারতে থাকবে তা দেখিয়ে মানচিত্র এঁকে তা যুক্ত করেছেন তাঁর 'থট্স অন পাকিস্তান'-এ। প্রথমে হিন্দু মহাসভা এবং পরে কংগেস এই যুক্তি মেনে নেয়। লর্ড মাউন্টব্যাটেনও বড়লাট হয়ে ভারতে এসে বাবাসাহেবের ঐ যুক্তি মেনে

নেন। শুধু মানলেন না লীগ এবং তাদের বিশ্বস্ত বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

পাঞ্জাব ও বাংলাকে অখণ্ড রেখে এই দু'টো প্রদেশকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার জন্য জিন্নাহ্-লিয়াকত সাহেবরা দিল্লীতে দরবার চালিয়েছেন। কোলকাতায় এই অপচেষ্টার নায়ক ছিলেন সরোয়ার্দি-আবুল হাশিমরা। সঙ্গে পেয়েছিলেন শরৎ চন্দ্র বোসকে। আর বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ও শহরে-বন্দরে এর প্রচার চালিয়েছেন যোগেনবাবু।

ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭। অনেকটা আকস্মিকভাবেই লর্ড ওয়াভেল বড়লাটের পদ হারালেন। মুষড়ে পড়লেন মিঃ জিন্নাহ্। তাঁর সাধের পাকিস্তান বোধহয় আর পেলেন না। কিন্তু, পাকিস্তান তো তাঁকে পেতেই হবে। কি করা যায়? আর একটা লোমহর্ষক দাঙ্গা বাধাতে না পারলে সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে হয়ত। তবে এবার আর কোলকাতা বা নোয়াখালি নয়। এবার দাঙ্গা বাধাতে হবে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে (N.W.F.P)। কিন্তু কাকে দায়িত্ব দেওয়া যায়? দ্বিতীয় কোন সরোয়ার্দি তো ওখানে নেই। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। দিল্লীতে প্রতিরক্ষা বিভাগের যুগ্ম সচিব আছেন মিঃ ইসকান্দার মীর্জা (পরবর্তীকালে জেনারেল আইয়ুব খানের দোসর জেনারেল ইসকান্দার মীর্জা; পাকিস্তানের ২০ দিনের প্রেসিডেন্ট)। ফোন করে ডেকে আনলেন মিঃ মীর্জাকে। বললেন — " তুমি কি আমাকে ভারতীয় মুসলমানদের নেতা বলে স্বীকার করো? আমার নির্দেশ তুমি মানবে?" মিঃ মীর্জা তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন 'হ্যাঁ' বলা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না তাঁর।

মিঃ জিন্নাহ্ বললেন - 'দেখো, ভয়ঙ্কর ধরনের একটি গোলযোগ বাধাতে না পারলে আমি হয়ত পাকিস্তান পাবো না। এই মুহূর্তে তেমন ঘটনা ঘটাবার উৎকৃষ্ট জায়গা হচ্ছে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং এর সন্নিহিত এলাকা। তুমি ওখানে চলে যাও। গিয়ে 'জেহাদ' সুরু করো। আমি যতটা জানি, মনে প্রাণে চেষ্টা করলে তুমিই এ কাজ পারবে।'

এটা বানানো গল্প নয়। সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফ্ফার খানের পুত্র ওয়ালী খান তাঁর লেখা 'ফ্যাক্টস আর ফ্যাক্টস' শীর্ষক বই-এ এর বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, 'এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মিঃ জিন্নাহ্‌র সঙ্গে ব্রিটিশ আমলাদের যোগাযোগ ছিল।'

মীর্জা সাহেব লিখেছেন ঐ *(অপ)* কর্মের জন্য তিনি ১ কোটি টাকা চেয়েছিলেন মিঃ জিন্নাহ্‌র কাছে। রাজী হলেন জিন্নাহ্ সাহেব। তারপর মীর্জা সাহেবের দিল্লী ত্যাগের পালা। কোন অজুহাতে দিল্লী ত্যাগ করবেন তিনি? মিঃ জিন্নাহ্ একটি অজুহাত তৈরী করেই রেখেছিলেন। মহামান্য আগা খানের সঙ্গে দেখা করা। মীর্জা সাহেব চলে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে দেখা করলেন ভূপালের নবাবের সঙ্গে। নবাব সব শুনলেন এবং পকেট খরচ বাবদ ওনাকে দিলেন নগদ ২০ হাজার টাকা।

জিন্নাহ্ সাহেব মিঃ মীর্জাকে আশ্বাস দিলেন যে, জেহাদ পরিচালনা করতে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর পরিবার পরিজনদের ভরণ পোষণের উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। (পরিশিষ্ট - ৬, পৃ- ১২৫)

এদিকে দিল্লীতে জিন্নাহ্ সাহেব মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে একাধিকবার দেখা করেছেন। যে জিন্নাহ্ দ্বিজাতি তত্ত্বের দোহাই দিয়ে ভারত ভাগ চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, হিন্দু ও মুসলমান একত্রে একই দেশে বসবাস করতে পারে না, সেই জিন্নাহ্ মাউন্টব্যাটেনের কাছে গেলেন পাঞ্জাব ও বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার আর্জি নিয়ে। লর্ড বললেন, ভালো কথা মিঃ জিন্নাহ্, আপনি যা বলছেন তার অর্থ দাঁড়ায় এই, সংখ্যাগুরু মানুষেরা সংখ্যালঘুদের শাসন করুক, এটা আপনি চান না।

'ঠিক তাই', বললেন মিঃ জিন্নাহ্।

মাউন্টব্যাটেন — 'তাহলে তো আমাকে পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগ করতেই হয়।'

মিঃ জিন্নাহ্ — 'না না, মহামান্য লাট সাহেব বুঝতে পারছেন না যে, পাঞ্জাবীরা একটি জাতি এবং বাঙালীরা একটি জাতি। আপনি যদি এই দু'টো প্রদেশ আমাদেরকে দেন, তাহলে কোন অবস্থাতেই তা ভাগ করতে পারবেন না।'

আলোচনার শেষ পর্যায়ে বড়লাট বললেন, ঠিক আছে আপনি খণ্ডিত (পোকায় কাটা) পাকিস্তান না নিলে ভারত অখণ্ডই থাকবে। ["You call it a moth-eaten Pakistan. I don't even want you to take it at all if it's a moth-eaten Pakistan.. I'd really like you to leave India unified." } [86]

জিন্নাহ্ বুঝলেন অবস্থা সুবিধার নয়। হয়ত বা বাংলা ও পাঞ্জাবকে অক্ষত রেখে পাকিস্তানে নিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না। তাই একটি ঘুর পথের আশ্রয় নিলেন। এর নাম 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা'। এর জন্য পরিকল্পনা রচনার ভার দিলেন সরোয়ার্দি-আক্রাম খাঁ-আবুল হাসিম সাহেবদেরকে। বাংলার দুর্ভাগ্য যে সরোয়ার্দি সাহেবরা অন্তর্বর্তী সরকার থেকে বাদ পড়া (১৯৪৬) শরৎ চন্দ্র বসুকে সঙ্গে পেয়েছিলেন।

নিজেদের মধ্যে একাধিকবার আলোচনার পর ১০ মে (১৯৪৭) বিকেল বেলা শরৎ বোসকে সঙ্গে নিয়ে তৎকালীন মুসলিম লীগের প্রাদেশিক সেক্রেটারি মিঃ আবুল হাশিম সোদপুরে অবস্থানরত গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে যান। তাঁদের মূল বক্তব্য ছিল - ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে বাংলা একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হোক। শরৎবাবুর ইঙ্গিতে হাশিম সাহেব আলোচনা সুরু করলেন এই ভাবে — 'হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক বাঙালীরা বাঙালীই। তাঁদের ভাষা ও কৃষ্টি একই। হাজার মাইল দূরের পাকিস্তানীরা এই দেশ শাসন করবে এটা তাঁরা চান না।' [87]

উত্তরে গান্ধীজী যা বললেন তার সারমর্ম হচ্ছে এই — 'প্রস্তাবিত স্বাধীন বাংলায় সংখ্যাগুরু হবেন মুসলমানরা। ভবিষ্যতে তাঁরা যদি প্যান ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ধর্মের দোহাই দিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিতে চান, তাহলে কি করা হবে?' হাশিম সাহেব এর উত্তর দিতে পারলেন না।

একটু পরে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ ওঠে। এবারে হাশিম সাহেব উত্তরের

ভাষা খুঁজে পেলেন। বললেন, ' রবি ঠাকুরের প্রতি মুসলিম সহ সব বাঙালীরই গভীর শ্রদ্ধা আছে। আর এই জন্যই বাঙালী মুসলমানরা দ্বিধা বিভক্ত হতে চান না।' হাসিম সাহেব ভাবলেন গান্ধীজী অবাঙালী বলে তাঁকে 'হাই কোর্ট' দেখানো গেল বোধ হয়। কিন্তু তাঁর আশায় ছাই দিয়ে গান্ধীজী বললেন, 'হ্যাঁ, ভারতীয় উপনিষদের বাণীই সমগ্র ভারতে কৃষ্টি এবং রবীন্দ্রনাথকে এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে। বাংলাও কি ঐ একই সূত্রে আবদ্ধ নয়? তাহলে ভবিষ্যতে কোনদিন বাংলা যদি এই কৃষ্টির দোহাই দিয়ে ভারতের সঙ্গে একত্রিত হতে চায় তখন আপনাদের বক্তব্য কি হবে?' দুঃখের বিষয়, হাশিম সাহেব এবারেও কোন উত্তর দিতে পারলেন না।

১১ এবং ১২ মে (১৯৪৭) সরোয়ার্দি গান্ধীজীর কাছে গিয়ে প্রস্তাবিত স্বাধীন বাংলার একটি নান্দনিক ছবি [rosy picture] তুলে ধরেন। উত্তরে গান্ধীজী বললেন — 'কথা হচ্ছে কি জানো শহিদ, বাংলার মানুষ তোমাকে বিশ্বাস করে না। কারণ, বাংলায় হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে যত লোকের প্রাণহানি হয়েছে তার জন্য দায়ী তুমি।' ["... for every life lost in Bengal, whether Hindu or Muslim." My Days with Gandhi", N.K.Bose, page-231] রেগে ফায়ার হয়ে সরোয়ার্দি বললেন, 'না, এর জন্য দায়ী আপনি। কারণ আপনি মুসলমানদের প্রতি সুবিচার করেননি।' মেজাজ হারিয়ে গান্ধীজী উত্তর দিলেন, ' নোংরা কথা বলবে না।' ["Don't talk rot." Ibid, p-231]

এর পরেও তাঁরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা গঠনের একটি পরিকল্পনা দাঁড় করালেন। ২০ মে (১৯৪৭) শরৎচন্দ্র বোসের ১নং উডবার্ন পার্কের বাসভবনে সার্বভৌম বাংলা গঠনের জন্য একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন শরৎ চন্দ্র বসু এবং আবুল হাশিম। কোলকাতা ও নোয়াখালিতে গত এক বছরের মধ্যে ঘটে যাওয়া দু' দু'টো নারকীয় ঘটনার নায়কদের বিশ্বাস করে শরৎবাবু ইতিহাসে এক কালো অধ্যায় সৃষ্টি করলেন। ২০ তারিখে এই চুক্তি স্বাক্ষরের আগেই মিঃ জিন্নাহ্ বসু-সোহরাওয়ার্দীর পরিকল্পনায় সম্মতি জানিয়েছিলেন। কেন সম্মতি জানিয়েছেন তা' ব্যাখ্যা করেছেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। তাঁর ভাষাতেই বলছি — 'মিঃ জিন্নাহ ধরে নিয়েছিলেন যে, স্বাধীন বাংলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার ফলে এটি হবে একটি (অধীনতামূলক) উপ-পাকিস্তান। তাই তিনি সরোয়ার্দির পরিকল্পনা মেনে নিতে যাচ্ছিলেন।"

এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইংরেজদের সমর্থন আদায়ের জন্য শরৎবাবুকে এড়িয়ে সরোয়ার্দি বড়লাটের পারিষদ 'শোন'-কে [Shone] বলেছিলেন, 'বিদেশী মূলধন দিয়ে আমি সোনার বাংলা গড়তে চাই। মার্কিন মূলধন তো দরজার গোড়ায়। ...... অখণ্ড বাংলা পেলে আমি তা রূপোর থালায় করে ইংরেজদের উপহার দেবো [৪৪] যাক্, ওনারা পাকিস্তান পেয়েছিলেন। তাই ইসকান্দার মীর্জাকে আর দাঙ্গা বাধাবার ঝক্কি পোহাতে হয়নি।

এ সব ঘটনা উল্লেখ করে আমরা এ প্রশ্ন করছি না যে, তখন যোগেনবাবু এ সব

খবর রাখেননি কেন? এ প্রশ্ন করছি না এই জন্য যে, যে স্তরের রাজনীতির সঙ্গে যোগেনবাবু যুক্ত ছিলেন, তাতে তাঁর পক্ষে ঐ সব খবর রাখা সম্ভব ছিল না। এখানে আমরা শুধু মুসলিম লীগের তথা মিঃ জিন্নাহ্র রাজনৈতিক গুণ্ডামীর (বাবাসাহেবের ভাষায় 'Gangsterism') পরিচয় তুলে ধরলাম। আমরা মনে করি ভারত ভাঙ্গার ইতিহাসের কলঙ্কময় এই অধ্যায় থেকে আজও আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে — এখনও যাঁরা আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলেন 'দলিত-মুসলিম ঐক্যের কোন বিকল্প নেই; এই ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা কোন দিন ফুরোবে না', তাঁদেরও শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। ভ্রান্তদর্শীকে 'ক্রান্তিদর্শী' বলে প্রচার করলে আমাদের ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকার হবে।

স্বাধীন বাংলা গঠনের ব্যাপারে উচ্চ পর্যায়ে যে সব আলোচনা হয়েছে তার কোথাও যোগেনবাবু উপস্থিত ছিলেন কেউ এমন কোন প্রমাণ দিতে পারেননি আজও। তিনি দায়িত্ব পেয়েছিলেন এ ব্যাপারে বাংলার তফসিলী প্রধান এলাকা সমূহে ঘুরে ঘুরে পাকিস্তানের পক্ষে এবং বাংলা ভাগের বিপক্ষে বক্তৃতা দেবার। স্বাভাবিকভাবেই এর খরচ বহন করেছে মুসলিম লীগ। অন্তর্বর্তী সরকারে মন্ত্রিত্ব লাভের পর থেকেই যোগেনবাবু বাংলার বিভিন্ন জেলা সফর শুরু করেন। লীগের কাছ থেকে টাকা গ্রহণের একটি বড় প্রমাণ পাওয়া গেছে পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত 'জিন্নাহ্ পেপারস্'-এ। ১৯৪৭-এর ৩০ এপ্রিল তিনি ২৫,০০০/- টাকা চেয়ে একটি চিঠি সহ তাঁর বিশ্বাসভাজন গঙ্গাধর প্রামাণিককে পাঠালেন মিঃ জিন্নাহ্র কাছে। চিঠিতে তিনি লিখলেন — 'গতকাল *(অর্থাৎ ২৯ এপ্রিল)* মিঃ সরোয়ার্দির সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে আমার আলোচনা হয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইতিমধ্যেই পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেশ কিছু সংখ্যক কর্মী সংগ্রহ করেছি। আমি যদি বিরাট সংখ্যক লোক নিয়োগ করতে পারি, নিশ্চিত ভাবে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। আমি এখন ২৫ হাজার টাকার তহবিল নিয়ে কাজ সুরু করতে চাই। দশ দিন পরে অবশ্যই আমি আপনাকে অগ্রগতির রিপোর্ট পাঠাতে পারব। আমাদের এই কাজের একটি উৎসাহব্যঞ্জক দিক এই যে, আমাদের কর্মীদের জন্য খুব বেশি টাকা খরচ হচ্ছে না।' (পরিশিষ্ট-৪, পৃ- ১২৩)

বিশ্বস্ত বন্ধুর উৎসাহব্যঞ্জক চিঠি পেয়ে মিঃ জিন্নাহ্ আর দেরী করেননি। টাকা পাঠিয়ে দিলেন কোলকাতার আহমদ ইস্পাহানির মাধ্যমে। প্রাথমিকভাবে ১০ হাজার টাকা পেলেন মণ্ডল মশাই। [89] মণ্ডল মশাই দ্বিতীয় কিস্তিতে আহমদ সাহেবের কাছ থেকে ৪ হাজার টাকা নেন ২৪ মে, ১৯৪৭। (পরিশিষ্ট - ৪, পৃ-১২৩)

মে মাসের (১৯৪৭) প্রথম সপ্তাহে যোগেনবাবু উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন তফসিলী এলাকায় কয়েকটি জনসভা করেন। এর মধ্যে ৪ মে দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়িতে, ৬ মে জলপাইগুড়ি শহরে এবং ৭ মে দিনাজপুরের সভা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ৯ মে ২৪ পরগনা জিলার হরিনারায়ণপুরে, ১০ মে বসিরহাটে সভা করেন। সর্বত্র একই বক্তব্য রাখেন,

'যে কোন মূল্যে বাংলা ভাগ রদ করতে হবে।' ১৭ মে বর্ধমানের এক জনসভায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রায় ৩ ঘন্টা বক্তৃতা দেন।

১৪ মে বঙ্গীয় প্রাদেশিক তফসীলি ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতির একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। (ম.যোগেন্দ্রনাথ, ২/ ৩৯-৪৩)

১৬ মে ৬২ নং বহুবাজার স্ট্রীট-এর বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন হলে আয়োজিত একটি সভায় যোগেনবাবু বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে বলেন যে, পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরুদ্ধ মনোভাব হইতেই বঙ্গ বিভাগ প্রস্তাব উদ্ভূত। ... বর্তমানে যে সাম্প্রদায়িক অশান্তি দেখা যায় উহা সাময়িক সমস্যা, ইহা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। দেশ স্বাধীন হইলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার স্থান থাকবে না। বাংলা বিভাগ হইলে লোক বিনিময়ের প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু উহা কি বাস্তবে সম্ভব? কিছুতেই না। উহা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অবাস্তব। (পূর্বোক্ত গ্রন্থ; পৃ- ৪৪, ৫১)

মণ্ডল মশাই যখন বাংলার দুই অংশের মধ্যে লোক বিনিময় অসম্ভব বলে ফতোয়া দিচ্ছিলেন, মিঃ জিন্নাহ্ তখন হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে লোক বিনিময় করতে সম্মত হয়ে ঐ ৩০ এপ্রিল ('৪৭) রাতে এক বিবৃতি দিলেন। স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকা এটি প্রকাশ করেছে এই ভাষায় —

New Delhi, April 30, 1947. In a statement tonight Mr. Jinnah says, "......... It is obvious that if the Hindu minorities in Pakistan wish to emigrate and go to their homelands of Hindustan, they will be at liberty to do so and vice versa; those Muslims who wish to emigrate from Hindustan can do so and go to Pakistan; and sooner or later an exchange of population will have to take place." [The Statesman, Calcutta, Thursday, May 1, 1947, pp. 1,7.Quoted by Dr. Amalendu Dey in his 'স্বাধীন বঙ্গভূমি ....' page- 120]

আগেই বলা হয়েছে ১৯৪০ সনেই ডঃ আম্বেদকর প্রস্তাবিত হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে সংখ্যালঘু বিনিময়ের শর্ত আরোপ করেছিলেন এবং এর জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মত কার্যক্রমও প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন।

ভারত ভাগের পক্ষে এবং বাংলা ভাগের বিপক্ষে সেদিন (১৯৪৬-'৪৭) লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ (মিঃ জিন্নাহ্, লিয়াকত আলি, অক্রাম খাঁ, নাজিমুদ্দিন, সরোয়ার্দি ইত্যাদি) যে উদ্ভট যুক্তি দেখিয়েছিলেন তা তৎকালীন প্রায় সব দৈনিক খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলো যদি পড়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে, যোগেনবাবু ঐ সব নেতাদের যুক্তিই সহজ ভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর স্বজাতি ভাই-বোনদের কাছে। বক্তৃতায় মিঃ মণ্ডলের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা প্রসূত কথা ছিল ছিঁটে ফোঁটা মাত্র। আগ্রহী পাঠকগণ খুব সহজে লীগ

নেতাদের অনেক বক্তব্য পেতে পারেন ডঃ অমলেন্দু দে-র লেখা 'স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা ঃ প্রয়াস ও পরিণতি' শীর্ষক গ্রন্থে।

যোগেন্দ্র অনুগামীরা এখন বার বার বলছেন, ঐ সময় বিভিন্ন সভায় তফসিলীরা ব্যাপক হারে যোগ দিতেন এবং তাঁরা সবাই দু'হাত তুলে মণ্ডল মশাইকে সমর্থন করতেন। কিন্তু তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য শ্রীরাধানাথ দাস '৪৭-এর ২৬ মে, মঙ্গলবার, বঙ্গীয় অনুন্নত জাতি লীগের এক সভায় সভাপতির অভিভাষণে বলেন যে, যোগেনবাবুদের "সভার পূর্বে প্রচার করা হইতেছে যে, যে সব অনুন্নত জাতির লোকেরা সভায় উপস্থিত হইবেন, তাঁহারা বিনামূল্যে এক খানা করিয়া কাপড় পাইবেন। ... তাহা সত্ত্বেও সভায় অনুন্নত ভাইয়েরা যোগদান করেন না। সভায় বেশীরভাগ মুসলিম লীগের সমর্থক মুসলমান বন্ধুরা আসেন এবং মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডেরা আসেন।" (জগদীশ চন্দ্র মণ্ডলের 'বঙ্গ-ভঙ্গ', বাং-১৩৮৩, পৃ-৪২) তফসিলী এলাকার বিভিন্ন জনসভায় মণ্ডল মশাই কি ধরনের অভ্যর্থনা পেতেন তা বর্ণনা করেছেন বঙ্গীয় অনুন্নত জাতি লীগের সভাপতি শ্রীবিরাট চন্দ্র মণ্ডল। তাঁর ভাষায়, "সম্প্রতি মিঃ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল জলপাইগুড়ি গিয়ে একটি জনসভায় ভাষণ দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু জনগণ তাঁকে টিটকিরি দিয়ে তাড়িয়ে দেন ('hooted him out')।" .... "তিনি বারুইপুর ও হরিনারায়ণপুরেও গিয়েছিলেন। সেখানকার তফসিলীরা কালো পতাকা, ঝাঁটা ও জুতো দেখিয়ে মিছিল করে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন।" এ সংবাদ ৩০.০৫.'৪৭ তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। (পূর্বোক্ত বই, পৃ-৫০; অনুবাদ-আমাদের।)

২১ মে ('৪৭) তারিখে মিঃ লিয়াকত আলীর কাছে মিঃ সরোয়ার্দির লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে, তফসিলী কর্মীরা অখণ্ড বাংলার পক্ষে বক্তব্য রাখার জন্য তফসিলী এলাকায় যেতে সাহস পাচ্ছেন না। তাঁরা সরকারের কাছে নিরাপত্তা চাচ্ছেন। [90] এমতাবস্থায় যোগেনবাবুকে লীগের ন্যাশনাল গার্ড ওরফে আজরাইল বাহিনীর ছত্রছায়ায় থেকেই লীগ-অভীষ্ট অখণ্ড বাংলার (জিন্নাহ্-কথিত 'সাবসিডিয়ারি পাকিস্তান') পক্ষে কাজ করতে হয়েছে। এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

আজ এ কথা খুবই স্পষ্ট যে মুসলিম লীগের স্বার্থেই প্রথমে বাংলায়, পরে কেন্দ্রে এবং তারপরে পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগেনবাবুকে স্থান দিয়েছিলেন জিন্নাহ্-সোহরাওয়ার্দী সাহেবরা। কী সেই স্বার্থ? প্রথম স্বার্থ — তথাকথিত বর্ণ হিন্দু ও তফসিলীদের মধ্যে বিভাজনকে স্থায়ী করা এবং দ্বিতীয় স্বার্থ ছিল গোটা পাঞ্জাব এবং গোটা বাংলাকে পাকিস্তানের অর্ন্তভুক্ত করা। তৃতীয় স্বার্থ ছিল যোগেনবাবুকে শিখণ্ডী হিসাবে দাঁড় করিয়ে রেখে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রচার চালানো — 'দেখো, সংখ্যালঘু তফসিলীদের প্রতি আমরা কত উদার!'

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অন্তর্বর্তী সরকারে মন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে যোগেনবাবু কেবিনেট বৈঠকে যেতেন খুবই কম। তার প্রধান কাজ ছিল গ্রামে গ্রামে সভা করে মুসলিম লীগের এবং পাকিস্তানের পক্ষে বক্তৃতা দেওয়া।

১৯৪৬-এ কলকাতা ও নোয়াখালিতে হত্যাযজ্ঞের পর তফসিলী হিন্দু সহ অনেক হিন্দু কোলকাতায় এসে আশ্রয় নিতে সুরু করে। তখন যোগেনবাবুকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে শোনা গেছে - 'এ দাঙ্গা তফসিলীদের বিরুদ্ধে নয়। তাদের দেশ ত্যাগ করতে হবে না'। এ কথায় এটা পরিষ্কার যে অ-তফসিলী হিন্দুদের দেশ ত্যাগ করানোর মত মহৎ (!) পরিকল্পনার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। হয়ত তফসিলীদের হত্যা বা অত্যাচার না করার গোপন নির্দেশ থাকতে পারে। ঢাকা সহ দেশের দু'চার জায়গায় এমন ২/৪ টি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে। ঢাকার লালবাগ-কেল্লা সংলগ্ন আতসখানা লেনের প্রাক্তন বাসিন্দা (বর্তমানে কোলকাতায় বসবাসরত) শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাস মহাশয় জানাচ্ছেন যে, ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারিতে লালবাগ কেল্লার একটু দূরে বর্ণহিন্দুদের প্রতিটি বাড়ী আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু কেল্লা সংলগ্ন গোয়ালপাড়া তফসিলী এলাকা (ঢাকার বিখ্যাত দৈ ব্যবসায়ী যুধিষ্ঠির ঘোষদের বাড়ী) হওয়ায় ওখানে কিছু হয়নি। এ ছাড়া যে সব গ্রামে বর্ণ হিন্দু এবং তফসিলীরা পাশাপাশি বসবাস করতেন সেখানে দুর্বৃত্তরা তাদের বলত 'তোমাদের যোগেনবাবু আমাদের সঙ্গে আছে। তোমাদের কিছু বলবো না। কচু কাটা করবো ঐ বামনাদের। এই বলে প্রথমে বামুন বাড়ীতে লুঠতরাজ, অগ্নি সংযোগ, নারী ধর্ষণ ও নারী অপহরণ করত। এর ২/১ দিন পরেই ঐ তফসিলীদের বাড়ীতে অনুরূপ অত্যাচার চালাত। তেতো হলেও এই হল সঠিক ইতিহাস। এর দ্বারা কি প্রমাণিত হয় — যোগেন্দ্রনাথ ঐ সময়ের সবচেয়ে বাস্তববাদী নেতা ছিলেন, না ভ্রান্তবাদী নেতা ছিলেন? তিনি যে তখন নিশ্রীভাবে ভ্রান্তবাদী রাজনীতিক ছিলেন তার অজস্র প্রমাণ আছে। একটি বড় প্রমাণ তিনি রেখেছেন '৫০-এর ৯ অক্টোবর। ৮ অক্টোবর পদত্যাগ করার পর একটি বিবৃতিতে তিনি অনেক কথার মধ্যে বললেন, " ... It appears to me that there are only two ways of solving the problem for good. ..... Either East Bengal must form a part of the Indian Union or the Hindus should be brought out and settled in West Bengal." (ম.যোগেন্দ্রনাথ, ২/২৯৭) আমরা এখানে স্মরণ করতে পারি যে, ১৯৪৭-এর ২০ জুন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অনুষ্ঠিত ভোটের প্রথম দফায় ৯০ জন এম. এল. এ. সমগ্র বাংলাকে ভারতের মধ্যে রাখতে চেয়েছিলেন। যে ৫ জন তফসিলী সদস্য সেদিন এর বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরা ভ্রান্তবাদী রাজনীতির শিকার হয়েছিলেন না কি?

অখণ্ড ভারতের কফিনে শেষ পেরেক

'পাকিস্তান গভর্ণমেন্টের অধীনে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের তফসিল জাতির সর্ববিধ উন্নতি লাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে। আর কংগ্রেস শাসিত হিন্দুস্থান পশ্চিমবঙ্গে তফসিল জাতির ভবিষ্যৎ চির অন্ধকারাচ্ছন্ন।'..... 'হিন্দুস্তানের অন্তর্গত ৫২ মিলিয়ন (৫ কোটি ২০ লক্ষ) তফসিলী বর্তমানে ছিটে ফোঁটা যে টুকু অধিকার ভোগ করছেন, তাও হারাবেন তাঁরা।'

— যোগেন্দ্রনাথ।

"We are extremely sorry that even at this critical hour, Mr. Mandal is playing with the fate of the Scheduled Castes and thus exposing himself as a traitor to their cause. We hope that he will be soon disillusioned and give up his role."

– S.C.Mazumder, Jessore.

কল্পলোকের গল্পকথার নায়কদের মধ্যে যাঁরা এখনও বলছেন যে 'দলিত-মুসলিম ঐক্যের বিকল্প নেই' তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ১৯৪৭-এর ভারত ভাগ (এবং তার সঙ্গে পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগ) নিয়ে গল্পের পর গল্প লিখে চলেছেন। একটি গল্পে তৎকালীন রিফর্মস্ কমিশনার শ্রীভি.পি. মেননকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী প্যাটেলের ব্যক্তিগত সচিব সাজিয়ে তাঁর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, 'জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ মিলিত ভাবে সিদ্ধান্ত করেছিল যে, পাঞ্জাব ও বাংলার হিন্দু মুসলমান এসেমব্লি সদস্যরা আলাদা আলাদা ভাবে দেশ ভাঙার পক্ষে বা বিপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন ভোটাভুটির মাধ্যমে। **হিন্দু বা মুসলমান যে কোন এক অংশ ভারত ভাগের পক্ষে মত দিলেই ভারত ভাঙা হবে।'** ঐ গল্পকার শ্রীভি. পি. মেননের নামে বিকৃত (পড়ুন 'জাল') তথ্য সম্বলিত এই গল্পটি উপহার দিলেন তাঁর পাঠকদের। উনি 'বাংলা ভাগ' শব্দটির পরিবর্তে 'দেশ ভাগ' শব্দটি ব্যবহার করে প্রমাণ করতে চাইছেন যে, ভারত ভাগের জন্য হিন্দুরাই দায়ী। এই অপকর্মে মহান (!) যোগেন মণ্ডল বা তাঁর আদর্শ সাঙ্গোপাঙ্গদের কোন দায় দায়িত্ব নেই। তাই এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ব্রিটিশদের বরাবরের সুয়ো রাণী মুসলিম লীগ ১৯৪০-এ 'পাকিস্তান প্রস্তাব' পাশ করার পর ব্রিটিশদের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ ঠিক করেছিলেন যে, লীগের স্বার্থেই ভারত ভাগ

করবেন। কিন্তু মুখে তা স্বীকার করলেন না। বললেন , 'আমরা ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবো।' এই কূট-কৌশল মাথায় নিয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতে আসেন। তিনি শ্রী মেননের সহায়তায় ভারত ভাগ এবং তার সঙ্গে পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগের একটি পরিকল্পনা করালেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তা অনুমোদন করলেন। এবারে এটি কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং শিখ প্রতিনিধিদের মেনে নিতে বাধ্য করানোর পালা।

২ জুন, ১৯৪৭। সোমবার। লর্ড মাউন্টব্যাটেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সকাল ১০ টায় ভারতীয় নেতাদের ডাকলেন। কংগ্রেসের পক্ষে এলেন পণ্ডিত নেহেরু (প্রধানমন্ত্রী), সর্দার প্যাটেল (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী), আচার্য কৃপালনী (কংগ্রেস সভাপতি); মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে এলেন মিঃ জিন্নাহ্ (মুসলিম লীগের সভাপতি), মিঃ লিয়াকত আলী খান (অর্থ মন্ত্রী) ও মিঃ আবদুর রব নিস্তার (যোগাযোগ মন্ত্রী)। শিখদের প্রতিনিধিত্ব করলেন সর্দার বলদেব সিং (প্রতিরক্ষা মন্ত্রী)। লর্ড তাঁর প্লান (সরকারী নাম 'H.M. Government's Statement, 3 June 1947') দেখালেন সকলকে। আলোচনার পর ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগ সহ ভারত বিভাজনে সম্মতি দিলেন এই নেতারা। ব্যতিক্রম ছিলেন মিঃ জিন্নাহ্। গোটা পাঞ্জাব ও গোটা বাংলা সহ তাঁর পূর্ণাঙ্গ পাকিস্তান চাই। লর্ড কোন রকম পাশ কাটিয়ে এই বলে মিটিং শেষ করলেন যে, কাল সন্ধ্যায় তিনি বেতার ভাষণ দেবেন। তিনি খুব খুশি হবেন যদি পণ্ডিত নেহেরু এবং মিঃ জিন্নাহ্ একই সঙ্গে ভাষণ দেন। তখনকার মত চলে গেলেন মিঃ জিন্নাহ্।

বেলা ১২-৩০ মিনিটের সময় গান্ধীজী লর্ডের সঙ্গে দেখা করে জানালেন আজ তাঁর মৌনব্রত পালনের দিন। তাই মুখে কিছু না বলে ৫ খণ্ড টুকরো কাগজে লিখে জানালেন যে, " আমি কি কোন বক্তৃতায় আপনার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেছি?" ["... Have I said one word against you during my speeches?" T.P. Vol. XI, page-48] এ কথার অর্থ দাঁড়ায় তিনিও দেশ ভাগ মেনে নিলেন।

রাত ১১ টার সময় মিঃ জিন্নাহ্ একটি 'মায়া কান্না মার্কা চাল' নিয়ে এলেন লর্ডের কাছে। বললেন বাংলা ভাগের মত নোংরা কাজ যদি করতেই হয় তাহলে তফসিলীদের প্রতি যেন সুবিচার করা হয়। [91]

উত্তরে লর্ড মিঃ জিন্নাহ্কে ধমক দিয়ে বললেন, 'কালকের মিটিং-এ মুখে কথা না বললেও চলবে আপনার। শুধুমাত্র মাথা নেড়ে এই প্লান মেনে নেবেন। নয়ত চিরদিনের জন্য আপনি পাকিস্তান হারাবেন।' (জিন্না-পাকিস্তান ঃ নতুন ভাবনা, পৃ-২৮১)

পরের দিন ৩ জুন সকাল ১০ টায় আবার মিটিং বসে। জিন্নাহ্ সাহেব এবার মাথা নেড়ে 'পোকায় কাটা পাকিস্তান' মেনে নিলেন। বিকেল ৩-৩০ মিনিটে [Double British SummarTime] ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী এটলি তাঁদের পার্লামেন্টে ক্ষমতা হস্তান্তরের দলিল ঘোষণা করেন। সন্ধ্যা বেলা লর্ড মাউন্টব্যাটেন, পণ্ডিত নেহেরু, মিঃ জিন্নাহ্ এবং সর্দার

বলদেব সিং বেতার ভাষণ দিয়ে ভারতবাসীকে জানিয়ে দেন যে, তাঁরা ভারত ভাগ মেনে নিলেন। [T.P. Vol. XI, page-101]

যোগেনবাবু প্রভুভক্তির চরম নিদর্শন দেখাবার উদ্দেশ্যে দেরী না করে পরের দিন ৪ জুন এক বিবৃতি দিয়ে পাকিস্তান অর্জনের জন্য কায়েদ-ই-আযম-মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌কে অভিনন্দিত করেন। তিনি বলেন, 'পাকিস্তানে তফসিলীদের অধিকার যথাযথ যে রক্ষিত হইবে তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।' তিনি বলেন, 'অবশেষে ভারতের অচল অবস্থার অবসান ঘটিল এবং ভারতকে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে বিভক্ত করণের দীর্ঘ বিতর্কমূলক প্রশ্নের সমাধান হইল। বাঞ্ছিত লক্ষ্য পাকিস্তান অর্জনের অপূর্ব সাফল্য লাভের জন্য আমি কায়েদে আজম জিন্নাহ্ ও মুসলিম লীগকে অভিনন্দিত ও সম্বর্ধিত করিতেছি। **যুগ যুগ ব্যাপী হিন্দু আধিপত্য হইতে ভারতের কোটি কোটি মুসলমানের মুক্তি লাভের সংবাদ বাস্তবিকই আনন্দপ্রদ।** নিশ্চিতরূপে মুসলমান ভারত তাহাদের পরিত্রাতা মহান কায়েদে আজমের কৃতিত্ব চিরদিন কৃতজ্ঞ ও বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তে স্মরণ করিবে।' একই সঙ্গে তিনি বলতে ভোলেননি যে, বড়লাট তফসিলীদের ইচ্ছার কোন মূল্য দেননি। জলপাইগুড়ি এবং খুলনা জিলার তফসিলীদের জন্য রেফারেণ্ডাম বা গণভোটের ব্যবস্থা রাখা উচিত ছিল। (ম.যোগেন্দ্রনাথ, ২/৬৮ এবং ৬ জুনের 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকা) তফসিলীদের ভাগ্য নিয়ে তামাসা করার চূড়ান্ত নিদর্শন বৈ কি!

ঐ সময় বাংলার তফসিলী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মিঃ কামিনী প্রসন্ন মজুমদার। তিনি যোগেনবাবুর বিবৃতিকে আরও উজ্জ্বল করার উদ্দেশ্যে একটি বিবৃতি দিয়ে বললেন, 'তফসিলী ও মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্যের চেয়ে বড় কোন স্বাভাবিক ঘটনা নেই পৃথিবীর বুকে।' (৭.৬.'৪৭ তারিখের 'মর্ণিং নিউজ, পৃ-৪) অথচ এর অনেক আগেই বাবাসাহেব বলে গেছেন, "Some people seem to think that it is enough if there is a political unity between Hindus and Muslims. I think this is the greatest delusion." [Dr. Ambedkar, Vol. 8/189.] অর্থাৎ "কিছু সংখ্যক মানুষ মনে করেন যে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করাই যথেষ্ট। আমি মনে করি এই চিন্তাধারা সবচেয়ে বড় ভ্রম।" ডঃ আম্বেদকর আরও বলেছেন, "Muslim politicians do not recognize secular categories of life as the basis of their politics.... The poor Muslims will not join the poor Hindus to get justice from the rich." Vol. 8/236. অর্থাৎ 'মুসলিম রাজনীতিবিদরা ধর্মনিরপেক্ষ জীবন-যাত্রাকে তাদের রাজনীতির ভিত্তি বলে স্বীকার করেন না। .... ধনীদের কাছ থেকে সুবিচার লাভের জন্য গরীব মুসলমানরা গরীব হিন্দুদের সংগে যোগ দেবেন না।'

যোগেনবাবু একটি হিসাব দেখিয়ে বলেছেন যে, ৮ কোটি তফসিলীদের মধ্যে হিন্দুস্তানে পড়বে ৫.২ কোটি। এঁদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। বাকী ২.৮ কোটি তফসিলী

পড়বে পাকিস্তানে। এঁদের ভবিষ্যৎ 'আলোকজ্জ্বল'। তাই উনি একটু জ্ঞান দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "মিঃ গান্ধী এবং পণ্ডিত নেহেরুর মত কংগ্রেসী নেতাদের মনে যেন শুভ বুদ্ধির উদয় হয় এবং পাকিস্তানে বসবাসরত তফসিলীদের প্রতি মিঃ জিন্নাহ্ যেমন সুবিচার করবেন, তাঁরাও যেন ভারতের তফসিলীদের প্রতি তেমন সুবিচার করেন।" [92]

'জাগরণের' ৩০.০৬.'৪৭ তারিখের সংখ্যায় এই খবরটি প্রকাশিত হয়েছে এই ভাবে, '.... গভীরভাবে চিন্তা করিয়া আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, পাকিস্তান গভর্ণমেন্টের অধীনে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের তফসিল জাতির সর্ববিধ উন্নতি লাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে। আর কংগ্রেস শাসিত হিন্দুস্থান পশ্চিমবঙ্গে তফসিল জাতির ভবিষ্যত চির অন্ধকারাচ্ছন্ন।' (ম.যোগেন্দ্র.২/৮০) 'হিন্দুস্তানের অন্তর্গত ৫২ মিলিয়ন (৫ কোটি ২০ লক্ষ) তফসিলী বর্তমানে ছিটে ফোঁটা যে টুকু অধিকার ভোগ করছেন, তাও হারাবেন তাঁরা।' বাস্তববাদী নেতার কি অভূতপূর্ব ভবিষ্যদ্বাণী!

এর বেশ কিছুদিন আগে জিন্নাহ্-সরোয়ার্দির পুতুল হিসাবে মণ্ডল মশাই কোলকাতাকে পাকিস্তানে নেবার যুক্তি দেখিয়েছিলেন। 'ট্রান্সফার অব পাওয়ার'-এ ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে এই ভাবে ঃ "কোলকাতায় গণভোট করা যায় কিনা এমন একটি প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। কারণ মিঃ মণ্ডলের *(যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল)* ধারণা ছিল এই, কোলকাতার তফসিলীদের ভোটে এমন ঘটনা ঘটতে পারে যে, কোলকাতা পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যোগ দেবে।" [93]

আসুন, এবারে আমরা দেখি কি ছিল বা আছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঐ দলিলে।

(ক) ভারতের অধিকাংশ প্রদেশের বেশিরভাগ প্রতিনিধিবৃন্দ অখণ্ড ভারতের জন্য একটি সংবিধান রচনার কাজে অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু, বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং ব্রিটিশ বেলুচিস্তানের অধিকাংশ মুসলমান প্রতিনিধি এই গণ পরিষদে (Constituent Assembly) যোগদান করেননি। (ধারা-২)

(খ) ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতের জন্য চূড়ান্ত সংবিধান রচনা করবেন না। এ কাজ করার দায়িত্ব ভারতবাসীর। অখণ্ড ভারত গঠনের পথে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বোঝাপড়ায় উপনীত হওয়ার কাজে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি করবেন না। (ধারা-৩)

(গ) গণ-পরিষদের কাজে কোন প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করার কোন ইচ্ছা নেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের। তবে যেসব এলাকার মানুষ এদের রচিত সংবিধান মেনে নেবেন না, তাঁদের উপর তা' জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হবে না। ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝে নেওয়ার জন্য ঐ সব এলাকার প্রতিনিধিদের কাছ থেকে জেনে নেওয়া হবে যে, তাঁরা কি —

(১) বর্তমান কার্যরত গণ-পরিষদে যোগ দেবেন? না —

(২) একটি নতুন এবং আলাদা গণ-পরিষদে যোগ দেবেন?

এই প্রশ্ন দু'টোর উত্তর পাওয়ার পরই এটা ঠিক করা সম্ভব হবে যে কার বা কাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। এখানে পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন যে, তৎকালীন

কার্যরত গণ-পরিষদে যোগদানের অর্থ ছিল অখণ্ড ভারতকে সমর্থন করা এবং নতুন একটি গণ-পরিষদে যোগদানের অর্থ ছিল ভারত বিভাজনকে সমর্থন করা।

ভারত ভাগ হলে বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ হবে — এটাই হচ্ছে বৃটিশ সরকার এবং অধিকাংশ হিন্দু ও শিখদের সর্বশেষ ঘোষিত নীতি। কিন্তু মুসলিম লীগ এবং তাদের সমর্থক মিঃ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এবং তফসিলী হিন্দুদের মধ্যে তাঁর অনুগামীরা ছিলেন এই নীতির বিরুদ্ধে। তাঁদের বক্তব্য ছিল — 'ভারত ভাগ হবে এবং গোটা বাংলা ও পাঞ্জাব পাকিস্তানের অংশে যাবে'। এটা ঠেকাতেই প্লানের রচয়িতারা বাংলা ও পাঞ্জাবের জন্য ৫ থেকে ৯ পর্যন্ত ৫-টি ধারা [T.P., Vol.XI, pp- 90-91] যুক্ত করেছেন এবং ধারাগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত করেছেন যে, মুসলিম লীগ এবং তাদের সমর্থক তপসিলী এম-এল-এ-রা যেন কোন ক্রমেই গোটা বাংলা ও গোটা পাঞ্জাবকে পাকিস্তানে নিয়ে যেতে না পারেন। তাই কাকতালীয় হলেও ৭ নং ধারাটির মাধ্যমে বাংলার এম-এল-এ-দের কাছে একটি সুবর্ণ সুযোগ সেদিন এসেছিল, যে-টি প্রয়োগ করে একমাত্র তারাই দেশ ভাগ অর্থাৎ ভারত ভাগ আটকে দিতে পারতেন। ঠিক আটকাতে না পারলেও বড় ধরনের সঙ্কট সৃষ্টি করতে পারতেন অবশ্যই। কারণ, ৭নং ধারাটিতে বলা হয়েছে যে, বঙ্গীয় আইন সভার একজন সদস্যও যদি দাবি করেন তাহলে ইওরোপীয় সদস্যগণ বাদে অন্যান্য সদস্যরা একত্রে বসে প্রথমেই ঠিক করে নেবেন যে, সমগ্র বাংলা কোন গণ-পরিষদে যোগ দেবে — তখনকার কার্যরত গণ পরিষদে না নতুন একটি গণ পরিষদে। সেদিন অধিকাংশ এম. এল. এ-রা তখনকার কার্যরত গণ পরিষদে যোগ দিলে পশ্চিমবঙ্গ তো ভাগ হতই না; এমন কি ভারত ভাগ নাও হতে পারতো।

১৯৪৭ এর ২০ জুন দুপুরে বঙ্গীয় আইন সভায় সর্বপ্রথমে এই ৭ নং ধারা অনুসারেই ভোট হয়। তার আগেই মিঃ জিন্নাহ্ হুইপ জারি করে বলেছিলেন মুসলিম লীগ এবং তাদের সমর্থক এম-এল-এ-রা অতি অবশ্যই ভারত ভাগের পক্ষে এবং বাংলা ভাগের বিপক্ষে ভোট দেবেন। 'বিধান সভায় দেশ-বিভাগ প্রস্তাব পেশ করার পূর্বে কারেন্সি নোটে থলি ভর্তি করে নবাবজাদা লিয়াকত আলি কোলকাতায় উপস্থিত হয়েছিলেন।' (যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়, পৃ-৪০৩) ২৫০ জন সদস্য বিশিষ্ট আইন সভায় ২১৬ জন সদস্য প্রথম ধাপের ভোটে অংশগ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে ১২৬ সদস্য একটি নতুন এবং আলাদা গণ-পরিষদ গঠনের পক্ষে অর্থাৎ ভারত ভাগের পক্ষে ভোট দেন। গভর্নর এস. বারোজ সাহেব সংগে সংগে টেলিগ্রাম করে মাউন্টব্যাটেনকে এই ভোটের ফলাফল জানিয়ে দেন। [T.P., Vol. XI, p-536]

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সেদিন কমিউনিষ্ট সদস্যরা (সর্বকমরেড জ্যোতি বসু, রতন লাল ব্রাহ্মণ এবং রুপনারায়ন রায়) প্রথম ধাপের ভোটে অংশগ্রহণ করেননি। কোন এক অজ্ঞাত কারণে হক সাহেব ছিলেন কোলকাতার বাইরে। যে ১২৬ জন বঙ্গবীর (???) সেদিন সংখ্যালঘু বিনিময়ের কথা মুখে না এনে ভারত ভাগের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন ১২০ জন মুসলমান, ৫ জন তপসিলী হিন্দু এবং ১ জন ভারতীয় খৃষ্টান। তফসিলী হিন্দুরা হচ্ছেন - সর্বশ্রী নগেন্দ্রনারায়ণ রায় (মন্ত্রী), দ্বারিকানাথ

বারুরী (মন্ত্রী), ডাঃ ভোলানাথ বিশ্বাস (সংসদীয় সচিব), হারাণচন্দ্র বর্মন (সংসদীয় সচিব), এবং গয়ানাথ বিশ্বাস। (আনন্দ সঙ্গী, পৃ-২৫৯)। ভোটের মাধ্যমে এনারা বললেন, ভারত ভাগ হবেই এবং সমগ্র বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। ঠিক তখনি বঙ্গীয় আইন সভা অস্থায়ী ভাবে দু'টো অংশে ভাগ হয়ে গেল ঃ পূর্ববঙ্গ আইন সভা এবং পশ্চিমবঙ্গ আইন সভা। এই পর্যায়ে উভয় সভায় প্রথমে প্লানের ৬ নং ধারা অনুসারে ভোট হয়। ৬ নং ধারা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ আইন সভায় '৫৮-২১' ভোটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, বাংলা ভাগ হবে এবং ৮ নং ধারা অনুসারে অনুরূপ সংখ্যক ভোটে আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পশ্চিমবঙ্গ তৎকালীন গণ-পরিষদে যোগদান করবে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

সেদিনকার ঐ ভোটে যে ২১ জন সদস্য পশ্চিমবঙ্গকেও পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই মুসলমান এবং মুসলিম লীগের সদস্য। যে ৫৮ জন হিন্দু এম. এল. এ পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের মধ্যে রাখলেন তাঁদের মধ্যে ৪৮ জন ছিলেন কংগ্রেসী, ৪ জন এ্যাংলো ইন্ডিয়ান, একজন ভারতীয় খৃষ্টান এবং ২ জন কমিউনিষ্ট (কমরেড জ্যোতি বসু এবং রতন লাল ব্রাহ্মণ)। এ ছাড়া ছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, শ্রীমুকুন্দ বিহারী মল্লিক এবং বর্ধমানের মহারাজা। (আনন্দ সঙ্গী, ১৯৭৫, পৃ-২৫৬)

পশ্চিমবঙ্গ আইন সভার অনুরূপ পূর্ববঙ্গ আইন সভাতেও একই সময় মাউন্টব্যাটেন প্লানের ৬ ও ৮ নং ধারা অনুসারে ভোট হয়। ৬ নং ধারা অনুসারে ভোট দিতে গিয়ে পূর্ববঙ্গ আইন সভার ৫ জন তপসিলী, ১০০ জন মুসলমান এবং ১ জন ভারতীয় খৃষ্টান (মোট ১০৬ জন) বাংলা ভাগের বিপক্ষে ভোট দেন। ৮ নং ধারা অনুসারে ভোট গ্রহণের সময় **ঐ ১০৬ জন সদস্যের সঙ্গে কমিউনিষ্ট এম. এল. এ কমরেড রূপনারায়ণ রায়ও পূর্ববঙ্গকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে ভোট দেন।** তাঁরা দলিলের ১৩ নং ধারা অনুসারে ভোটের মাধ্যমে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সিলেটের গণভোটে লীগ জয়ী হলে সিলেটকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হবে। [94] তখনও পূর্বোক্ত যোগেন্দ্র অনুগামী ৫ জন তফসিলী হিন্দু সিলেটকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ভোট দেন। সংখ্যালঘু বিনিময় বিহীন দেশ-ভাগের কলঙ্কময় ইতিহাসে সেদিন এঁরা আর একটি ছোট্ট অধ্যায় যোগ করলেন। তবে এ কথাও সত্য যে, সেদিন ২৪ জন তফসিলী সদস্য যোগেন্দ্রবিরোধী গ্রুপে থেকে মুসলিম লীগের উপ-পাকিস্তান ওরফে তথাকথিত 'অখণ্ড বাংলা' তত্ত্বের চরম বিরোধিতা করেছিলেন।

সেদিন বাংলার ১ জন মুসলমান এম, এল, এ-ও কার্যরত গণ-পরিষদে যোগদানের পক্ষে ভোট দেননি। অর্থাৎ অখণ্ড ভারতের পক্ষে ভোট দেননি। এখানে একটি মজার ব্যাপার (পড়ুন 'ধ্বংসাত্মক ব্যাপার') উল্লেখ না করে পারছি না। বর্তমানে ভারতের কোন কোন রাজনৈতিক দল 'দলিত-মুসলিম ঐক্য' গড়ে দিল্লীর ক্ষমতা দখল করতে চান। এদের মধ্যে অনেক নেতা ঐদিনের ভোটাভুটির ইতিহাসকে উল্টে দিয়ে প্রচার করছেন যে, বাংলার মুসলমান এম-এল-এ-রা ভারত ভাগ চাননি, যোগেনবাবু এবং তাঁর অনুগামীরাও

ভারত ভাগ চাননি। এই প্রাজ্ঞ ও বীর সেনানী (!!) নাকি অখণ্ড স্বাধীন বাংলা চেয়েছিলেন।

মাউন্টব্যাটেনের প্লানের শর্ত ছিল এই যে, অস্থায়ীভাবে গঠিত বাংলার দু'টো আইন সভার মধ্যে একটিতেও যদি অধিকংশ এম, এল, এ-রা বাংলা ভাগের পক্ষে মতামত জানান, তবে বাংলা ভাগ হবে। এই শর্ত অনুসারেই ভারত ভাগের সঙ্গে বাংলাও ভাগ হয়েছে এবং পশিচমবঙ্গ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৮ জুন, বুধবার, ১৯৪৭, বিকেলে কোলকাতার ভারত সভা হলে অনুষ্ঠিত একটি সভায় তৎকালীন এম. এল. এ. ও গণ-পরিষদ সদস্য শ্রীপ্রমথ রঞ্জন ঠাকুর খুলনা জিলা সংলগ্ন গোপাল গঞ্জ, বাকেরগঞ্জ (বরিশাল) ও ফরিদপুরের হিন্দু প্রধান এলাকা সহ নতুন পশ্চিমবঙ্গ গঠনের জোর দাবি জানান। ২০ জুনের অমৃত বাজার পত্রিকা এই খবর পরিবেশন করে বলছে — "Dr. B.R. Ambedkar, with whom he had a talk, urged him [Shri Thakur] to arrange for the transfer of population and demand territories proportionate to their present holdings and population."

২০ জুনের ভোটের আগেই লীগের মহান (!) উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য মিঃ মণ্ডল কোলকাতায় এসেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক অনুন্নত লীগের সাধারণ সম্পাদক শ্রীরাধানাথ দাস বলেন, 'মুসলিম লীগের পুতুল মিঃ যোগেন মণ্ডল আবার কোলকাতায় এসেছেন। বাংলা ভাগ নস্যাৎ করার জন্য তিনি এম. এল. এ-দের প্রলুব্ধ করছেন।' (অমৃত বাজার পত্রিকা ঃ ২০ জুন, '৪৭)

জুলাই মাসের ৬ ও ৭ তারিখে পুর্ববঙ্গের সিলেট জিলায় গণভোট গৃহীত হয়। সাধারণ মুসলিম লীগার ছাড়াও মোল্লা-মৌলভী ও ২০০০ মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড নিয়ে (মর্নিং নিউজ, ২১. ৬. '৪৭) একটি বিশ্রী এবং জটিল অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন জিন্নাহ্-লিয়াকত-সরোয়ার্দি সাহেবরা। ৭ জুলাই (১৯৪৭) তারিখের 'দি ট্রিবিউন' পত্রিকার মতে সব দলের বিশ হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবক ঐ সময় দাপিয়ে বেড়িয়েছে সারা সিলেট জুড়ে। চা-বাগানের বিরাট সংখ্যক হিন্দু শ্রমিকদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তাই '২,৩৯,৬১৯—১,৮৪,০৪১' ভোটের ব্যবধানে সিলেট পূর্ব পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেদিন যোগেনবাবু ওখানে গিয়ে তফসিলীদের নিয়ে সভা করে মুসলিম লীগের পক্ষে অর্থাৎ পাকিস্তানের পক্ষে প্রচারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। না, আইনে কোন ফাঁক রাখেননি তিনি। বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেনের অনুমতি নিয়েই সিলেটে গিয়েছিলেন তিনি। [T.P. Vol. XI, page-591] মিঃ জিন্নাহ্ যেমন যোগেনবাবুকে কাজে লাগিয়েছিলেন, তেমনি মুসলিম উলেমাদের একটি অংশকেও কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। ঐ উলেমারা সিলেটে গিয়ে যে সব বক্তব্য রাখতেন তার মধ্যে একটি মজার অংশ হচ্ছে এই রকম ঃ "মুসলিম লীগের পক্ষে যারা ভোট দিচ্ছেন তারা মুসলমান। এই এক কাজের জন্য তাঁরা বেহেশতে যাবেন। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ভোটদানকারীরা কাফের।

মৃত্যুর পর তাঁদের স্থান দোজখ-এ।"[95] সেদিন রসিক জনেরা বলতেন, যোগেন আলী মোল্লা বাবাসাহেবের সহযাত্রী হয়ে সংগ্রাম করার চেয়ে মুসলিম লীগকে ভোট দিয়ে 'কাফের' নাম ঘোচাতে এবং মৃত্যুর পর সরাসরি বেহেশ্‌তে যাওয়ার সহজ পথকেই বেছে নিয়েছিলেন।

যাক, এ ব্যাপারে আমরা যোগাযোগ করেছিলাম বিশিষ্ট আম্বেদকর অনুরাগী সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীরঞ্জিত কুমার সিকদার মহাশয়ের সঙ্গে। তিনি জানালেন (৩০.৭.২০০৩), শ্রীমতী হেমলতা মণ্ডলকে (প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা, রাজপুর পদ্মমণি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়) নিয়ে তিনি যোগেনবাবুর কাছে গিয়েছিলেন ১৯৬৪ বা '৬৫-তে। শ্রীমতী মণ্ডল যোগেনবাবুকে প্রশ্ন করেছিলেন কোন অবস্থায় উনি মুসলিম লীগের হয়ে পাকিস্তানের স্বপক্ষে সিলেটে প্রচার চালাতে গিয়েছিলেন। উত্তরে যোগেনবাবু বলেছেন ঐ সময় তাঁর পক্ষে লীগের অনুরোধ উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না।

পবিত্র-ভূমির আইন মন্ত্রীর স্বর্ণ সিংহাসনে

'পাকিস্তান' প্রকৃত অর্থে 'পবিত্রস্থান'—যোগেন্দ্রনাথ।

ম. যোগেন্দ্রনাথ-২/৭৫

"গেরুয়া মাঝে লুকিয়ে ছিলো লৌহরাঙা আকাঙ্খা,
স্বার্থাগুনে জ্বালিয়ে দিলে দেশটাকে।
নিমেষতরে ভাবলে না তো জনগণের ভব্যটা,
বিশ্বময় খুঁজলে শুধু লোভটাকে।।"

ড. অনিল বিশ্বাসের 'তর্ক, বিতর্ক ও কুতর্ক', পৃ-৮৬।

১৪ আগষ্ট, ১৯৪৭। যোগেনবাবু কর্তৃক আখ্যায়িত 'পবিত্র-ভূমি' পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। এর ৪ দিন আগে করাচীতে পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম বৈঠক বসবে। তারও ৬ দিন আগে ৫ আগষ্ট যোগেনবাবু করাচীর উদ্দেশ্যে দিল্লী ত্যাগ করেন। কিন্তু সেদিন তিনি সঙ্গে নিতে পারেননি তাঁর সরাসরি চাকুরীদাতা হোসেন শহিদ সরোয়ার্দিকে; যিনি দু'দুটো লোমহর্ষক গণহত্যা ঘটিয়ে, কোলকাতা ও নোয়াখালির মাটি হিন্দুদের রক্তে লাল করে দিয়ে পাকিস্তান এনে দিয়েছেন; যিনি কোলকাতা শহরকে পাকিস্তান-ভুক্ত করার জন্য সযত্নে ও সরকারী সাহায্যে ২৪ পরগনার গ্রামাঞ্চলে আমদানী করেছিলেন উত্তর ভারতের অগুণতি অবাঙালী মুসলমান পরিবার। উত্তর ২৪ পরগনার গুমো-হাবরাতে এর নজীর আছে বলে উল্লেখ করেছেন কালীপদ বিশ্বাস তাঁর 'যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়'-র ভূমিকায় (পৃ-২১)। কালীপদ বাবু আরও জানাচ্ছেন যে, ১৯৪২-এ ঐ সরোয়ার্দি সাহেবের পরিকল্পনা অনুসারেই লীগ 'মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড' বাহিনী তৈরী করে (পৃ-৩৬০)। এ ছাড়া শহিদ সাহেব ধর্মে মুসলমান, রাজনীতিতে মুসলিম লীগার এবং যে কোন বিচারে প্রথম শ্রেণীর পাকিস্তান প্রেমিক। তাঁকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে জিন্নাহ্-লিয়াকত সাহেবরা জামাই আদরে আইন মন্ত্রী করে নিয়ে গেলেন নমঃশূদ্র যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে। এর কারণ কি এই নয় যে, জিন্নাহ্-লিয়াকত সাহেবদের বিচারে যোগেনবাবু সরোয়ার্দির তুলনায় অধিকতর সাচ্চা পাকিস্তান প্রেমিক ছিলেন? হায়! মুসলমান সরোয়ার্দিকে যারা ছুড়ে ফেলে দিতে পারে তারা একজন কাফেরকে কি করতে পারে তা যদি সেদিন মণ্ডল মশাই বুঝতে পারতেন!

পাকিস্তান গণ-পরিষদের প্রথম দিনের বৈঠক বসে ১০ আগষ্ট, রোববার। যোগেন্দ্রনাথকে সভাপতির আসনে বসানো হল। সভাপতির ভাষণে মণ্ডল মশাই মিঃ জিন্নাহ্কে

তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রাজনীতিবিদ এবং মহত্তম ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করলেন। (ম. যোগেন্দ্র.,২/৯২) পরের দিনের বৈঠকে মিঃ জিন্নাহ্ পাকিস্তান গণ-পরিষদের সভাপতির আসনটি স্থায়ী ভাবে নিজেই গ্রহণ করলেন এবং লীগের সহযোগী সদস্য মিঃ যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডলকে পাশে বসিয়ে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে বিশ্ববাসীকে একটি ধোঁকা দিলেন। বললেন, "রাষ্ট্রীয় জীবনে পাকিস্তানে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্য থাকবে না। সবাই সমান অধিকার পাবে। সবাই নিজেদেরকে পাকিস্তানী বলে পরিচয় দেবে।" [96] মুসলিম ধর্মশাস্ত্র অনুসারে হিন্দু নামক 'মানবেতর' জীবরা যে কোনক্রমেই সমান অধিকার পেতে পারে না - এই বোধ শক্তি ছিল না আমাদের নেতাদের। একমাত্র ব্যতিক্রম ডঃ আম্বেদকর। সেদিনের ঐ প্রতিশ্রুতি যে নিছক ধোঁকা ছিল তা' প্রমাণিত হতে সুরু করে কয়েক দিনের মধ্যেই।

যোগেনবাবু কথিত তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রাজনীতিবিদ জিন্নাহ্ কয়েকদিনের মধ্যেই 'ক্যাবিনেট কমিটি' গঠন করলেন। সেখানে কাফের মণ্ডল মশাই ছাড়া আর সব ক্যাবিনেট মন্ত্রীর ঠাঁই হয়েছিল। (ম. যোগেন্দ্র.,২/৩১৩) দেশের নিরাপত্তা বা যুদ্ধ সংক্রান্ত কোন পরামর্শের ব্যাপারে কাফেরদের যে রাখা যায় না, যোগেনবাবু তখনও তা বুঝতে যাননি। '৪৭-এর অক্টোবরে কাশ্মীর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল পাকিস্তান। এ ব্যাপারে মণ্ডল মশাই বিন্দু-বিসর্গও জানতেন বলে আমরা মনে করি না। তাঁকে সেদিন অন্য একটি মহৎ (?) কাজে ব্যস্ত রাখা হয়েছিল। দাঙ্গা হাঙ্গামা তখনও চলছে। মুসলিম গুণ্ডাদের হাত থেকে হিন্দুরা রেহাই পাচ্ছেন না। তখন যোগেনবাবুর মাথায় একটি বুদ্ধি এলো বা কেউ বুদ্ধি দিল যে কোন ভাবে তফসিলী এবং বর্ণহিন্দুদের যদি আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায় তাহলে হয়ত তফসিলীরা বেঁচে যাবেন। তাই উনি অক্টোবরের ৯ তারিখ ('৪৭) সিন্ধু প্রদেশের তৎকালীন চীফ সেক্রেটারি মিঃ ফারুকী এবং করাচীর কতিপয় তফসিলী নেতার সঙ্গে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এখন থেকে তফসিলীরা ঘরের বাইরে কাজ কর্ম করতে গেলে একটি 'ব্যাজ' পরে যাবে। সবুজ কাপড়ের উপর চাঁদ ও তারার প্রতীক (ইসলামী প্রতীক) এবং 'ডিপ্রেস্‌ড ক্লাস' এই কথাগুলো লেখা থাকবে। ১৯৪৭-এর ৯ অক্টোবর গৃহীত এই সিদ্ধান্ত ১৩ অক্টোবরের 'মর্ণিং নিউজ' কাগজের ৪র্থ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে প্রকাশিত হয় এই ভাবে —

Scheduled Castes To Wear Distinctive Crests

Karachi, October 9 [1947] – The Scheduled Caste Community of Karachi will soon be wearing crests with a dark green background surmounted by a white crescent and star to distinguish them from Caste Hindus and others. The crests, which will be worn on arm bands, will have the words "Depressed Class" printed on them.

This decision was taken on a recent conference attended by

Mr. J.N.Mandal, Pakistan's Law and Labour Minister, Mr. Faruqi, Chief Secretary to the Sind Government and a representative deputation of Karachi Scheduled Castes ...." (Globe).

সেদিন গান্ধীজী সহ অনেকেই এই ঘৃণ্য ও অপমানজনক কাজের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। উত্তরে যোগেনবাবু বলেছিলেন, ''এই 'ব্যাজ' পরা নিয়ে কোন প্রকার মন্তব্য করার দরকার নেই মিঃ গান্ধীর। যে সব গরীব তফসিলী শ্রমিক কাজের জন্য বাইরে যায় তাদের জন্য এটা প্রয়োজন।'' [97] এ কথার অর্থ কি এই দাঁড়ায় না যে, অ-তফসিলী হিন্দুরা খুন হয়ে যায় যাক? কোন সভ্য দেশের আইন মন্ত্রীর মুখে কি এই মন্তব্য শোভা পায়? কিছুদিন আগে মুসলিম রাষ্ট্র আফগানিস্তানে শিখ ও হিন্দুদের হলুদ পোষাক পরতে বলেছিল ওখানকার তালিবানরা। কিন্তু কোন দেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর একটি বিশেষ শ্রেণীর কোন নেতা তাঁর নিজের গোষ্ঠীভুক্ত লোকদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য সংখ্যাগুরু গোষ্ঠীর 'ব্যাজ' পরতে বলেছেন, এমন রেকর্ড সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে নেই।

তখন কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন আচার্য জে.বি.কৃপালনী। তিনি ৭ অক্টোবর বম্বেতে এক ভাষণে বললেন,'পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের ব্যাপারটি আমাদের সর্বাধিক 'উদ্বেগের কারণ'। তাঁদেরকে ভারত ডোমিনিয়নের মধ্যে জায়গা করে দিতে হবে।' [98]

এ সব দেখে শুনে বাবাসাহেব কেবিনেট ডিসিশনের তোয়াক্কা না করে নিজের দায়িত্বে 'ফ্রি প্রেস জার্নাল'-এ বিবৃতি (১৯৪৭-এর ২৮ নভেম্বর) দিয়ে বললেন, 'যে সকল তফসিলী পাকিস্তানে আটকে পড়েছেন তাঁরা যে কোন উপায়ে ভারতে চলে আসুন। দ্বিতীয় যে কথাটি আমি বলতে চাই তা' হচ্ছে এই, পাকিস্তান বা হায়দারাবাদে আটকে পড়া তফসিলীদের পক্ষে **মুসলমান বা মুসলিম লীগের উপর বিশ্বাস রাখা মৃত্যু সমতুল্য হবে।'** তিনি আরও বললেন, বিপদ এড়াবার সহজ পথ হিসেবে কেউ যেন মুসলমান হয়ে যাওয়ার মত সহজ পথ অবলম্বন না করেন। ইতিমধ্যেই যারা মুসলমান হয়ে গেছেন তাঁরা নিজ নিজ ধর্মে ফিরে আসুন। আমি হায়দরাবাদের তফসিলীদের বলছি ওখানকার নিজাম ভারতের শত্রু। তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করে নিজের সম্প্রদায়কে কলঙ্কিত করবেন না।' [99] যোগেন্দ্র অনুগামীদের কাছে আমাদের প্রশ্ন —বাবাসাহেবের এ সব বিবৃতি পড়েও মণ্ডল মশাই কেন পাকিস্তানের মুসলিম লীগের উপর বিশ্বাস রেখে তাদের চাঁদ-তারা মার্কা ব্যাজ পরতে বলেছিলেন? এর ফলে যোগেনবাবুর হাতে বাবাসাহেবের দর্শন উজ্জ্বল হয়েছে, না মসীলিপ্ত হয়েছে? সেদিন মুসলিম লীগের ব্যাজ পরেও তফসিলীদের ওখানে থাকতে বলে হীনমন্যতার যে ফাঁসটা তৈরী করে ফেলেছেন তারই পরিণাম স্বরূপ এখনো জীবন দিতে হচ্ছে নির্যাতিত শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ পুরুষদের এবং প্রতি মুহূর্তে সতীত্ব দিতে হচ্ছে হাজার হাজার মা-বোনদের।

১৯৪৭-র ২২ অক্টোবর পাকিস্তান মদতপুষ্ট বাহিনী কাশ্মীর আক্রমণ করে। তারা

ছোট ছোট কয়েকটি জায়গা দখল করে মুজাফ্ফরাবাদের কাছে এসে পৌঁছায়। ওখানকার প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিলেন লেঃ কর্নেল নারায়ণ সিং। তাঁর অধীনস্থ বাহিনীতে ছিল ডোগরা এবং মুসলমান সেনা। হঠাৎ মুসলমান সেনারা তাদের কমান্ডিং অফিসার এবং তাঁর এ্যাডজুডেন্টকে গুলি করে পালিয়ে গিয়ে আক্রমণকারীদের সঙ্গে যোগ দেয়। এর মাত্র কয়েকদিন আগে কাশ্মীরের মহারাজা লেঃ কঃ নারায়ণ সিংকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মুসলমান সৈনিকদের বিশ্বাস করা যায় কিনা। উত্তরে মিঃ সিং বলেছিলেন, মুসলমান সৈনিকদের তিনি ডোগরা সৈনিকদের চেয়েও বেশি বিশ্বাস করেন।'* এরপর আক্রমণকারীরা 'উরি'-র দিকে এগোতে থাকে। তখন কাশ্মীরের সেনা প্রধান ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দার সিং ১৫০ জন অনুগামী নিয়ে তাদের বাধা দিতে এগিয়ে যান। দু'দিন ধরে তুমুল যুদ্ধ করে আগ্রাসনকারীদের আটকে রাখতে সমর্থ হন। কিন্তু তিনি পরাজিত হন এবং তাঁকে এবং তাঁর অনুগামীদের কেটে কুচো কুচো করে ফেলা হয়। যোগেনবাবু তখন কি করছিলেন তা তাঁর অনুগামীরা কেউ জানালে খুশি হব। আজ তাঁর অনুগামীদের মধ্যে যাঁরা 'দলিত-মুসলিম' ঐক্যের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন, তাঁরা কি আমাদের এই আশ্বাস দিতে পারেন যে, ভবিষ্যতে অনুরূপ ঘটনা ঘটবে না? তাঁদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, কাশ্মীরের ঐ ঘটনার আগেই বাবাসাহেব বলেছিলেন, '..... মুসলমানরা হিন্দু সরকারকে মেনে চলবে না'। (তাঁর ইংরেজী রচনাবলী, ৮/৩০১) বাবাসাহেবের কোরান হাদিস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ছিল বলেই এমন নির্ভুল মন্তব্য করতে পেরেছিলেন। কোরানের ৩৩/৪৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "And obey not (the behests) of the unbelievers ..."- Abdullah Yusuf Ali's 'Meaning of The Illustrious QUR-AN, 1997, p-320.) অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের আদেশ মানবে না।

১৯৪৮-এর মার্চ মাসে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি গণ পরিষদে একটি প্রস্তাব

*** The all-out invasion of Kashmir started on 22 October 1947. The main raiders' column, ... captured Garhi and Domel and arrived at the gates of Muzaffarabad. The State battalion, consisting of Muslim and Dogras stationed at Muzaffarabad, was commanded by Lt.-Colonel Narain Singh, all the Muslims in the battalion deserted; shot the Commanding Officer and his adjutant; joining the raiders, and acted as advance-guard to the raiders' column. It may be mentioned that only a few days before Lt.-Colonel Narain Singh had been asked by the Maharajah whether he could rely on the loyality of the Muslim half of his battalion. He unhesitatingly answered. 'More than on the Dogras'. [From V.P.Menon's 'The Story of the Integration of the Indian States', Orient Longmans Ltd.,1956, pp. 396]**

আনেন যাতে বলা হয় 'ইসলামে বর্ণিত গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য, সহিষ্ণুতা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সংবিধান রচিত হবে।' বলা বাহুল্য এই প্রস্তাবে মিঃ জিন্নাহ্‌র পূর্ণ সম্মতি ছিল। লীগের একনিষ্ঠ সেবক যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল সেদিন পাকিস্তানের আইন মন্ত্রী হিসাবে হিন্দুদের জন্য 'হেমলক' সদৃশ ঐ প্রস্তাবের আইনী বৈধতা দিয়েছিলেন। প্রাজ্ঞ আইন মন্ত্রী বটে!

এর পর পরই রাষ্ট্রীয় মদতে গুণ্ডাবাজ মুসলমানরা (বিশেষত ন্যাশনাল গার্ড বাহিনী) নতুন উদ্যমে হিন্দু ও বৌদ্ধদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয় হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও নারীধর্ষণ। এর সঙ্গে থাকে ধর্মান্তরকরণ। প্রতিবাদের এতটুকু সাহস ছিল না আইন মন্ত্রী যোগেনবাবুর। বরং তাঁর ছিল নীরব ও অসহায় সমর্থন।

স্বাধীন পাকিস্তানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয় ১৯৪৮-এর ২৪ মার্চ। পাকিস্তানের জাতির পিতা, মুসলিম লীগের প্রাণ পুরুষ ও গভর্ণর জেনারেল মিঃ মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্ ভাষণ দিতে উঠে বললেন, "প্রিয় ছাত্রবৃন্দ, ইসলাম ধর্মের জন্যই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা।" [6] সেদিন ঐ ঘোষণার আইনী বৈধতা দেবার দায়িত্ব যার উপর ছিল তিনি পাকিস্তানের আইন মন্ত্রী মিঃ যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল। আজকের পশ্চিমবঙ্গে যে সব যোগেন্দ্র অনুগামী সাইড ব্যাগ কাঁধে নিয়ে প্রাণ উজার করে সেদিনের পূর্ববঙ্গের ভাষা-শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন তারা কি জানেন, সেদিন যোগেনবাবু এবং তাঁর ভক্তরা লীগের অংশীদার হিসাবে উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার জন্য মুসলিম লীগের হাত কতটা শক্ত করেছিলেন?

১৯৪৯-এর আগষ্ট থেকে ১৯৫০-এর ১৮ মার্চ পর্যন্ত হিন্দুদের উপর সংঘটিত পাশবিক অত্যাচার ও খুনের (one-sided diabolical killing and persecution of Hindus by Muslims) তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আইন সভার বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ (সর্বশ্রী বসন্তকুমার দাস, গণেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মুনীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, হারাণচন্দ্র ঘোষচৌধুরী এবং মনোরঞ্জন ধর) প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর কাছে এক স্মারক লিপি দেন। এই স্মারক লিপিতে উল্লেখ করেন যে, ১৯৪৯-এর আগষ্ট মাসে সিলেট জিলার বিয়ানি বাজার ও বরলেখা থানায় একতরফা ভাবে হিন্দু নিধন শুরু হয়। অবস্থা চরমে পৌঁছায় '৫০-এর ফেব্রুয়ারীতে। ফেব্রুয়ারীর ৬ তারিখ রাতে এবং ৭ তারিখ বিকেলে রেডিও পাকিস্তান থেকে বারবার প্রচারিত একটি ঘোষণায় বলা হয়, "ভাইসব, আপনারা শুনছেন পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতে আমাদের মুসলমান ভাইদের উপর অমানবিক অত্যাচার করা হচ্ছে। আপনারা কি প্রস্তুত হবেন না? আপনারা কি শক্তি সঞ্চয় করবেন না?" [100] ১০ ফেব্রুয়ারী সকালে চারজন মহিলার হাতে শাঁখা পড়িয়ে, কপালে সিঁদুরের টিপ পড়িয়ে এবং তাদের কাপড়ে লাল রঙ লাগিয়ে ঢাকা সেক্রেটারিয়েটের চারদিকে

ঘোরানো হয়। বলা হয় যে, কোলকাতায় এদেরকে হিন্দু বানিয়ে এদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। বেলা ১১ টার সময় সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারীবৃন্দ অফিস ত্যাগ করে ভিক্টোরিয়া পার্কে সমবেত হয়ে সভা করে। ঐ সভা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু হত্যা এবং হিন্দুদের দোকান ও বাড়ীঘর লুঠপাট শুরু হয়ে যায়। সঙ্গে চলে অগ্নিসংযোগ ও নারী ধর্ষণ। ট্রেন ও স্টীমারে করে যে সব হিন্দুরা ঢাকায় আসছিলেন, স্টেশনে তাদেরকে খুন করা হয়। প্রায় ৭ ঘন্টা ধরে একতরফা ধ্বংসলীলা চলার পরে মিলিটারী নামে। দেশের সর্বত্রই অনুরূপ ঘটনা ঘটে। স্মারকলিপিতে ঢাকা ছাড়াও সিলেট, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ, চিটাগাং, নোয়াখালি, ত্রিপুরা জেলায় সংঘটিত পাশবিক অত্যাচারের বর্ণনা দেওয়া হয় এবং এর প্রতিকার ও প্রতিবিধানের জন্য ২২-দফা পরামর্শ দেন পূর্বোক্ত নেতৃবৃন্দ। লিয়াকত আলী সাহেব স্মারকলিপিটি গ্রহণ করে হিন্দুদের কৃতার্থ করেন মাত্র। এটাই আসলে মুসলিম লীগের আসল রূপ। দুঃখিত ও মর্মাহত যোগেনবাবু ঘুরে ঘুরে ধ্বংস লীলা দেখলেন, হত্যা ও ধর্ষণের তথ্য শুনলেন। তখন পরিস্থিতি দেখে তার মনে হয়েছিল 'সকল হিন্দুরাই বুঝি দেশ ছেড়ে চলে যাবে'।

কিন্তু এর প্রতিবাদে তিনি পদত্যাগ করেননি। মন্ত্রিত্ব তাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে বসেছিল। বরং তার সরকারের নির্দেশে গ্রাম-গঞ্জে সভা করে জনগণকে উৎসাহিত করে বলতেন, আপনারা দেশ ত্যাগ করবেন না। সাহসের সঙ্গে ভিটা মাটিতে থাকুন। এ ব্যাপারে পদত্যাগপত্রে তিনি স্বীকারোক্তি করেছেন এই ভাষায় —

"আমি ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা এবং যশোর জিলা পরিদর্শন করেছি এবং কয়েক ডজন জনাকীর্ণ সভায় বক্তৃতা দিয়ে তাঁদের পিতৃপুরুষের ভিটা বাড়ী ছেড়ে না যাওয়ার জন্য বলেছি।" (পদত্যাগ পত্রের ২৩ নং অনুচ্ছেদ)

শেষ গাড়ীতে(?)

"লক্ষ লক্ষ জনগণের কথা চিন্তা না করে তিনি নিজের প্রাণ রক্ষার কথাই ভেবেছেন। তাই তিনি 'মহাপ্রাণ' উপাধির অযোগ্য; বরং 'অল্পপ্রাণ'-ই সঠিক নামকরণ। ন্যায়ের নিরিখের এই মূল্যায়ন।" — ডঃ অনিল রঞ্জন বিশ্বাস। [101]

মিঃ মণ্ডল আত্মবিশ্বাস (যা' পরে আত্মপ্রবঞ্চনায় রূপান্তরিত হয়েছিল) নিয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রামে গ্রামে সভা করে বলতেন — 'আপনাদের দেশ ত্যাগ করে চলে যেতে হবে না। যেতে যদি হয় আপনাদের পাঠিয়ে দিয়ে আমি যাব শেষ গাড়িতে।' তাঁর অনুগামীরা এসব কথা হামেশা বলে বেড়াতেন। তাঁর নিজ জেলার নাজিরপুর থানার অন্তর্গত খেজুরতলা গ্রামে খুব নাম ডাকের ঠাকুর রাধাচরণ পাগলের বাড়ীতে সভা করে যোগেনবাবু গলা ফাটিয়ে বলেছেন —'আপনারা কেউ দেশ ছেড়ে যাবেন না। যদি একান্তই যেতে হয় আমি বলব। আপনারা যাবেন আগে। আমি যাব শেষ গাড়ীতে। আর তখন যদি ভারত আমাদের জায়গা না দেয় তবে পৃথিবীর অন্যত্র জায়গা খুঁজে নেবো।' এলাকার সব মানুষ তা জানেন। যোগেনবাবুকে পাক সরকার কোন মূল্য দিক বা না দিক সেদিন তাঁর আশ্বাসে বিরাট সংখ্যক তফসিলী ওখানে থাকার চেষ্টা করেছেন। কারণ ঐ বিপদের সময় কোন তরফ থেকে সামান্য ভরসা পেলেই দেশত্যাগের মত ঝুঁকি কেউই নিতে চাননি। তাছাড়া যোগেনবাবু ওখানে মন্ত্রীর পদে আসীন আছেন — এ অবস্থাটা তাঁদের পৈতৃক ভিটাবাড়ীতে থাকায় উৎসাহিত করেছে।

তফসিলীদের নিজ নিজ ভিটাবাড়ীতে থাকতে বলেই থেমে থাকেননি তিনি। তাঁর মনিব সরকারের সন্তুষ্টির জন্য এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পাকিস্তানকে নিষ্কলঙ্ক বলে প্রমাণের লক্ষ্যে ভারতে আশ্রয় নেওয়া হিন্দুদের পূর্ববঙ্গে নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে যাওয়ার আবেদন জানিয়ে মন্ত্রী যোগেনবাবু ১৯৫০-এর ৭ সেপ্টেম্বর করাচীতে 'মিথ্যা ও অর্ধ সত্য' সম্বলিত একটি মহা অনিষ্টকর বিবৃতি প্রচার করেন। ঐ বিবৃতিতে তিনি বলেন, "যে ভাবে পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে তা প্রশংসনীয়। দেশত্যাগীদের সংখ্যা সম্পর্কে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেওয়া তথ্যে দেখা যায় যে, যে সকল দেশত্যাগীরা ফিরে এসেছেন তাদের একটা বড় অংশই তফসিলী সম্প্রদায়ের যারা প্রধানত কৃষক।" [102]

এর দিনদশেক পরেই (১৯৫০ এর ১৫ বা ১৬ সেপ্টেম্বর) অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে সকলে দেখলেন — তাঁর আশ্বাসে যাঁরা ওখানে থেকে গেছিলেন তাঁদের পাকিস্তানের

জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে রেখে দূরদর্শী (??) রাজনীতিক যোগেনবাবু শেষ গাড়ীতে নয়, বলা যায় প্রথম গাড়ীতেই পালিয়ে আসেন ভারতে। একটু ভুল হল; গাড়ীতে নয়, উনি এসেছিলেন উড়ো জাহাজে চড়ে। আপন সম্প্রদায়ের কাছে বিশ্বাসঘাতকতার কী চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত! মিঃ লিয়াকত আলির কাছে ছেলে (শ্রীজগদীশ চন্দ্র মণ্ডল) অসুস্থ বলে ছুটি চেয়েছিলেন। পরে টেলিগ্রাম করে নিজের অসুস্থতার কথা জানিয়েছিলেন।

একটু আগে নাজিরপুর থানার পাগলবাড়ীতে (মাননীয় রাধা পাগলের বাড়ী) মিঃ মণ্ডলের যে জনসভার কথা বলা হয়েছে সেখানে অনেকের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত রাধা পাগলের জামাতা শ্রীনলিনী রঞ্জন মণ্ডল (পিরোজপুর) এবং ডাঃ হরিপদ সিকদার (বর্তমানে উঃ ২৪ পরগনার নব-বারাকপুরে বসবাসরত)। নলিনীবাবু কয়েক দিন পরেই কোলকাতায় চলে আসেন। শ্রীচিত্তরঞ্জন সুতার মহাশয় তখন কোলকাতায়ই ছিলেন এবং তাঁরা একই হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা কর ন।

হঠাৎ শোনা গেল যোগেনবাবু চলে এসেছেন ভারতে এবং তিনি কোলকাতায় পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশন অফিসের অতিথি নিবাসে উঠেছেন। তিনি নাকি পদত্যাগ করার কথাও ভাবছেন। ('অমৃত বাজার' পত্রিকা, ৩.১০.'৫০, পৃ-৫, কলাম-৮) খবর পেয়ে চিত্তবাবু (সুতার) এবং নলিনীবাবু ৩/৪ জন বন্ধু সহ যোগেনবাবুর সঙ্গে দেখা করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'মাত্র কয়েক দিন আগে আপনি আমাদের স্বজাতিদের নিজ নিজ ভিটা বাড়ীতে থাকতে উৎসাহিত করে বলেছিলেন, ভারতে যদি যেতেই হয় তো সকলকে আগে পাঠিয়ে আপনি আসবেন 'শেষ গাড়ীতে'। এখন তাঁদেরকে ফেলে চলে এলেন কেন? উত্তরে বিমর্ষ যোগেনবাবু বললেন - অন্যান্যদের নিয়ে আসতে গেলে আমার তো আর আসাই হত না। অথচ আজ যোগেন্দ্র অনুগামীদের কেউ কেউ বলতে চাইছেন যে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ফলেই দূরদর্শী (??) যোগেনবাবু 'সত্যের শেষ পরীক্ষা দিয়ে' মন্ত্রিত্ব ছুড়ে ফেলে দিয়ে চলে এসেছেন। **এরা হয়ত বুঝতে পারছেন না যে, এ কথার অর্থ দাঁড়ায় এই, হিন্দুরা যত বড় ব্রাহ্মণ্যবাদী হোক, তাঁদের শাসনে তফসিলী অ-তফসিলী সবাই বসবাস করতে পারেন। অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করতে পারেন। মনের ঝাল মিটিয়ে হিন্দুদের গালাগালও দিতে পারেন। আর মুসলমানরা যত ভালোই হোন না কেন তাঁদের শাসনে অমুসলমানরা, বিশেষত হিন্দুরা বসবাস করতে পারেন না।**

যাক, যোগেনবাবুর দেশত্যাগ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত গবেষক-লেখক ডঃ অনিল বিশ্বাস লিখেছেন — "লক্ষ লক্ষ জনগণের কথা চিন্তা না করে তিনি নিজের প্রাণ রক্ষার কথাই ভেবেছেন। **তাই তিনি 'মহাপ্রাণ' উপাধির অযোগ্য। বরং 'অল্পপ্রাণ'-ই সঠিক নামকরণ। ন্যায়ের বিচারে এই মূল্যায়ন।** আর অল্পপ্রাণ নামকরণ যে সঠিক তার পরিচিতি বহন কচ্ছে যোগেন্দ্র নাথের এক চিঠি যা তিনি লিখেছিলেন ডঃ আম্বেদকরকে ১৯৪৬ সনের ২৬ জুলাই। এতে তিনি মুকুন্দবিহারীকে 'devil' বলে উল্লেখ করেছেন।" (ডঃ বিশ্বাসের 'তর্ক, বিতর্ক ও কুতর্ক', ২০০০, পৃ- ৮৬)

আজকের যোগেন্দ্র অনুগামীদের মধ্যে অনেকেই কু-তর্কে সিদ্ধহস্ত। তাদের মতে যোগেনবাবুর আহ্বানে কেউ যদি ওখানে থেকে গিয়েই থাকেন, যোগেনবাবু চলে আসার পর কেন তাঁরা চলে এলেন না? আমাদের প্রশ্ন — যাদের তিনি ওখানে মাটি কামড়ে থাকতে বললেন, তাদেরকে নিয়ে আসার জন্য তিনি কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, বিশেষত তিনি যখন বুঝতেই পারলেন যে, (ইসলাম) "এমন একটি দর্শন যা' মানবতা এবং সকল প্রকার সাম্য ও শুভ চিন্তার পক্ষে মহা বিপদ স্বরূপ।" ("a doctrine fraught with so great danger to humanity and subversive of all principles of equality and good sense.", পদত্যাগ পত্রের ৩৪ নং অনুচ্ছেদ)

৮০০০ শব্দ-সম্বলিত পদত্যাগ পত্র

"পাকিস্তান হিন্দুদের বসবাসের স্থান নয় এবং সেখানে তাদের ভবিষ্যৎ ধর্মান্তরগ্রহণ ও অবলুপ্তির করাল ছায়াপাতে সমাচ্ছন্ন।" — যোগেন্দ্রনাথ। [103]

১৯৪৩ থেকে ১৯৫০- প্রায় ৮ বছর ধরে মূলত মুসলিম লীগের সেবা করে 'দলিত-মুসলিম ঐক্যের' পথ প্রদর্শক, অনুরাগীদের কল্পিত 'বীর সেনানী' তাঁর আজন্ম শত্রু এই ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতে এসে চোখের জল ফেলতে ফেলতে পদত্যাগ করলেন পাকিস্তান মন্ত্রী সভা থেকে। ৯ অক্টোবর কোলকাতা ও দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'স্টেট্‌সম্যান', 'অমৃত বাজার' এবং 'হিন্দুস্থান স্টান্‌ডার্ড' সহ প্রধান প্রধান সব খবরের কাগজে ঐ পদত্যাগ পত্রের কপি হুবহু ছাপা হয়েছে। আগ্রহী পাঠকগণ কোলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখতে পারেন।

যোগেনবাবু অবাক বিস্ময়ে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করেছিলেন — 'ইসলামের নামে কী আসিতেছে পাকিস্তানে?" ["What was coming to Pakistan in the name of Islam?" R.L Cl. 22] আজ তফসিলীদের একটি অংশ গান্ধীজীকে 'দুরাত্মা' বলে গালাগাল দেন। কিন্তু হায়! সেদিন যদি পাকিস্তানে গান্ধীজীর মত অন্তত এক জন দুরাত্মাও (!!) খুঁজে পেতেন যোগেনবাবু তবে আরও কিছুদিন পবিত্র ভূমির স্বর্ণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকতে পারতেন।

হাজার হাজার হিন্দুর তাজা রক্ত এবং তাঁদের মা-বোন-স্ত্রী-কন্যার লুণ্ঠিত ইজ্জতের উপর দাঁড়িয়ে ১৯৪৩ সন থেকে প্রায় আট বছর মুসলিম লীগের দাসত্বরূপ সাধের মন্ত্রিত্ব করার পর (আজকের ভাষায়) দলিত-মুসলিম ঐক্যের প্রবক্তা যোগেনবাবু বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে পাকিস্তান কেবল মুসলমানদেরই, হিন্দুদের নয়।

পদত্যাগ পত্রে যোগেনবাবু বলেছেন, পাকিস্তান হিন্দুদের জন্য একটা অভিশপ্ত স্থান এবং হিন্দুদের থাকার সম্পূর্ণ অযোগ্য। স্বাধীন পাকিস্তানে হিন্দুদের জন্য মুসলিম লীগের পরিকল্পিত নীতি সম্পর্কে যোগেনবাবু বলেছেন —

"তাঁরা হিন্দু। এ ছাড়া তাঁদের অন্য কোন অপরাধ নেই। মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ বারবার ঘোষণা করছে যে, পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র এবং মুসলিম রাষ্ট্রই থাকবে। ইসলামকে ইহ জগতের যাবতীয় দুঃখ দৈন্য ও হতাশা মোচনের একমাত্র মহৌষধি হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে। আজ সমগ্র বিশ্বে পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের মধ্যে এক দ্বান্দ্বিক বিতর্ক চলছে। সেখানে

আপনারা ইসলামিক গণতন্ত্র, ইসলামিক সাম্য এবং ইসলামিক ভ্রাতৃত্বের তত্ত্ব পেশ করছেন। মুসলিম শরিয়তের এই জবরদস্ত ব্যবস্থাপনায় শাসন ক্ষমতা থাকবে কেবলমাত্র মুসলমানদের হাতে। হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুরা সেখানে জিম্মি হয়ে বসবাস করতে বাধ্য হবেন। এরা বিশেষ মূল্যের বিনিময় সুরক্ষা পেতে পারেন। মিঃ প্রাইম মিনিষ্টার, আপনিই ভাল জানেন কী সেই মূল্য। বিরাট সংখ্যক বর্ণ হিন্দু এবং রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন তফসিলীরা পূর্ববঙ্গ ছেড়ে চলে এসেছেন। আমি এই জন্য ভীত, যে-সব হিন্দু এই অভিশপ্ত প্রদেশে থেকে যাবেন, তাঁরা ক্রমে ক্রমে পরিকল্পিত উপায়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য হবেন অথবা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন।" [104]

যোগেনবাবু তাঁর পদত্যাগ পত্রে আরও লিখেছেন, 'বহু হিন্দু নারী অপহৃতা ও ধর্ষিতা হয়েছেন' (অনুচ্ছেদ-৩)। 'পাকিস্তানে তফসিলী জাতির মানুষেরা কোন ক্ষেত্রে কোন ব্যাপারেই সুবিচার পায়নি' (অনু-১০)। 'হিন্দু মেয়েদের মিলিটারী ক্যাম্পে পাঠাতে বাধ্য করল' (অনু-১৩)। 'প্রকৃত পক্ষে পাকিস্তানে হিন্দুদের জন্য আইনের শাসন ন্যায় বিচার ও নিরপেক্ষতা মোটেই নেই' (অনু-৩২); 'পাকিস্তান হিন্দুর বসবাসের স্থান নয়' (অনু ৩৪)। 'অনিচ্ছা সত্ত্বেও অসত্য ও অর্ধসত্যের উপর ভিত্তি করে আমাকে বিবৃতি দিতে হয়েছে' (অনু-৩৪) 'হিন্দুদের নানা অভিযোগের অর্ধেকও থানার দারোগারা লিপিবদ্ধ করে না' (অনু-৩২); 'মুসলিম লীগের নেতারা বারংবার বিবৃতি দিয়ে জানাচ্ছেন পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছে এবং মুসলিম রাষ্ট্ররূপেই সে বেড়ে উঠবে' (অনু - ৩৩) ; 'শিক্ষা অধিকর্তা এক সার্কুলার জারি করে নির্দেশ দিয়েছেন যে, প্রতিদিন বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন সুরু হওয়ার পূর্বে সকল সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাগণকে কোরান পাঠের অনুষ্ঠানে বাধ্যতামূলকভাবে অংশ গ্রহণ করতে হবে' (অনু-৩১) এবং 'পূর্ববঙ্গ সরকার ও মুসলিম লীগ উভয়ই এই চুক্তিকে (নেহেরু লিয়াকত চুক্তি) একটা ছেঁড়া কাগজের বেশি মর্যাদা দেয় না' (অনু-২৯)

আজকের তফসিলী সহ সব হিন্দুদের প্রশ্ন — সেদিন কোন স্বার্থে যোগেনবাবু মুসলিম লীগকে বাংলার গদিতে আসীন করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন? কি ধরনের 'দূরদর্শিতা' নিয়ে ইসলাম-ভিত্তিক পাকিস্তান সৃষ্টির অংশীদার হয়েছিলেন? আমাদের জানা মতে পৃথিবীতে যোগেনবাবুই একমাত্র হিন্দু যিনি পাকিস্তান শব্দের অর্থ করেছিলেন 'পবিত্র স্থান'।

১৯৫০-এ হিন্দু গণহত্যার পর থেকে (কার্যত ১৯৪৬-এর পর থেকেই) ঐ অভিশপ্ত প্রদেশে হাজার হাজার হিন্দু (তফসিলী সহ) মুসলমান হয়ে গেছেন। লক্ষ লক্ষ হিন্দু ভারতে চলে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে বিরাট একটি অংশ এখানে নাগরিকত্বহীন অবস্থায় মানবেতর জীবন যাপন করছেন। প্রায় দেড় কোটি হিন্দু এখনও ওখানে রয়ে গেছেন, যাঁরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পথে। গত জুন মাসের (২০০৩) প্রথম সপ্তাহেও একদল মৌলবাদী নরপশু বাংলাদেশে মোড়েলগঞ্জের বহরবুনিয়া গ্রামে স্বামীকে বেঁধে রেখে একসন্তানের 'যুবতী-মা'

সবিতা হালদারকেধর্ষণ করতে করতে মেরে ফেলেছে। গত ৭ ও ৮ জুন ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা 'জনকণ্ঠে' এ খবর প্রকাশিত হয়েছে। [website: www.janakantha.net] এ সব জেনে শুনেও যোগেন্দ্র অনুগামীদের একটা বড় অংশ পদত্যাগ-পূর্ব যোগেন্দ্রনাথের বন্দনায় বিভোর হয়ে আছেন। বাংলাদেশে বসবাসরত ঐ হতভাগ্যদের বাঁচাবার জন্য কোন আন্দোলনের মধ্যে তাঁরা নেই।

বাবাসাহেব লিখেছেন, 'ইসলামে বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্থান নেই। আছে ইসলামিক ভ্রাতৃত্ব।' অর্থাৎ একজন মুসলমান একজন মুসলমানকেই ভাই বা বন্ধু বলে মনে করবে। ইসলামের গণ্ডীর বাইরের লোকদের জন্য আছে কেবল ঘৃণা ও শত্রুতা। [105] বাবাসাহেব কোরান পড়েই এ কথা লিখেছেন। কারণ, কোরানের ৪/১৪৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "হে ঈমানদারগণ (অর্থাৎ মুসলমানগণ)! ঈমানদার লোকদিগকে ত্যাগ করিয়া কাফের দিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। .... ।" কোরানের ৩/১১০ নং আয়াতে মুসলমানদিগকে সর্বোৎকৃষ্ট জনগোষ্ঠী হিসাবে ঘোষণা করে ৮/৫৫ নং আয়াতে অমুসলমানদের জন্তু-প্রাণীদের মধ্যে ঘৃণিত জীব [worst of the beasts] বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কোরানের ২/৯৮ নং আয়াতের দোহাই দিয়ে ("আল্লাহ্ স্বয়ং সেই কাফেরদেরও শত্রু।") মুসলমানরা সমগ্র অমুসলমান সমাজকে শত্রু বলে ঘোষণা করেছে।

মৌলানা মোহাম্মদ আলি ১৯২৩-এ কংগ্রেস সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি ১৯২৫ খৃঃ লখ্নৌ-এর এক জনসভায় বলেছিলেন, "আমার ধর্মবিশ্বাস ও রীতি অনুযায়ী একজন লম্পট ও জঘণ্য চরিত্রের মুসলমানও আমার কাছে গান্ধীজীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।"[106]

ভারতের তৎকালীন ভাইসরয়-পরিষদের প্রধান [Chief of the Viceroy's Staff] লর্ড ইসমে '৪৭-এর ১১ এপ্রিল ঐ পরিষদের সভায় রিপোর্ট করতে গিয়ে বলেছিলেন, "মিঃ জিন্নাহ্ সাধারণ ভাবে সমগ্র হিন্দু জাতিকে মানবেতর জীব বলে মনে করতেন, যাদের সঙ্গে মুসলমানদের বসবাস করা সম্ভব নয়।" [107]

মিঃ জিন্নাহ্র চোখে হিন্দু হিসাবে যোগেনবাবুও যে মানবেতর 'জীব' ছিলেন ক্ষমতার লোভে (হয়ত বা গাড়ী-বাড়ীর লোভেও) অন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে সেদিন তা দেখতে যাননি। কিন্তু আজকের যোগেন্দ্র অনুগামীদের কাছে প্রশ্ন — 'কি কারণে তাঁরা পদত্যাগ-পূর্ব যোগেনবাবুর ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করতে যাচ্ছেন?'

হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক আলোচনায় বাবাসাহেব লিখেছেন, "হিন্দু মুসলমান ঠিক যেন দুই দল সশস্ত্র বাহিনী যারা পরস্পর যুদ্ধরত।" [108] "যে দেশে ইসলামের শাসন আছে, সেটাই মুসলমানদের দেশ।" [109] তিনি আরও বলেছেন, "হিন্দু ও মুসলমানের ঈশ্বরতত্ত্ব আলাদা; তাই এমন কোন কিছু নেই যা তাদেরকেএক জায়গায় নিয়ে আসবে।" [110] ডঃ আম্বেদকর লিখেছেন — "এজন্য ৩০ বছরের হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রচেষ্টা সফল হয়নি।" [111]

এই ধরনের অসাফল্য বা ব্যর্থতার সঠিক কারণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি কালান্তর গ্রন্থের 'হিন্দু-মুসলমান' শীর্ষক নিবন্ধে আক্ষেপ করে লিখেছেন —

"ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু মুসলমানের মত দুই জাত একত্র হয়েছে — ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল; আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের যেদিকে দ্বার খোলা, অন্য পক্ষের সেদিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কী করে মিলবে? নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" (কালান্তর, পৃ- ৩১৩)

অমুসলমানদের সঙ্গে সংঘর্ষ বা মতানৈক্য দেখা দিলে এক মুসলমান কখনো অন্য মুসলমানের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় না। ডঃ আম্বেদকর প্রশ্ন রেখেছেন - অখণ্ড ভারত যদি বিদেশী মুসলমান আক্রমণকারী দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীর মুসলমান সৈন্যরা (যারা বাহিনীর অন্ততঃ ৫০ ভাগ) কি ঐ মুসলমান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে ভারত রক্ষা করবে? এই অপরিহার্য বিপর্যয় থেকে মুক্তি পেতে বাবাসাহেবের মতে এক মাত্র পথ পাকিস্তান প্রস্তাব এগিয়ে যেতে দেওয়া।

অন্য সব বিষয় বাদ দিয়েও প্রতিরক্ষা বাহিনীর জটিলতা (Defence of India) এবং মুসলমানদের আবেগ তাড়িত মানসিকতা (sentiment) বিবেচনা করে ডঃ আম্বেদকর সংখ্যালঘু বিনিময় সহ পাকিস্তান প্রস্তাব কার্যকরী করাই দুর্গতি (tragedy) এড়ানোর সুনিশ্চিত পথ বলে মনে করেছেন। তুরষ্ক, গ্রীস ও বুলগেরিয়ার সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের উদাহরণ টেনে বলেন, "সংখ্যালঘু বিনিময় করাই হল নিঃসন্দেহে সাম্প্রদায়িক শান্তি রক্ষার একমাত্র স্থায়ী সমাধান। যদি তাই হয়, অনিরাপদ প্রমাণিত রক্ষা কবচ নিয়া হিন্দু মুসলমান কেন দর কষাকষির কাজে নিযুক্ত থাকবে?"[112]

পদত্যাগ পত্রে যোগেনবাবু যে সব ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, তার সব কিছুই তিনি জানতেন। কিন্তু, কখনো তা জনসমক্ষে তুলে ধরেননি। কারণ মুসলিম লীগ ও লীগের সরকার অসন্তুষ্ট হলে তার মন্ত্রিত্ব চলে যেতে পারে। কাজেই দেখা যায় যোগেনবাবুর সকল চিন্তা, কাজ ও সিদ্ধান্ত ছিল ব্যক্তি-সুবিধা কেন্দ্রিক, দেশের স্বার্থ বা তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের স্বার্থ কেন্দ্রিকও নয়। তাঁকে বিশ্বাস করে তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের লোকেরা চূড়ান্তভাবে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত। তাঁর সুবিধাবাদী; অবিশ্বস্ত, ক্ষমতা লোভী ও তোষণমূলক রাজনীতির জন্য পূর্ববঙ্গে বা বর্তমান বাংলাদেশে তফসিলী, অ-তফসিলী সহ সব হিন্দুদের জান-মান ইজ্জৎ বিপন্ন। ওখানে আর কেউ থাকতে পারছেন না। আবার তফসিলীদের প্রতিনিধি হিসেবে যোগেনবাবু লীগের সঙ্গে পাকিস্তান আদায়ের সংগ্রামে অংশীদার হওয়ায় তাঁরা ভারতে এসেও ভারতীয় স্বাধীনতার শরিক বলে দাঁড়াতে পারছেন না। ওখানে থাকতে পারছেন না মৌলবাদীদের পাশবিক অত্যাচারে। আবার এদেশে তাঁরা অবাঞ্ছিত। তাঁরা স্থান পাচ্ছেন না কোথাও। উপমহাদেশে এঁরা এখন নিষ্ঠুরভাবে অসহায় এবং অবজ্ঞার পাত্র। ভারতে এসে ঠাঁই নিতে হয় রাস্তার পাশে বা রেলের ধারে। বলতে গেলে পৃথিবীর মধ্যে এঁরাই এখন

বিপন্নতম মানুষ।

গভীর পরিতাপের বিষয় আজ যোগেন্দ্র অনুগামীদের একটি বড় অংশ এই অসহায় লোকদের কথা চিন্তা করার সময় পাচ্ছেন না। তাঁরা দলিত-মুসলিম ঐক্য, মূল নিবাসীদের নিয়ে কল্পিত আর্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কিংবা দলিত সাহিত্য রচনায় (ভাষান্তরে সাহিত্যের দলিতকরণের কাজে) নিমগ্ন আছেন। এক যোগেন্দ্র অনুগামী দলিত নেতা একটি রাজনৈতিক দল করে দাবি করেছেন যে, তাঁর দলের শতকরা ৮০ জন মুসলমান। তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা চান না যে যোগেনবাবুর পদত্যাগ পত্র প্রচারিত হোক। এমনও শোনা যাচ্ছে যে, ঐ পত্রটিকে জাল প্রমাণের জন্য আর একটি পদত্যাগ পত্র তৈরী করার কাজ সুরু হয়েছে। যে দেশে কোটি কোটি টাকার জাল নোট আসে প্রতিবেশী একটি দেশ থেকে, সে দেশে একটি দু'নম্বরী কাগজ তৈরী করতে কতক্ষণ!

যোগেনবাবুর মুসলিম লীগের সহযোগী সদস্য হওয়া বা পাকিস্তান সমর্থন করার ব্যাপারে তিনি তার একান্ত আপনজন ছাড়া তফসিলীদের আর কারুর সঙ্গে আলোচনা করেছেন বলে মনে হয় না। কিছু পেটোয়া লোক ছাড়া আর কেউ সহমতও পোষণ করেনি তাঁর সঙ্গে। '৪৬-এর সাধারণ নির্বাচনে তিনি ভোট নিয়েছিলেন সিডিউল্ড কাষ্ট ফেডারেশনের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে। আর বাংলার ঐ ফেডারেশনের সর্বময় বিধাতা ছিলেন তিনি নিজেই।

ভেবে দেখা দরকার যে, যোগেনবাবু কেবল মন্ত্রিত্ব ও গাড়ী বাড়ী পাওয়ার স্বার্থেই পাকিস্তান সমর্থন করেছেন কি না। প্রশ্ন উঠেছে — একজন সাধারণ হিন্দু 'মুসলমানদের আবাসভূমি পাকিস্তান' সমর্থন করবে কিসের স্বার্থে? অবশ্য যোগেনবাবু নাকি মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবিকে একটা দর কষাকষির কৌশল ভিন্ন আর কিছুই মনে করতেন না। [R.L. Clause-1] এর সহজ অর্থ, তাঁর মতে ঐ দাবি পূরণ হওয়ার নয়। অর্থাৎ পাকিস্তান হবে বুঝলেই ঐ দাবির সঙ্গে তিনিও থাকতেন না। আসলে পদত্যাগ পত্রে উল্লিখিত ঐ বক্তব্য একটি ধাপ্পা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, বাবাসাহেবের 'পাকিস্তান অর দি পার্টিশন অব ইণ্ডিয়া' পড়লে সহজেই বোঝা যেত যে, লীগ পাকিস্তান আদায় করে নেবেই। না বুঝলে বাবাসাহেবের সঙ্গে আলাপ করা যেত। তারপর পাকিস্তান তো হয়েই গেল। তখন বাড়ী গাড়ীর মত ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া আর কোন মহান উদ্দেশ্য নিয়ে উনি পাকিস্তানে থাকতে গেলেন?

প্রসঙ্গত আমরা ১৯৭১-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করতে পারি। ষাটের দশকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ছিল অনেক অনেক বেশি প্রগতিশীল। লিখিতভাবে তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন যে, ঐ দল ধর্মনিরপেক্ষতা এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে। ১৯৭১-এ বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর রাজনৈতিক বন্ধু শ্রীচিত্তরঞ্জন সুতার মহাশয়ের যৌথ নেতৃত্বে অসাম্প্রদায়িক বাঙালী জাতীয়তাবাদের আদর্শে 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে অর্জিত হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। সেদিন ঐ রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রামে বেশির ভাগ রক্ত ঝরেছে হিন্দুর। প্রায় সব হিন্দুর সম্পদ হয়েছে লুট। নির্বিচারে হিন্দু

রমণীদের ইজ্জৎ ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। এ সব কথা স্মরণে রেখেই বঙ্গবন্ধু দেশ চালাতে থাকেন। রাজনীতিতে তিনি ধর্মকে টেনে আনার পক্ষে ছিলেন না। তাঁর দেওয়া সংবিধানে দেশের সার্বভৌমত্ব ছিল জনগণের হাতে। তাছাড়া ধর্মের নামে রাজনৈতিক দল গঠন করা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু লীগ-জামাতের মত সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এই চিন্তা-চেতনার বিরোধী। তাই ১৯৭৫-এর ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে খুন করে তারা বাংলাদেশের ক্ষমতা দখল করে। এর পরপরই হিন্দুদের সার্বিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটেছে। হিন্দুরা আবার ভারতে চলে আসতে সুরু করেন। ১৯৯৬ থেকে শেখ মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনার পাঁচ বছরের শাসনকালে হিন্দু-বৌদ্ধদের বসবাসের একটা পরিবেশ (Living Condition) তৈরী হয়ে ছিল। বাকি সময়ের ইতিহাস হিন্দুর সম্পদ লুট, তাঁদের উপর চাঁদার জুলুম এবং নারী ধর্ষণের ইতিহাস।

২০০১-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয়ের ফলে হিন্দুদের দুর্গতি চরমে পৌঁছায়। ভাষায় প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব ধরনের অত্যাচার চালায় বাংলাদেশ ন্যাশনালিষ্ট পার্টি ও তাদের দোসর জামাত, নেজাম ও এরশাদের জাতীয় পার্টির গুণ্ডারা। আগরতলা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকার একটি খবরে জানা গেছে একজন মুসলমান পিতা তার পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে একত্রে ধর্ষণ করতে গিয়েছে হিন্দু পল্লীতে। প্রশাসন কিন্তু এই পাশবিক কাজে বাধা দেয়নি; বরং মদত দিয়েছে। এসব পাশবিক কাজের একটাই লক্ষ্য — সংখ্যালঘু হিন্দু-বৌদ্ধদের ভিটা বাড়ী ছেড়ে ভারতে চলে আসতে বাধ্য করা। এর বিকল্প পথ হল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা। এর নাম মুসলিম দর্শন।

যোগেনবাবুর মন্ত্রিত্বকালেও এই দর্শনের সম্যক পরিচয় পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সর্বনাশের শেষ না দেখে তিনি দেশ ছাড়েননি। তিনি যখন দেখলেন লীগের গুণ্ডারা হিন্দু গৃহবধূ ও মেয়েদের ধরে ধরে মিলিটারি ক্যাম্পে পাঠাচ্ছে, কেবল তখনই তিনি নিদ্রা থেকে উঠলেন। তাঁর এই ভুল ক্ষমার যোগ্য কি না তা বিচার করবে আগামী দিনের ইতিহাস। তবে তিনি ঐ চরম ভুল স্বীকার করে গেছেন। এই স্বীকারোক্তি তথা বর্তমান পাকিস্তান ও বাংলাদেশের তালিবান ভিত্তিক মুসলিম রাজনীতি থেকে ভারতের আজকের দলিতরা সম্ভবতঃ কোন শিক্ষাই গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছেন না। পদত্যাগপূর্ব ভ্রান্তদর্শী যোগেনবাবুকে আজ 'ক্রান্তিদর্শী' (?) হিসাবে বর্ণনা করা থেকে সুরু করে গৌতম বুদ্ধ, কবির, লালন ফকিরের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। একজন দলিত নাট্যকার (৫৯ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখিত) তাঁকে চল্লিশের দশকের একমাত্র মহান নেতা বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে ঐ 'মহাপ্রাণ' নাকি 'মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন হিন্দু মুসলমান একই মায়ের দু'টি সন্তান'। এই 'মহাপ্রাণ' যে মোল্লাদের লাথি ঝাঁটা খেতে খেতে প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে এসেছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদী এই ভারতে তা ঐ নাট্যকারের চোখে পড়েনি। যোগেনবাবুর গুণগান গাইতে গিয়ে ঐ নাটুকে ভদ্রলোক তাঁর লেখা অন্য একটি নাটকে সেদিনের দাঙ্গাবাজ সরোয়ার্দি সাহেবের মুখে এই ডায়লগ বসিয়ে দিয়েছেন — "ডঃ আম্বেদকরের অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেই বলছি,

রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে আপনিই আমার প্রণম্য।'' ধন্যবাদ নাট্যকারকে। সেদিন সরোয়ার্দি সাহেবরা ড. আম্বেদকরের তুলনায় যোগেনবাবুকেই যে 'প্রণম্য' মনে করতেন, এ কথা তুলে ধরার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। দলিত-মুসলিম ঐক্য গড়ার আর এক কারিগর যোগেনবাবুকে বাবাসাহেবের সমকক্ষ করতে গিয়ে বলছেন 'বাবাসাহেব যেমন ভারতের সংবিধান লিখেছেন, যোগেনবাবুও তেমনি পাকিস্তানের সংবিধান লিখেছেন'। জানি না সাধারণ মানুষকে 'হাতি' দেখাবার অধিকার কে দিয়েছে ঐ 'পণ্ডিত' প্রবরকে?

গত বছর অক্টোবর (২০০২) মাসে অবিভক্ত ভারতের বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট নেত্রী ইলা মিত্র পরলোক গমন করেছেন। হিন্দু হওয়ার অপরাধে, কমিউনিষ্ট হওয়ার অপরাধে এবং রাজশাহী জেলার নাচোলে কৃষক বিদ্রোহে (১৯৪৯-৫০) অংশ গ্রহণ করার অপরাধে শ্রীমতি মিত্রকে সূঁচালো পেরেকের উপর দাঁড় করিয়ে রাখা থেকে সুরু করে তাঁর গুপ্ত অঙ্গে গরম ডিম প্রবেশ করানো সহ হেন অত্যাচার নেই যা মোল্লাবাদী সরকারের পুলিশ ও মিলিটারীরা করেনি। যোগেনবাবু কিন্তু সেদিন পুরোদস্তুর মন্ত্রী; আইন মন্ত্রী। কিন্তু ইলা মিত্রের পক্ষে উনি সেদিন একটি কথাও বলেছেন বলে শোনা যায়নি। আজ যোগেন্দ্র ভক্তরা এ সব দেখবেন না, শুনবেন না এবং যথারীতি কিছু বলবেনও না। ১৯৪৬-এর সাধারণ নির্বাচনে যোগেনবাবুর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন পিরোজপুরের প্রয়াত অগ্নিকুমার মণ্ডল। একজন নিবেদিত প্রাণ সমাজ সংস্কারক হিসাবেই ছিল তাঁর প্রথম পরিচিতি। ঐ সময় আমাদের সমাজে বিধবা বিয়ে প্রচলনের জন্য তিনি সম্ভব অসম্ভব সব কিছু করেছেন। তাঁর দ্বিতীয় পরিচয় ছিল রাজনীতির জগতে তিনি ছিলেন হিন্দু মহাসভার সদস্য। '৪৬-এর নির্বাচনে তিনি ঐ দল থেকেই যোগেনবাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিলেন এবং পরাজিত হয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর পরই মুসলিম লীগ সরকার অগ্নিবাবুকে জেলে পুরে দেয়। দীর্ঘ ৭ মাস পর্যন্ত সরকার তাঁর কোন খবর দেয়নি তাঁর পরিবার পরিজনকে। যোগেনবাবুই তখন পাকিস্তানের আইন মন্ত্রী ছিলেন। '৫০-এ যোগেনবাবু ভারতে চলে আসার পর অগ্নিবাবুর 'নিরুদ্দেশ বন্দীদশা' সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে যোগেনবাবু বলেন, অনেক চেষ্টা করেও তিনি অগ্নিবাবুর কোন খবর জানতে পাননি। অগ্নিবাবুর ছেলে শ্রীনিত্যরঞ্জন মণ্ডল মহাশয়ের (ফোন-২৩৪৪ ২৭২৫; কোলকাতা কোড নং ০৩৩) কাছ থেকে এই তথ্যটি পেয়ে একজন যোগেন্দ্র ভক্তের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করেছিলাম। উত্তরে তিনি বললেন, প্রথমত এ তথ্য অবিশ্বাস্য; দ্বিতীয়ত যে নমঃশূদ্র 'হিন্দু মহাসভা' করে তার উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছিল সেদিন। আমরা তখন বললাম, যোগেন্দবাবু তো হিন্দু মহাসভার বিপরীত মেরু লীগের পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁকে কেন পালিয়ে আসতে হল এই ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতে? উত্তরে ঐ ভক্ত বললেন, বলুন তো কি কারণে আপনারা যোগেন্দ্র বিরোধিতা সুরু করেছেন?

যাদের কাছে মিঃ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল দলিত-মুসলিম ঐক্যের পথ প্রদর্শক, তাদের হিসাবে মুসলমানদের এবং ও-বি-সি-দের নিয়ে তারা দেশের ৮৫ ভাগ মানুষ। ক্ষমতা দখল করবে এই ৮৫ ভাগ মানুষ! এটা যদি কোন দিন সম্ভবও হয়, দলিতরা কি সে ক্ষমতায় টিকে

থাকতে পারবে? প্যান-ইসলামের ধাক্কায় উল্টে যাবে না তো 'সাধের গনেশ'? ক্ষমতা দখলের এ সব হিসেব-নিকেশ যা হচ্ছে তা সবই প্যান-ইসলামের পরিকল্পনায় হচ্ছে বলে অনেকের অনুমান। উত্তর প্রদেশে এর চাষ-বাসও সুরু হয়েছে। দেশ-ভাগের অভিশাপ উত্তর প্রদেশের দলিতদের আদৌ গায়ে লাগেনি বলে এটা সম্ভব হয়েছে। 'উদ্বাস্তু' বলতে কী বোঝায় তা তাদের পক্ষে না জানা অস্বাভাবিকও নয়। কিন্তু অবাক লাগে তখন যখন দেখি পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশ থেকে নির্যাতিত হয়ে ভারতে আসা কিছু কিছু ভুক্তভোগী উদ্বাস্তুও ঐ ধ্বংসাত্মক কাজের পাঁয়তাড়ার সঙ্গে পা মেলায়।

যাই হোক, সেকালের উদ্বাস্তুদের অনেকেই বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসেও যোগেনবাবুর কাজ তাঁর স্বজাতিদের সর্বনাশ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে এমনিতেই জনবসতি ঘন, তার উপর সরকারী ও বেসরকারী ভাবে ১৯ লক্ষ উদ্বাস্তু আংশিক পুনর্বাসন নেওয়ায় সরকারী মতে ১৯৫৬-৫৭-তেই এখানে 'সেচুরেশন পয়েন্ট' এসে যায়। ফলে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। উদ্বাস্তুদের ৮০/৮৫ ভাগ কৃষক বলে এদের উপযুক্ত পরিমাণ জমি (পরিবার পিছু ৩০/৩৫ বিঘা) দিয়ে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য তৎকালীন কংগ্রেস সরকার দণ্ডকারণ্যে (৮০ হাজার বর্গ মাইল) ও আন্দামানে দু'টো পুনর্বাসন মহাপ্রকল্প গ্রহণ করে। পূর্ববঙ্গের সকল সংখ্যালঘুর কথা মাথায় রেখেই এত বড় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু উদ্বাস্তুরা যাতে ঐ সব জায়গায় পুনর্বাসন নিয়ে চলে না যায় তার জন্য যোগেনবাবু ক্যাম্পে ক্যাম্পে সভা সমিতি করা সুরু করেন। কমিউনিষ্টদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তিনি বলতেন, বাঙ্গালীকে বাংলায় পুনর্বাসন দিতে হবে। এর উদ্দেশ্য ঐ উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে রাখতে পারলে তারা তাঁর লক্ষ্মী ভোটার হবেন। সেক্ষেত্রে কিছুটা হলেও পায়ের তলায় মাটি পাবেন হয়ত। এভাবে ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তাঁর পা রাখার একটা জায়গা তৈরী হয়ে যেতে পারে। কিন্তু কার্যত ওসব হয়নি। নির্বাচনে একাধিকবার প্রার্থী হয়েও আদায় করতে পারেননি গণসমর্থন।

যোগেনবাবু ও কমিউনিষ্ট নেতাদের মুখে ভয়ভীতির কথা শুনে উদ্বাস্তুরা দন্ডকারণ্য বা আন্দামানে যাননি বললেই চলে। অথচ বিশেজ্ঞদের দৃষ্টিতে ঐ দু'টি জায়গা এখন কৃষকের স্বর্গরাজ্য। সেদিন ওখানে সবাই পুনর্বাসন নিলে কৃষকদের আলাদা দু'টো বাঙ্গালী অধ্যুষিত রাজ্য বা কেন্দ্র শাসিত এলাকা গড়ে উঠতে পারতো যেখানে সরকার চলতো উদ্বাস্তুদের নেতৃত্বে। পশ্চিমবঙ্গ আইন সভায় খুব জোরের সঙ্গে এ কথা বলেছেন ফরিদপুরের (ওড়াকান্দি) গুরুচাঁদ ঠাকুরের পৌত্র তৎকালীন বিধায়ক শ্রীপ্রমথ রঞ্জন ঠাকুর।

অকমিউনিষ্ট দলিতদের সঙ্গে কমিউনিষ্ট দলিতদের একটি অংশও আজ মনে করেন যোগেনবাবু আমাদের আপন জন। তাঁকে বিশেষ বিশেষ বিশেষণে আখ্যায়িত করলে দোষের কি আছে? প্রচারই তো মানুষকে বড় করে তোলে। আমাদের ধারণা, তা ঠিক নয়। গলার জোরে তা কিছুদিন চালু রাখতে পারলেও সত্যসন্ধানী নির্মম ইতিহাস তা কখনই স্বীকার করে

নেবে না। মানুষ বেঁচে থাকে ইতিহাসের বিচারে। সঠিক তথ্য এক দিন বের হয়ে আসবেই। সেদিন মুখ লুকোবার জায়গা থাকবে কি?

যোগেনবাবু একজন হিন্দু হয়ে মুসলিম লীগের 'সহযোগী সদস্য' হওয়া এবং মুসলমানদের আবাস ভূমি পাকিস্তানের দাবি সমর্থন করাকে মুসলমানরাও যে সম্মানের চোখে দেখেননি তার একটি ঘটনা এখানে তুলে ধরছি। ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করার জন্য ১৯৮৮-এর ৬ জুন সংসদে বিল পেশ করার পর বাংলাদেশের যশোর জেলার মাগুরার এম. পি. শ্রীনিতাই পদ চৌধুরী, বলধা গার্ডেনের জমিদার (হিন্দু) ও আর একজন হিন্দু ব্যারিষ্টার ঐ ঘোষণাকে সমর্থন করেন। তখন ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় (মুসলমান পরিচালিত ও সম্পাদিত) বড় বড় ক্যাপশনে খবর পরিবেশিত হয় —

'যোগেন মণ্ডলেরা যুগে যুগে জন্মায়'।

* * *

পদত্যাগের প্রতিক্রিয়া

'যোগেনবাবু চোরের মত অন্য দেশে পালাইয়াছেন।' 'তিনি ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যতদূর সম্ভব স্বার্থহানির কাজ করিয়াছেন।'

— লিয়াকত আলি খাঁন। (অমৃত বাজার পত্রিকা, ২৫.১০.'৫০.)

'পাকিস্তানের পত্র পত্রিকায় যোগেনবাবু তৃতীয় প্রজন্মের ক্রীতদাস হিসেবে নিন্দিত হয়েছেন।' — ধনঞ্জয় কীর। [113]

যোগেনবাবুর পদত্যাগের পর পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানানো হয়। পদত্যাগের কয়েকদিন পরেই প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলি খাঁন পাকিস্তান পার্লামেন্টে একটি দীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে বলেন, মিঃ মণ্ডল চোরের মত অন্য দেশে পালিয়ে গিয়ে তাঁর মাতৃভূমিকে অস্বীকার করেছেন, গালাগাল দিয়েছেন এবং নিন্দা করেছেন। (ম. যোগেন্দ্রনাথ-২, পৃ-৩০৬) [" ..... he sneaks away to another country to disown, abuse and malign his motherland."] এ ছাড়াও পাকিস্তান ও ভারতের প্রায় প্রতিটি খবরের কাগজে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া বা মতামত প্রকাশিত হয়। দুঃখজনক হলেও কয়েকটি মতামত উল্লেখ না করলে ইতিহাসের একটি অধ্যায়কে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হবে।

৯ অক্টোবর,'৫০ তারিখের 'আজাদ' পত্রিকায় (ঢাকা) প্রকাশিত একটি খবরে বলা হয়েছে, 'যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল পাকিস্তান মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া মিঃ হারাণ চন্দ্র বর্মণ বলেন, ভগবানকে ধন্যবাদ তফসিলী জাতি বিশ্বাসঘাতকের হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছে। .... যে ৪ জন নেতা গতকল্য মিঃ মণ্ডলের পদত্যাগ দাবী করিয়া বিবৃতি প্রচার করেন মিঃ বর্মণ তাহাদের অন্যতম। বিবৃতিতে তাহারা বলেন যে, তফসিলী ফেডারেশন দল (মিঃ মণ্ডলের) বিশ্বাসঘাতকতা মূলক কার্যের জন্য পদত্যাগ দাবী করিলে কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। মিঃ বর্মণ বলেন, যদি তাহার সৎসাহস ও আন্তরিকতা থাকিত তবে তিনি পাকিস্তানে থাকাকালে পদত্যাগ করিতেন। যদি তফসিলীদের প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র দরদ থাকিত তাহা হইলে ৭৫ লক্ষ লোক তাহাকে একবাক্যে সমর্থন করিত।' (ম.যোগেন্দ্র., ২/২৯১)

১৫.১০.'৫০ তারিখের 'যুগান্তর' পত্রিকা লিখেছে ১৪ অক্টোবর পাকিস্তান পার্লামেন্টে দেওয়া এক ভাষণে মিঃ লিয়াকত আলি বলেন, 'শ্রীযুত মণ্ডল ভারত ও পাকিস্তান

উভয় দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যতদূর সম্ভব স্বার্থহানির কাজ করিয়াছেন।' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২/৩১০) 'হিন্দুস্থান টাইমস' পত্রিকার (১৭.১০.'৫০) বিশেষ সংবাদ দাতা মণ্ডল মশাই-র পদত্যাগের একটি 'কারণ' নির্দেশ করে বলেছেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যোগেনবাবুকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যেই মন্ত্রিত্ব দিয়ে তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। এটা যখন বুঝতে পারলেন তখনই যোগেনবাবু পদত্যাগ করেছেন। (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২/৩১৩)

১৯৫০-এর ২৪ অক্টোবর ঢাকায় তফসিলী ফেডারেশনের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন যোগেনবাবুর এক সময়ের অন্যতম সহযোগী মিঃ নগেন্দ্রনারায়ণ রায়। এই সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বলা হয় —

১) তফসিলী ফেডারেশনের সঙ্গে কোন প্রকার পরামর্শ না করেই মিঃ জে. এন. মণ্ডল পাকিস্তান মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন;
২) তিনি তফসিলী সম্প্রদায়ের সামগ্রিক স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।
['betrayed the best interests of the Scheduled Castes.']

মণ্ডল মশাই-র দেশ-ত্যাগের পর পাকিস্তানের আদিবাসী মহিলা লীগের সেক্রেটারী মিস্ উর্মিলা দেবী বলেছেন — "কেবল সীমান্ত অতিক্রমের পরই পাকিস্তানে থাকা বোনেদের জন্য মিঃ মণ্ডল দরদ অনুভব করছেন।" (পূ. গ্রন্থ, ২/ ২৯২)

১৯৫০-এর ১৪ অক্টোবর পূর্ববঙ্গ তফসিলী ফেডারেশনের সহ সভাপতি মিঃ কামিনী প্রসন্ন মজুমদার ও যুগ্ম সম্পাদক মিঃ রমেশ চন্দ্র মণ্ডল এক বিবৃতিতে বলেন, 'যদি বলা হয় যে মিঃ মণ্ডল পাকিস্তানের তফসিলীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন — তাহলে তা কি অতিরঞ্জিত বলে মনে হবে? .... অনেক অনেক আগেই তফসিলী সম্প্রদায় মিঃ মণ্ডলের উপর আস্থা হারিয়েছিলেন। তিনি মন্ত্রী থাকার কারণে এতদিন তা প্রকাশ করতে পারছিলেন না।'

বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকরের জীবনীকার শ্রীধনঞ্জয় কীর লিখেছেন,' পাকিস্তানে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা যোগেনবাবুকে তৃতীয় প্রজন্মের ক্রীতদাস বলে নিন্দা করেছে।'

প্রাক্তন গণ-পরিষদ সদস্য অরুণ কুমার গুহ 'India's Struggle : Quarter Of A Century, 1921 - 1946, Part II' শীর্ষক একটি বই লিখেছেন (প্রকাশক : ভারত সরকার, ১৯৮২)। এই বই-এর ৮০১ নং পৃষ্ঠায় যোগেনবাবু সম্পর্কে বলেছেন, 'আমি মণ্ডল মশাইকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনতাম। কোন দল বা কোন সমাজের কাছে তাঁর কোন বৌদ্ধিক, রাজনৈতিক বা নৈতিক মূল্য ছিল না।' [114]

আমরা এখানে স্মরণ করতে পারি যে, ড. আম্বেদকর যোগেনবাবু এবং বাবু জগজীবন রাম সম্পর্কে প্রায় একই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন। 'তাঁদের একজনেরও তফসিলী সম্প্রদায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা বা কর্তব্যবোধ ছিল না।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মিঃ লিয়াকত আলি খান থেকে সুরু করে তফসিলী ফেডারেশন হয়ে ডঃ আম্বেদকর বা আজকের ডঃ অনিল রঞ্জন বিশ্বাস পর্যন্ত যাঁরা যাঁরা যোগেনবাবু সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ মণ্ডল মশাইকে বিশ্বাসঘাতক এবং কেউ তাঁকে কর্তব্যজ্ঞানহীন বলে চিহ্নিত করেছেন। মণ্ডল মশাই ভারতে এসেই ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর প্রথম কাজ হবে ডঃ আম্বেদকরের সঙ্গে দেখা করা। কিন্তু পরবর্তী ৬ বছর ২ মাস ২০/২১ দিনের মধ্যেও অর্থাৎ বাবাসাহেবের মৃত্যুর পূর্বে ৬ মিনিটের জন্যও তাঁর সঙ্গে যোগেনবাবুর দেখা হয়েছে এমন প্রমাণ আজও কেউ দিতে পারছেন না। আজকের মুসলিম লীগ পন্থী যে সব দলিতরা আম্বেদকরের নাম নিতে নিতে গল্প উপন্যাস লিখছেন তাঁরা বলবেন কি যে, বাবাসাহেব কেন মণ্ডল মশাইর সঙ্গে দেখা করেননি ?

উত্তর মেরু বনাম দক্ষিণ মেরু

"ইনশা আল্লাহ্ আমরা পাকিস্তান পাব।" — মিঃ জিন্নাহ্। [115]

" It is my conviction that the State of Pakistan will be one of the most powerful, resourceful and magnificent countries in the world."

-- Mr. J. N. Mandal (ম. যোগেন্দ্রনাথ-২, পৃ-৯২)

"আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, ভারত রক্ষার ব্যাপারে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করবো।" — ডঃ আম্বেদকর।' [116]

অতীত ইতিহাসের আলোকে বর্তমানকে বিচার বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ জীবন ও কর্মপন্থা যারা নির্ধারণ না করেন এবং লোক দেখানো দরদ দেখিয়ে রাজনৈতিক সংকট কালে স্বার্থ বুদ্ধিতে গোঁজামিলের পথ ধরেন, তাঁদের রাজনীতি সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্নই করে তোলে।

যোগেনবাবুর সম্ভবত মুসলিম লীগের চরিত্র, রাজনীতি ও ভ্রাতৃত্ব, কোরান হাদীসের শিক্ষা ও অনুশাসন এবং অমুসলমানদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ সম্পর্কে কিছুমাত্র ধারণা ছিল না। গ্রামের খেটে খাওয়া দরিদ্র মুসলমান যারা ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলায় অভ্যস্ত নয়, তাদের দেখে কিন্তু মুসলিম বিধি-বিধান মেনে-চলা মুসলমানকে চেনা যায় না। মুসলিম লীগ কোরান মাথায় নিয়ে সমগ্র পৃথিবীকে তাদের পদতলে আনার পক্ষে। ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন ধর্মের অস্তিত্ব সহ্য করতে রাজী নয় তারা। তাদের প্রচারিত দ্বি-জাতি তত্ত্ব নতুন কিছু নয়, কেবল কোরানে বর্ণিত বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী তত্ত্বের নামান্তর মাত্র। হিন্দু-বৌদ্ধরা প্রায় কেউই কোরান-হাদীস পড়েন না বলেই এ সব কথা তাঁরা জানেন না এবং বিশ্বাসও করেন না। বিধর্মী বিশেষত পুতুল পুজারীদের ব্যাপারে মুসলমানরা যা করেন তা ধর্মীয় অনুশাসন মেনেই করেন। ফলে পৃথিবীর কোন দেশেই অন্য সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘুরা তাদের ধর্মীয় বিধি-বিধান মেনে এদের সঙ্গে শান্তিতে সহাবস্থান করতে পারছেন না। ভারতীয় দর্শনে বর্ণিত বিশ্বজনীন চিন্তার ধারক বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন —

"পৃথিবীতে দু'টি ধর্মসম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র — সে হচ্ছে খ্রিস্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজের ধর্ম পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এ জন্য তাদের ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলার কোন উপায় নেই।" (কালান্তর, পৃ. ৩১৩)

এসব কথা যোগেনবাবু একেবারেই মাথায় রাখেননি। বলা ভালো, উনি এ সব বুঝতেই চাননি। উনি বাবাসাহেবের 'Pakistan or The Partition of India' গ্রন্থটির একটি লাইনও পড়েছেন বলে মনে হয় না। পড়ে থাকলে কথায় এবং কাজে তিনি বারে বারে বাবাসাহেবকে অস্বীকার করতে পারতেন না। এ ব্যাপারে ২/৪ টি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

১) ডঃ আম্বেদকর উপরোক্ত গ্রন্থে অখণ্ড ভারতের পক্ষে অনেক অনেক যুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি প্রশ্ন রেখেছিলেনঃ

   ক) ভারত একটি ভৌগোলিক একক। তার একক চরিত্র প্রকৃতির মতই প্রাচীন। এর (ভারতের) মুসলিম অধ্যুষিত বেশ কিছু অংশ সহজেই বাকিঅংশ থেকে আলাদা হতে পারে — এই যুক্তিতে কি পাকিস্তান হতেই হবে? [Dr. Ambedkar, Vol. 8, p-347-48.]

   খ) কিছু সংখ্যক মুসলমান অখুশি বলেই কি ভারতের ঐক্য ধ্বংস করতে হবে? [Ibid, p-348.]

   গ) ভারতের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বাদ-বিসম্বাদ আছে বলেই কি পাকিস্তান বানাতে হবে? [Ibid, p-348.]

   ঘ) মুসলমানরা একটি জাতি — এই কারণের জন্যই কি পাকিস্তান হতে হবে? [Ibid, p-352] .... (কিন্তু) আইনের দৃষ্টিতে মুসলমানরা এখনও জাতি হিসেবে গড়ে ওঠেনি। ('in the *de jure* or *de facto* sense of the term') [p-354]

   ঙ) কংগ্রেসের উপর বিশ্বাস হারানোর জন্যই কি পাকিস্তান বানাতে হবে? [Ibid, p-352]

   চ) স্বরাজ হবে হিন্দুরাজ — এই যুক্তিতেই কি পাকিস্তান বানাতে হবে?.... হিন্দুরাজকে আটকাতে হবে। কিন্তু পাকিস্তান বানিয়ে তা কি সম্ভব হবে? [Ibid, p-355] যোগেনবাবু অখণ্ড ভারতের পক্ষে কোনদিন একটি যুক্তিও দেননি।

২) বাবাসাহেব অখণ্ড ভারতের পক্ষে উপরোক্ত কঠিন কঠিন যুক্তি দিয়েও ভারতের প্রতিরক্ষা এবং মুসলিম মানসিকতার কথা বিবেচনা করে ভারত বিভাজনকেই সমর্থন করেছিলেন। [Ibid, p-363-64] যোগেনবাবুও ভারত বিভাজন চেয়েছিলেন। তবে তাঁর এই চাওয়া বাবাসাহেবের চাওয়ার মধ্যে পার্থক্য ততটুকু, যতটুকু পার্থক্য উত্তর আর দক্ষিণ মেরুর মধ্যে। বাবাসাহেবের চাওয়া ছিল শক্তিশালী ভারত গঠন এবং তার স্থায়িত্ব রক্ষার কারণে। আর যোগেনবাবুর চাওয়া ছিল মৌলবাদীর প্রতীক মুসলিম লীগের হাতে ভারতের একটি বড় অংশ তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

৩) বাবাসাহেব ভারত-বিভাজনকে সমর্থন করতে গিয়ে আরও দু'টো শর্ত দিয়েছিলেন — বাংলা ও পাঞ্জাবের বিভাজন এবং হিন্দুস্থান (ভারত) ও পাকিস্তানের মধ্যে সংখ্যালঘু বিনিময়। যোগেনবাবু এর তীব্র বিরোধিতা করেছেন। সংখ্যালঘু বিনিময়ের ব্যাপারে

বাবাসাহেব যেখানে রাষ্ট্র বিজ্ঞান সম্মত লিখিত পরিকল্পনা দিয়েছেন। যোগেনবাবু বলেছেন — না, এ কাজ সম্ভব নয়; এ কাজ অসম্ভব ও অবাস্তব। (ম. যোগেন্দ্রনাথ, ২য় খণ্ড; পৃ- ৪৪, ৫১)।

৪) দীর্ঘদিনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে বাবাসাহেব বলেছেন 'হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মিলনের জন্য সম্ভাব্য সব চেষ্টাই করা হয়েছে এবং তা সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।' যোগেনবাবু এই সত্যকে একেবারেই অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের বন্ধুত্ব সম্ভব না হলেও তফসিলী হিন্দুদের সঙ্গে এই মিলন সম্ভব।

৫) বাবাসাহেব বলেছেন, তফসিলীদের কাছে মুসলমানরা হিন্দুদের চেয়ে বড় বন্ধু নয়। ["Muslims are not greater friends of the Scheduled Castes than the Hindus." Dr. Ambedkar's Letter to Mr. J.N.Mandal dt. 2.6.1947] কিন্তু যোগেনবাবু বলেছেন মুসলমান, মুসলিম লীগ এবং জিন্নাহ্ই শ্রেষ্ঠ বন্ধু। মিঃ জিন্নাহ্কে তিনি তফসিলীদের ত্রাণ কর্তা হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন।

৬) ডঃ আম্বেদকর বলেছিলেন 'গরীব মুসলমানরা গরীব হিন্দুদের সমর্থন করবে না।' [Dr. Ambedkar, Vol. 8, p-236] যোগেনবাবু ছিলেন এই তত্ত্বের বিপরীত মেরুর মানুষ।

৭) মুসলমানদের ধর্মীয় বিধি বিধান এবং তাদের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে বাবাসাহেব বলেছেন 'দলবদ্ধ গুণ্ডামীই মুসলিম রাজনীতির বৈশিষ্ট্য।' পদত্যাগপূর্ব যোগেনবাবু কিন্তু ঐ দলবদ্ধ গুণ্ডামীর খোঁজ পাননি।

৮) বাবাসাহেবের মতে 'ভুলই হোক আর নির্ভুলই হোক তৎকালীন ভারতের অধিকাংশ মানুষ (most people) মনে করতেন যে, পাকিস্তান সৃষ্টির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য মুসলিম শক্তি দ্বারা ভারতকেআক্রমণ করা এবং হিন্দুদেরকে তাদের অধীনে নিয়ে এসে ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা। [Ibid, p-376] যোগেনবাবু এসব কথা বেমালুম অস্বীকার করে বলেছিলেন, 'মুসলিম লীগ শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের নয়, ভারতের সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নতি লাভের ও স্বাধীনতা আদায়ের মহান দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।'

৯) মুসলিম ধর্মশাস্ত্রে একটি মারাত্মক সত্য হচ্ছে 'দার-উল-ইসলাম (মুসলমানদের আবাসভূমি) ও দার-উল-হারব (ইসলামের শত্রুদের দেশ) তত্ত্ব'। বাবাসাহেব বলেছেন— এই তত্ত্ব অনুসারে ভারত হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মিলিত আবাসভূমি হতে পারে না। [117] পদত্যাগপূর্ব যোগেনবাবুর কাছে হিন্দু-মুসলিমদের 'মিলিত আবাসভূমি' অসম্ভব হলেও তফসিলী মুসলিমদের 'মিলিত স্বর্গ'ও হতে পারে।

১০) ডঃ আম্বেদকর বলেছেন— 'আমি চাই আমার মানুষেরা প্রথমে ভারতীয় হবেন, শেষে ভারতীয় হবেন এবং ভারতীয় ছাড়া অন্য কিছুই হবেন না।' [118] যোগেনবাবু তাঁর সমগ্র জীবনে এমন কোন বিবৃতি দেননি। বরং তিনি পাকিস্তানের অর্থ করেছিলেন

'পবিত্র-ভূমি'। (ম. যোগেন্দ্রনাথ- ২, পৃ-৭৫) ঐ পবিত্রভূমিতে তিনি তাঁর এবং আমাদের আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন।

১১) হিন্দু দর্শন ও মুসলিম দর্শনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে বাবাসাহেব বলেছিলেন, 'এমন কোন কিছুই নেই যা' উভয় সম্প্রদায়কে এক জায়গায় নিয়ে আসতে পারে।' ['nothing to bring them in bosom.' Vol. 8, p-193] যোগেনবাবু বাবাসাহেবের এই অভ্রান্ত মূল্যায়নকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে তফসিলী-মুসলিম ঐক্য গড়ে তোলার জন্য জীবনপাত করতে গেছিলেন। কিন্তু তাঁকে জীবন দিতে হয়নি। ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতে এসে বেঁচে গেছেন। প্রাণ দিতে হয়েছে তফসিলীসহ হাজার হাজার হিন্দুকে; সতীত্ব হারাতে হয়েছে হাজার হাজার মা-বোনকে। আজও ঐ পাশবিক অপকর্মের অবসান ঘটেনি।

১২) ডঃ আম্বেদকরের মতে, 'প্রস্তাবিত হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের মধ্যে সংখ্যালঘু বিনিময়ই ছিল সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের দীর্ঘস্থায়ী প্রতিষেধক।' [112] যোগেনবাবু এর বিপরীত কথাই বলেছেন। আমরা আগেই প্রমাণ দিয়েছি যে, তিনি পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে তফসিলী সম্প্রদায়কে মুসলিম লীগের প্রতীক 'চাঁদ তারা' মার্কা ব্যাজ পড়তে বলেছিলেন। বাবাসাহেবের চিন্তাধারার প্রতি বিন্দু মাত্র শ্রদ্ধা থাকলে কি কেউ এই ধরণের অপকর্ম করতে পারে?

১৩) 'তফসিলীদের এটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, তাঁরা হিন্দুদেরকে অপছন্দ করেন বলেই মুসলমানদের বন্ধু বলে মনে করেন। এই চিন্তাধারা ভুল।' [99] বাবাসাহেবের এই মন্তব্যকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে যোগেনবাবু আমাদেরকে বলেছিলেন — 'মুসলিম লীগই আমাদের পরম বন্ধু, আপনারা কেউ ভারতে যাবেন না।'

১৪) বর্ণ হিন্দুদের সঙ্গে কিছুটা ঝগড়া থাকা সত্ত্বেও বাবাসাহেব প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন, 'ভারত রক্ষার ব্যাপারে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করবো।' আর যোগেনবাবু এমন ধ্বংসকামী শক্তির সমর্থক ছিলেন, যে শক্তি ঘোষণা করেছে, 'হয় আমরা ভারত ভাগ করবো নয়ত ভারতকে ধ্বংস করে দেবো।'

এখন যদি বলা হয় যে, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে যোগেনবাবু বাবাসাহেবকে অমান্য করে রাজনীতি করেছেন, তাহলে খুব একটা ভুল বলা হবে কি? এই অমান্য করার বড় প্রমাণ মণ্ডল মশাইর অযৌক্তিক মুসলিম লীগ প্রীতি। কখনও মুসলিম লীগের বন্ধু, কখনও বা তাদের সহযোগী সদস্য হিসাবে নিজ সম্প্রদায়ের মুক্তির নামে তাদের সংগে একাত্ম হয়ে সংখ্যালঘু বিনিময়-বিহীন পাকিস্তান সৃষ্টিতে বিশ্রীভাবে সহায়তা করেছেন, যে সৃষ্টি ভারত উপমহাদেশের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছে এবং এখনও করছে। এরই মধ্যে তিনি তাঁর মন্ত্রিত্ব চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সব নীতিবোধ বিসর্জন দিয়ে 'অসত্য ও অর্ধ সত্য' বিবৃতি দিয়েছিলেন। এরপরেও যখন জীবন সংশয় দেখা দিল তখন পালিয়ে এলেন এই ব্রাহ্মণ্যবাদী

ভারতে। আর এখানে এসেই আবিষ্কার করলেন — "Pakistan is no place for Hindus to live in." তিনি যে ওখানকার সরকারী চাপের কাছে নতি স্বীকার করে 'অসত্য ও অর্ধ সত্য' বিবৃতি দিয়েছিলেন তাও তিনি স্বীকার করেছেন অকপটে। তার ভাষাতেই এই স্বীকারোক্তি উল্লেখ করছি।

"এক দিকে সংসদীয় দলের নেতা এবং অপরদিকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আপনার ক্ষমতা প্রয়োগ করে আপনি (মিঃ লিয়াকত আলি) আমাকে একটি বিবৃতি দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমি সে বিবৃতি দেই গত ৮ সেপ্টেম্বর (১৯৫০)। ঐ বিবৃতিটি ছিল অসত্য এবং অসত্যের চেয়েও ঘৃণ্য অর্ধসত্য তথ্য সম্বলিত। আপনি জানেন, আমি এই বিবৃতি দিতে চাইনি। কিন্তু আমি আপনার অধীনস্ত মন্ত্রী হিসাবে আপনার সঙ্গে কাজ করছিলাম। তাই আপনার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হয়নি।"

নীতি বা আদর্শবান কোন মানুষ কি জেনে শুনে ঐ ধরনের মিথ্যা বিবৃতি দিতে পারে?

নতুন গল্পের সন্ধানে

'তফসিলীরা ঠিক করেছেন যে, দেশ-ভাগ হলেও তাঁরা পূর্ববঙ্গেই থাকবেন।'
— যোগেন্দ্রনাথ।

'হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা তফসিলীদের বড় বন্ধু নয়।' — ডঃ আম্বেদকর।

পদত্যাগপূর্ব যোগেনবাবুকে 'মহাত্মা' বানাবার উদ্দেশ্যে ইদানিং দু'টো নতুন গল্প চালু করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর প্রথম গল্পটি হচ্ছে এই— রাজ্যসভার বর্তমান সদস্য আর. এস. গাভাই গত ২৯ জানুয়ারি, ২০০৩, পশ্চিমবঙ্গে (লক্ষ্মীপুর, গোবরডাঙ্গা) প্রদত্ত এক ভাষণে বলেন, "বাবাসাহেব সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, গণ-পরিষদের সব দরজা-জানালা আমার জন্য বন্ধ ছিল। শুধুমাত্র যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের জন্য দরজা ভেঙ্গে আমি ঢুকতে পেরেছি।" (কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর সম্পাদিত 'নিখিল ভারত', ২২ তম সংখ্যা, এপ্রিল, ২০০৩, পৃ-১ ও ৩) খবরটি পড়ে সেই 'চার জিলা মার্কা' গপ্পের কথা মনে পড়ে গেল, যা আগেই বলা হয়েছে। তবু মহারাষ্ট্র সরকার প্রকাশিত ডঃ আম্বেদকর রচনাবলীর ১৩ এবং ১৫ নং খণ্ডদ্বয় ['Dr. Ambedkar : The Principal Architect of The Constitution of India, & Dr. Ambedkar as Free India's First Law Minister And Member of Opposition In Indian Parliament', Edited by Shri Vasant Moon] একবার দেখে নিলাম। এই বই দুটিতে ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত গণ-পরিষদ এবং সংসদে প্রদত্ত বাবাসাহেবের ভাষণের খুঁটিনাটি সবই আছে। এর মধ্যে কোথাও তিনি যোগেনবাবুর নাম মুখে এনেছেন বলে দেখিনি। কেবলমাত্র ১৩ নং খণ্ডের ৫ নং পৃষ্ঠায় সম্পাদক শ্রীবসন্ত মুন লিখেছেন, *"Dr. Ambedkar, having failed to get elected from Bombay due to Congress opposition, managed to enter the Constituent Assembly through the Bengal Assembly with the support of Jogendranath Mandal and other Scheduled Caste members."*

আমাদের জানা মতে এটাই হল ইতিহাস। যোগেনবাবু এবং অন্যান্য কয়েকজন তফসিলী এম. এল. এ-র সমর্থনের ফলেই বাবাসাহেব গণপরিষদে যেতে পেরেছিলেন। এই ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানোর জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন কতিপয় যোগেন্দ্র ভক্ত। তাঁদের মতে একমাত্র যোগেনবাবুর প্রচেষ্টার ফলেই বাবাসাহেব বাংলা থেকে গণপরিষদে নির্বাচিত হতে পেরেছিলেন। তাঁরা তৎকালীন সর্বভারতীয় ছাত্র নেতা শ্রীঅপূর্বলাল মজুমদারের

অবদানকে অস্বীকার করছেন। বাবাসাহেবের পক্ষে প্রচার করতে গিয়ে তিনি ছাত্র-যুবকদের নিয়ে এম. এল. দে-র বাড়ী বাড়ী ধর্ণা দিয়েছেন, কোথাও বা অবস্থান করেছেন। এর কোন মূল্য নেই ঐ ভক্তদের কাছে। ঐ সময় বিদগ্ধ রাজনীতিবিদ শ্রীমুকুন্দ বিহারী মল্লিক মহাশয় (যোগেনবাবু যাঁকে 'ডেভিল' বলে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন) তাঁর নিজের বিবেক-বুদ্ধি অনুসারেই বাবাসাহেবের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন নিশ্চয়ই।

১৯৪৭-র ৩০ মে যোগেনবাবু বাবাসাহেবের কাছে একটি চিঠি লিখে বলেছিলেন *বাংলাভাগ হলেও পূর্ববঙ্গের তফসিলীরা ঠিক করেছেন যে, তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে যাবেন না।* এ ব্যাপারে যোগেনবাবু ডঃ আম্বেদকরের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। *যে কোন বিচারে যোগেনবাবুর দাবি নির্জলা মিথ্যা।* তবুও ঐ চিঠির উত্তরে ডঃ আম্বেদকর ২ জুন একটি চিঠি লেখেন। এই চিঠির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে — [119]

১। তফসিলী জনগণ ভারত-বিভাজন প্রসঙ্গে কার্যকরীভাবে কিছু করতে অপারগ। তাঁরা এই বিভাজনকে আটকাতেও পারবেন না বা পরিহারও করতে পারবেন না।

২। (এক্ষেত্রে) তাঁদের একটিমাত্র কাজই করার আছে। তা হচ্ছে খণ্ডিত বা অখণ্ড বাংলায় যথাযথ রক্ষাকবচের জন্য আন্দোলন করা।

৩। আমি মনে করি তফসিলীদের কাছে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা বড় বন্ধু নয়।

৪। চিঠিতে আপনি লিখেছেন যে, বাংলা ভাগ হলেও পুর্ববঙ্গের তফসিলীরা পূর্ববঙ্গেই থাকবেন বলে স্থির করেছেন।

৫। দামোদর ভ্যালি পরিকল্পনা রূপায়িত হলে চাষের জন্য যে জমি পাওয়া যাবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তার একটি অংশ পূর্ববঙ্গের তপসিলীদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে আমি হিন্দুদের বলে রেখেছি। তবে এটি কিছুটা দূরবর্তী সম্ভাবনার কথা।

৬। এর মধ্যে (অর্থাৎ ঐ জমি না পাওয়া পর্যন্ত) আমি আপনার সঙ্গে সহমত পোষণ করে বলছি যে, লীগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আপনি কাজ করতে পারেন এবং (সেক্ষেত্রে) তফসিলীদের জন্য যথাযথ রক্ষাকবচ আদায় করে নেওয়া উচিত।

৭। 'এ' গ্রুপের হিন্দুরা আমাদের জন্য উপযুক্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করবে কিনা সে ব্যাপারে আমি আপনার মত হতাশ নই।

৮। এ পর্যন্ত আমি যতটা ভেবে দেখেছি, তাতে আমার মনে হয় আমরা যে সব রক্ষাকবচ চাই তার প্রায় সবই হিন্দুরা মেনে নেবেন।

এই চিঠির কিছু অংশ নিয়ে দ্বিতীয় গল্পটি বানানো হয়েছে। গল্পে বলা হয়েছে 'ডঃ আম্বেদকর ১৯৪৭-র ২ জুন এক 'গোপন' চিঠিতে যোগেনবাবুকে বলেছিলেন যথাযথ রক্ষাকবচ [safeguards] নিয়ে তিনি পাকিস্তানে মন্ত্রিত্ব করতে যেতে পারেন। *'মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় বড় বন্ধু নয়', এখানে 'হিন্দুরা প্রায় সব রাজনৈতিক রক্ষাকবচ দেবেন'* — এ সব কথা এড়িয়ে গেলেন গল্পকার।

পরের ঘটনা আরও মজার। যোগেনবাবু পাকিস্তানে গিয়ে লীগের কাছে কি কি

রক্ষাকবচ চেয়েছিলেন এবং পেয়েছিলেন তার কোন হদিস দিচ্ছেন না কেউ। সাংবিধানিক রক্ষাকবচের চেয়ে পাকিস্তান ও মুসলিম লীগের প্রতি তফসিলীদের আনুগত্যের মূল্য যে অনেক বেশি এ কথা বলতে ভোলেননি তিনি। '৪৭-র ১০ আগষ্ট পাক গণ-পরিষদের এক দিনের সভাপতি মিঃ মণ্ডল গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে (পড়ুন 'রাজনৈতিক ভাবে আত্মবিক্রয়ের বুদ্ধি নিয়ে') বলেছিলেন, 'সংখ্যালঘু জনগণ রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত এবং বিশ্বস্ত না হলে, তাদের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা এমনকি নিরাপত্তার দাবি করাও অযৌক্তিক।' ["Unless the minorities are loyal and faithful to the State, there is little justification for safeguards and even demands for them."] (ম. যোগেন্দ্রনাথ-২, পৃ-৯৩)

এর ৫৭ দিন পরে একটি অভিনব 'রক্ষাকবচ' খুঁজে বের করেছেন মণ্ডল মশাই। তিনি তফসিলীদের বাহুতে এ টি বেঁধে বাড়ীর বাইরে (কাজে) যেতে বলেছিলেন। এর নাম 'চাঁদ-তারা মার্কা' ব্যাজ। পক্ষান্তরে ঐ সময় বাবাসাহেব বলেছিলেন 'আপনারা যে ভাবে পারেন ভারতে চলে আসুন। আগেই আমরা এর বিবরণ দিয়েছি। (পৃ-৮৯)

প্রিয় পাঠকদের উদ্দেশে এখানে আমরা 'Pakistan or The Partition of India' থেকে বাবাসাহেবের আর একটি অতি মূল্যবান মন্তব্য উল্লেখ করছি। 'বাংলা ও পাঞ্জাবের অমুসলমান সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে রক্ষাকবচ নিয়ে খুশি থাকতে বলা নিরর্থক।' [120]

১৯৫৬ সনে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও তিনি এই মত পরিবর্তন করেননি।

উপসংহার

এই নিবন্ধে ভারত বিভাজন প্রসঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এবং ড. আম্বেদকরের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এ কাজ করতে গিয়ে যোগেনবাবুর রাজনীতির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে ঐতিহাসিক তথ্যাবলীকে ভিত্তি করেই এ কাজ করা হয়েছে। যোগেনবাবুর কার্যাবলীর মধ্যে কিছু কাজ সমালোচনার যোগ্য। আবার কিছু কাজ প্রশংসনীয়। প্রথমতঃ দেরিতে হলেও তিনি মুসলিম লীগের চরিত্র এবং তাদের রাজনীতির নোংরা কৌশল অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। মুসলিম দর্শনের ক্ষতিকারক দিকগুলো সঠিকভাবেই চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। হিন্দু-মুসলমান বা দলিত-মুসলিম ঐক্য যে বাস্তবে সম্ভব নয়, তা তিনি মুসলমানদের সঙ্গে কাজ করতে করতেই বুঝেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ আমাদের বাংলা থেকে ডঃ আম্বেদকরের গণপরিষদে নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে যোগেনবাবু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তৃতীয়তঃ তিনি 'পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থার' মারাত্মক পরিণতির কথা বুঝতে পেরেছিলেন। ভারতে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করা হয়েছিল মুসলিম লীগের দ্বিজাতি তত্ত্বকে ভিত্তি করেই। এই পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থাই শেষ পর্যন্ত ভারত ভাগের জন্য দায়ী। (ম. যোগেন্দ্রনাথ-২, পৃ-১০৬) চতুর্থতঃ তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ভুল স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। তিনি ভুলের বোঝা বইতে না পেরে পদত্যাগ করেছিলেন। উদাত্ত কণ্ঠে তিনি বলেছেন, **'আমার বিবেক মিথ্যা চিন্তা-চেতনা এবং অসত্যের গুরুভার আর বহন করতে পারছে না। তাই মন্ত্রী হিসাবে আমি পদত্যাগ করছি।'** ***["But I can no longer carry this load of false pretensions and untruth on my conscience and I have decided to offer my resignation as your Minister, ..."]***

পদত্যাগের পরে হলেও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা স্থায়ী সমাধানের দু'টো পথ আছে— "........... **হয় পূর্ববঙ্গকে ভারতের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে, নয়ত ওখানকার হিন্দুদের ভারতে নিয়ে আসতে হবে।"** এ সব কাজ প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু যোগেন্দ্র ভক্তির নামে আজ অনেকেই **চারটি প্রশংসনীয় কাজের দ্বিতীয়টি বাদে বাকি তিনটিকে বেমালুম অস্বীকার করে নতুন করে 'মিথ্যা চিন্তা-চেতনা এবং অসত্যের' বেসাতি করা সুরু করেছেন।** এঁরা আবার 'পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা' চাইছেন। চাইছেন 'দলিত-মুসলিম ঐক্য'। যোগেনবাবুর পদত্যাগ পত্রটিকে মুছে দিয়ে পদত্যাগ-পূর্ব মণ্ডল মশাইয়ের

ভুলগুলিকে নির্ভুল বলে প্রচার করে বাবাসাহেবের অমূল্য সৃষ্টি 'Pakistan or The Partition of India'-র মূল বক্তব্যকেই অস্বীকার করতে চাইছেন এবং সেই সঙ্গে নির্যাতিত শ্রেণীর মানুষদের এক মারাত্মক পরিণতির দিকে ঠেলে দিতে চাইছেন। কেন এই ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হচ্ছেন এঁরা, তা আমাদের মত ক্ষুদ্র মানুষের বুদ্ধির অগম্য। তবু ক্ষুদ্র মানুষ হিসাবেই তাঁদের উদ্দেশ্যে বলা যায় —

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী।।
গীতা ১৮/৩২

* * *

পরিশিষ্ট-১

সহায়ক গ্রন্থাবলীর পরিচয়

১) স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা ঃ প্রয়াস ও পরিণতি- আমলেন্দু দে। প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৫। রত্না প্রকাশন। কোলকাতা - ২৭।

২) পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক - অমলেন্দু দে। পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ , ১৯৮৯, কোলকাতা - ১৩, মূল্য - ১৮ টাকা।

৩) কেন উদ্বাস্তু হতে হল, শ্রীদেবজ্যোতি রায়, বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র, ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩। মূল্য- ৪০/৫০ টাকা।

৪) আনন্দ সঙ্গী ঃ আনন্দ পাব. প্রা. লিমিটেড। কোল - ৯ (১৯৭৫), মূল্য- ৩০ টাকা।

৫) মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ , জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল, ১ম (১৩৮২) ও ২য় খন্ড (১৯৭৯), বঙ্গ ভঙ্গ, মহাপ্রাণ পাবলিশিং সোসাইটি, কোল-৩৩।

৬) আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর', আবুল মনসুর আহমদ, ২০০০, ঢাকা।

৭) বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপট, শেখ হাফিজুর রহমান, ২০০১, জোনাকী প্রকাশনী, ঢাকা-১১০০, মূল্য-২০০ টাকা।

৮). দেশ বিভাগ — পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী। ভবানী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। আনন্দ পাব. প্রা. লিমিটেড। কোল - ৯। জানুয়ারী, ১৯৯৩। মূল্য - ৫০ টাকা।

৯) আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি — আবুল হাসিম। চিরায়ত প্রকাশন প্রা. লি., ১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট। কোল - ৭৩। মূল্য - ১৮ টাকা।

১০) যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়, কালীপদ বিশ্বাস, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলি-৭।

১১) শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক - সিরাজ উদ্দীন আহমেদ। ২য় সং (১৯৯৩)। ভাস্কর প্রকাশনী, ১৫৮ - শান্তি নগর, ঢাকা - ১২৭।

১২) 'ভারত ইতিহাস পরিক্রমা', ১৯৯৮, অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাইতি,

১৩) 'আধুনিক ভারত', প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৯

১৪) 'জিন্না - পাকিস্তান ঃ নতুন ভাবনা', শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র-ঘোষ, চৈত্র ১৪০০,

১৫) 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস',অমলেশ ত্রিপাঠী, বাং ১৩৯৭।

১৬) তর্ক, বিতর্ক ও কুতর্ক, ড. অনিল বিশ্বাস (২০০০), ফার্মা কে. এল., কল- ১২।

১৭) শ্যামাপ্রসাদ ঃ বঙ্গবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ, ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ, (বাং ১৪০৭), গ্রন্থরশ্মি, ২০৬, বিধান সরণি, কলি-৬

১৮) Dr. Babasaheb B.R. Ambedkar Writings and Speeches, Vols.2,3,8, 10, Govt. of Maharastra Publication.

১৯) The Transfer of Power in India – V. P. Menon. Pub : Orient Longmans, 17, C. R. Avenue, Cal-13.

২০) The Transfer of Power, Published by Her Majesty's Stationary Office, London (Vols. 8-11)

২১) Stern Reckoning – G. D. Khosla, Oxford University Press, N.D. – 110 001.

২২) India Wins Freedom – Moulana Abul Kalam Azad, Orient Longmans (1959).

২৩) India Partitioned and Minorities of Pakistan – Provash Chandra Lahiri, Published by Writers' Forum Pvt., Cal-1.(1964) Price Rs. 5.50.

২৪) Minority Politics in Bangladesh – Md. Ghulam Kabir, Vikas Pub. Pvt. Ltd., Ghaziabad, U.P.

২৫) Freedom at Midnight, Larry Collins and Dominique Lapierre.Pub : Do.

২৬) Mountbatten and Partition of India, Larry Collins & Dominique Lapierre. Pub. Do

২৭) The Collected Works of Mahatma Gandhi, Vols. 51,71,85, 86 & 89, Pub : The Govt. of India, 1982. Price Rs, 20/- each

২৮) My Days With Gandhiji – N. K. Bose, Pub : A.Chatterjee, 27-A, Chorebagan Lane, Cal-17, 1953, Price Rs. 7.50

২৯) Dr. Ambedkar's Role in National Movement, D.R. Jatava, Buddha Sahitya Sammelan, N.D. –5. Price Rs. 25/-

৩০) QUAID-I-AZAM MOHAMMAD ALI JINNAH PAPERS. Editor - in- Chief: Z.A.Zaidi, M.A. LL. B. (Alig.), Ph. D. Quid-I-Azam Papers Project, National Archives of Pakistan Volume-1, Part-11, First Edition-1993.

৩১) Constituent Assembly Debates : Official Report, 5 Volumes Third Print-1999. Lok Sabha Secretariate, New Delhi.

পরিশিষ্ট-২

বাংলা থেকে গণপরিষদে নির্বাচনের আগে ডঃ আম্বেদকরের কাছে লেখা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের চিঠি।

Copy of Letter From Mr. J. N. Mandal to Dr. B. R. Ambedkar

Calcutta

The 11th July 1946.

My dear Dr. Ambedkar,

I send you an "Immediate" telegram this afternoon requesting you to come to Calcutta. I was being repeatedly requested and pressed by Mr. Shahbuddin, brother of Sir Nazimuddin to send you the wire. The reason is, yesterday Mr. Suharawardy and Mr. Shahabuddin called Mr. Mullick before them and requested him to vote for you on which he said many things to them against you and me. Mr. Mullick went so far as to say that not to speak of meeting Mullick during your stay here you have not even written to him in reply to his two long letters. As you did not see him and request him to vote for you he has taken exception.

Perhaps having been impressed by his talk Mr. Suhrawardy rang me up immediately to send you an "Immediate" wire, but when I saw him and explained things to him he advised me to talk to Mr. Shahabuddin which I did last evening. Mr. Shahabuddin also is now convinced of the hollowness and incorrectness of the statement made by Mullick. But in spite of that Mr. Shahabuddin said that Doctor's presence in Calcutta would greatly help his election and in order to be doubly sure of Doctor's success he should be present in Calcutta. On being requested a second time today by Mr. Shahbuddin I sent you the telegram. You will understand my feeling from the telegram too.

I know you are very busy with many things, so it may not be possible for you to come to Calcutta at this moment. I however have made you acquainted with what is happening here. My personal opinion is that your presence might give us some advantage and it would be better could you be present here some one or two days prior to the day of election.

Regarding the prospect of your success, I can let you know this much that there would have been no difficulty if Mr. Nagendra Narayan Ray, the

seconder of your nomination paper had not fallen ill. He has 2 or 3 abscesses on the outer side of his thigh and he is bed ridden in Rangpur. So I am not certain whether he will be able to come and vote. I am however trying to compensate that and hope to succeed by the grace of God. You need not worry. Our cause is just, so God will help us.

If you can come, please let me know. I will make all accommodations and arrangements here.

With kindest regards,
J.N.Mandal.

পরিশিষ্ট-৩

LETTER FROM MR. J. N. MANDAL TO DR. B. R. AMBEDKAR.

C o n f i d e n t i a l

Emblem of Minister,
Govt. of Bengal.
3 Cooper Street

Calcutta
The 25th July 1946.

My dear Dr. Ambedkar,

I think you have received my congratulatory telegram sent immediately after the declaration of the result of the election. You were declared elected first. Once again I offer you my heartiest congratulation and felicitation on your glorious success in the election of the Constituent Assembly.

I regret very much that I could not write to you earlier neither I could contact you by the trunks on account of postal strike and dislocation in the telephone operation. After the said election I became busy with the organisation of a big demonstration and procession in the city. With the object of celebrating your triumphant victory and, to express our sympathy to our Satyagrahis and to protest against the proposals of the Cabinet Mission we took out a very big procession on 20.7.46. The procession was about half a mile in length consisting of several thousands of people with slogans expressing our sympathy to the Satyagrahis and other slogans such as "Dr. Ambedkar Jindabad", "Scheduled Caste Federation Jindabad", "Down with

Cabinet Mission", "Boycot Congress", "Benia Gandhi Murdabad", so and so forth. No police help was requisitioned. The procession paraded along many main roads and streets covering a distance of about 10 miles. It was an unprecedented affair in Calcutta. All went on smoothly.

I now int nd to bring certain events and facts, which took place before the election of the Constituent Assembly. It pains me much to inform you certain things, but I could not help it because, in my opinion, that was the unkindest cut of all. The sort of opposition and adverse propaganda put up by Mullick is really inconceivable. He left no stone unturned to undermine your popularity and even your good name and prestige. He tried to poison the mind of Hon'ble Suhrawardy and some other Muslim leaders by saying that when you came over to Calcutta - 1) you had not given him any previous intimation, (2) on your arrival you did not see him, (3) you did not call him even and hence Mullick did not feel it his duty to vote for you.

His second line of propaganda to some other very respectable men belonging to Scheduled caste and Caste Hindu was that – (1) During your first visit to Calcutta you criticised him adversely in your speech delivered at the A.B.R. Mansion Institute Hall; all your statements were without foundation; (2) you tried several times to remove him from the service; (3) you proved a failure as an administrator; (4) you were a boy when Mullick became the leader of the Scheduled castes.

Never before I have known such a glaring instance of brutal ingratitude. I only ponder how the devil could go to such a length as to declare that you attempted several times to remove him from the Chairmanship of the Coal Mine Stowing Board.

All these, my dear Leader, pained me so much that I could not help communicating them to you. I know they will be similarly painful to you. Please excuse me.

What now I would request you to do is to speak to Hon'ble Mr. Suhrawardy and request him not to take Mallick in the Cabinet. If this devil is given any power he will surely utilise it to weaken our organisation and to antagonise us in all sphere of activities. His inclusion in the Cabinet shall be detrimental to the progress of our organisation and formation of solidarity among our people.

I know you are very busy with the Satyagraha movement of Poona. So I would not request you to come to Calcutta now, but I would like to request you to keep it in your mind that you should once come to Calcutta as early as possible. I on behalf of the Scheduled castes people of this province express our wholehearted cooperation to and sympathy for our Satyagrahis at Poona and where places. Please convey to him my felicitations and sympathy, love and respect. Their names will remain ever bright in golden letters in the history of the freedom movement of the Scheduled Castes.

I am sending one copy of this letter with Hon'ble Mr. Suhrawardy and another copy by airmail... Please acknowledge receipt. I received your last letter in time. I am well. Hope your are in good health.

With kindest regards,

Yours sincerely,
Dr. B. R. Ambedkar,

পরিশিষ্ট-৪

৩০ এপ্রিল, ১৯৪৭ তারিখে মিঃ জিন্নাহ্‌র কাছে ২৫,০০০/- টাকা চেয়ে যোগেনবাবুর চিঠি এবং টাকা গ্রহণের ২-টি রসিদ।

***Jogindra* (Jogendra) *Nath Mandal to M.A. Jinnah.* F. 673/30-31**

3 COPPER STREET, CALCUTTA,
30 April 1947

My dear Quaid-I-Azam,

I am sending Mr. G.D. Pramanick with this letter. He belongs to the Scheduled Sunsi Community and is a trusted friend of mine.

I have set up the organization to carry on our work in Western as well as Eastern Bengal. I had a long discussion with Mr. Suhrawardy yesterday. I have collected a number of workers from both Eastern and Western Bengal. I have already put in a number of workers in the Districts of Khulna, 24-Parganas, Howrah, Burdwan and Midnapur. It will be necessary to carry on a very e tensive and intensive propaganda in Western Bengal, i.e. in Burdwan I ivision and 24-Parganas. The Scheduled Caste people thereof being ver backward in education, we shall have to meet with difficulty.

But if I could put in a large number of workers we are sure to achieve success.

I now propose to start with a sum of Rupees twenty-five thousand. I shall be able to send you a report of the progress of work after ten days. It is an encouraging aspect that our workers do not cost me much. Kindly send the above-mentioned sum with Mr. Pramanick with your instructions, if any. I am well. Hope this finds you hale and hearty.

With kindest regards,

Yours sincerely,

J.N.MANDAL

*****

Enclosure 3 to No.502 (Page no. 934)

F. 68/44

RECEIPT

2 May 1947

Received from Mr. M.A. Ispahani the sum of Rupees ten thousand (10,000) to-day for the purpose of charitable works among the Scheduled Castes.

J. N. MANDAL

*****

RECEIPT

24 May 1947

Enclosure 4 to No. 502 (page no.935)

F. 68/45

Received from Mr. M.[A.] Ispahani a sum of Rupees four thousand only [4,000] for social uplift work for the Scheduled Castes.

[Taken from: QUAID-I-AZAM MOHAMMAD ALI JINNAH PAPERS. Editor – in Chief : Z.A.Zaidi, M.A. LL. B. (Alig.), Ph. D. (London), Quid-I-Azam Papers Project, National Archieves of Pakistan, Volume-1, Part-11, First Edition- 1993. Document No. 366, Page-632]

পরিশিষ্ট-৫

13.10.46 তারিখে যোগেনবাবুর কাছে ডঃ আম্বেদকরের লেখা চিঠি।

COPY OF LETTER FROM DR. AMBEDKAR TO MR. J. N. MANDAL.

"RAJGRAHA", DADAR,
BOMBAY-14.
13.10.46.

My dear Mandal,

I have no communication from you for such a long time that I am wondering how you are facing. You have not been able to attend any of the meetings of the Working Committee. I sent you also one or two letters. I don't know if you received them.

I wanted to discuss many things with you regarding the stand I should in the 'B' block of the Constituent Assembly if it ever met. I am leaving for London tomorrow by air. I think I must though my health is not quite good. I shall contact you on my return. Hope you are keeping well. With kind regards.

I am yours sincerely.
B.R.Ambedkar.

পরিশিষ্ট-৬

সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফ্‌ফার খানের পুত্র খান ওয়ালী খানের লেখা **From Facts are Facts** শীর্ষক বই-এর কিছু অংশ।

"Iskander Mirza had been transferred from the Frontier to Delhi where he was a joint secretary to the Ministry of Defence. He wrote (in his Autobiography) that in Feb. 1947 Jinnah telephoned inviting to a meeting. During this meeting the first thing he asked was, " Do you consider me the leader of Indian Muslims? Would you obey my orders? Iskander Mirza had no choice but to say,"Yes". Jinnah then said that he was afraid he was not going to get Pakistan unless some serious trouble was created and the best place to do this was NWFP and the adjacent tribal areas. .... Jinnah

explained that if Pakistan can not be won by negotiations he would achieve it by combat. Iskander Mirza wrote that Jinnah wanted him to resign from service, go into the tribal territory and start a Jehad.

Let us for a moment review the circumstances. It is February, 1947 Wavel had been fired from his job. The British Govt. had announced that the transfer of power would occur in June of 1948. Wavel's departure is a blow to Jinnah and the Muslim League. Communal riots had pulverised the nation. But Jinnah, notwithstanding, wanted to play the most dangerous game and that too in the Frontier Province.

Iskander Mirza wrote, "He (Jinnah) said, according to his information, I could achieve this if I really tried." This proves that Jinnah had maintained his contact with Government officials and knew how to create trouble in the tribal areas. It also shows how cleverly British officials could arrange a Jehad.

He (I. Mirza) wrote :

" This could only take the form of raids on the border villages, in the settled areas, yet I decided to fall in with Quad-i- Azam's Plan. I had no desire to be branded as a man who was found wanting when the time for action came. With the liberal expenditure of money I would be able to cause some trouble in Wazirstan Tirah and Mohmand country. I gave my estimate for the sum of money as one crore."

He asked a plausible excuse be found for his disappearance from Delhi. Mr. Jinnah had already anticipated these requirements, he had the cover and the money ready. The cover was an appointment with His Highness the Khan of Kalat, and the treasure was provided by his Highness, the Nawab of Bhopal who gave him Rs. 20,000/- for out of pocket expenses. Jinnah assured him if he was killed during the Mission he would see it that his family members are well provided for.

[From Facts are Facts : The Untold Story of India's Partition. Wali Khan. Translated by - Saidain Hameed. Pub: Vikas Pub. House Ltd. New Delhi. Price : 125/- Pages- 182. pages 108 - 109.]

পরিশিষ্ট- ৭

EXTRACTS FROM THE TEXT OF THE LETTER OF RESIGNATION BY MR. JOGENDRA NATH MANDAL,

Minister for Law and Labour, Govt. of Pakistan.

Dated, 8th October, 1950.

My Dear Prime Minister,

It is with a heavy heart and a sense of utter frustration at the failure of my life long mission to uplift the backward Hindu masses of East Bengal that I feel compelled to tender resignation of my membership of your Cabinet ...

1) ...Having been approached by a few prominent League leaders of Bengal in February, 1943, I agreed to work with them in the Bengal Legislative Assembly. After the fall of the Fazlul Haque Ministry in March, 1943, with a party of 21 Scheduled Caste M.L.As, I agreed to co-operate with Khawaja Nazimuddin, the then leader of the Muslim League Parliamentary Party who formed the Cabinet in April, 1943 ...

2) Apart from those terms, the principal objectives that prompted me to work in co-operation with the Muslim League was, first, that the economic interests of the Muslims in Bengal generally were identical with those of the Scheduled Castes. Muslims were Mostly cultivators and labourers, so were members of the Scheduled Castes. One section of Muslims was fishermen, so was a section of Scheduled Castes as well. Secondly, the objective was that the Scheduled Castes and Muslim both educationally and economically backward, I was persuaded that my co-operation with the League and its Ministry would lead to the undertaking on a widescale of Legislative and Administrative measures which, while promoting the mutual welfare of the vast bulk of Bengal's population and undermining the foundations of vested interest and privilege would further the cause of communal peace and harmony. It may be mentioned here that Khawaja Nazimuddin took three Scheduled Caste Ministers in his Cabinet and appointed three Parliamentary Secretaries from amongst the members of my community.

3) After the general election held in March, 1946, Mr. H.S.Suhrawardy became the leader of the League Parliamentary Party and formed the League Ministry in April, 1946. I was the only Scheduled Caste Member returned on the Federation ticket. I was included in Mr. Suhrawardy's Cabinet. The 16th day of August of that year was observed in Calcutta as "The Direct Action Day" by the Muslim League. It resulted, as you know, in a holocaust.

Hindus demanded my resignation from the League Ministry. My life was in peril, I began to receive threatening letters almost every day. But I remained steadfast to my policy. Moreover, I issued an appeal through our journal "Jagaran" to the Scheduled Cast people to keep themselves aloof the bloody feud between the Congress and the Muslim League, even at the risk of my life. I cannot but gratefully acknowledge the fact that I was saved from the wrath of infuriated Hindu mobs by my Caste Hindu neighbours. The Calcutta carnage was followed by the "NoaKhali Riot" in October, 1946. There Hindus including Scheduled Castes were killed and hundreds were converted to Islam. Hindu women were raped and abducted. Members of my community also suffered loss of life and property. Immediately after the massive Calcutta killing, a no-confidence motion was moved against the Suhrawardy Ministry. It was only to my efforts that the support of four Anglo-Indian Members and of four Scheduled Caste members of the Assembly who had hitherto been with the Congress could be secured, but for which the Ministry would have been defeated.

4) In October 1946, most unexpectedly came to me through Mr. Suhrawardy the offer of a seat in the Interim Government of India. After a good deal of hesitation and being given only one hour's time to take my final decision – I consented to accept the offer subject to this condition only that I should be permitted to resign if my leader Dr. B. R. Ambedkar disapproved of my action. Fortunately, however, I received his approval in a telegram sent from London. Before I left for Delhi to take over as Law Member, I persuaded Mr. Suhrawardy, the then Chief Minister of Bengal to agree to take two Ministers in his Cabinet in my place and to appoint two Parliamentary Secretaries from the Scheduled Cast Federation Group.

5) I joined the Interim Govt. on November 1, 1946. After about a month when I paid a visit to Calcutta Mr. Suhrawardy intimated to me that the communal tension in some parts of East Bengal, especially the Gopalganj sub-division where the Namasudras were in a majority, was very high. He requested me to visit those areas and address meetings of Muslim and Namasudras. The fact was that Namasudras in those areas had made preparation for retaliation. I addressed about a dozen largely-attended meetings. The result was that Namasudras gave up the idea of retaliation. Thus an inevitable dangerous communal disturbance was averted.

6) After a few months, the British Government made their June 3 Statement (1947) embodying certain proposals for the Partition of India. The whole country, especially the entire non-Muslim India, was startled. For the shake of truth, I must admit that I had always considered the demand

of Pakistan by the Muslim League as a bargaining counter. Although I honestly felt that in the context of India, as a whole Muslims had legitimate cause for grievance against upper class Hindu chauvinism, I held the view very strongly indeed that the creation of Pakistan would never solve the communal problem. On the contrary, it would aggravate communal hatred and bitterness. Besides, I maintained that it would not ameliorate the condition of Muslims in Pakistan. The inevitable result of the partition of the country would be to prolong if not perpetuate, the poverty, illiteracy and miserable condition of the toiling masses of both the States. I further apprehended that Pakistan might turn to be one of the most backward and undeveloped countries of the South-East Asia region.

7) I must make it clear that I have thought that an attempt would be made, as it being done at present, to develop Pakistan as a purely Islamic State based on the Shariat and the injunctions and formularies of Islam ....

8) It may also mentioned in this connection that I was opposed to the Partition of Bengal. In launching a campaign in this regard I had to face not only tremendous resistance from all quarters but also unspeakable abuse, insult and dishonour. With great regret I recollect those days when 32 crores of Hindus of the Indo-Pakistan sub-continent turned their back against me and dubbed me as the enemy of Hindus and Hinduism, but I remained undaunted and answered in my loyalty to Pakistan. It is a matter of gratitude that my appeal to 7 million scheduled castes people of Pakistan evoked a ready and enthusiastic response from them. they lent me their unstained support, sympathy and encouragement.

9) ....

10) When the question of Partition of Bengal arose, the Scheduled Caste people were alarmed in the anticipated dangerous result of partition. ... To my utter regret it is to be stated that after partition, particularly after the death of Quid-e Azam the scheduled castes have not received a fair deal in any matter. You will recollect that from time to time I brought the grievances of the scheduled castes to your notice. I explained to you in several occasions the nature of inefficient administration on East Bengal. I made serious charges against the police administration. I brought to your notice incidents of barbarous atrocities perpetrated by the police on frivolous grounds.

I did not hesitate to bring to your notice the anti-Hindu policy persuaded by the East Bengal Government, especially the police administration and a section of Muslim League leaders.

11. ... The armed police came and the local Muslims also joined them. They not only raided some houses of the Namasudras but mercilessly beat both

men and women, destroyed their properties and took away valuables . The merciless beating of a pregnant woman resulted in abortion on the spot ....
12. the second incidence of police oppression took place in early part of 1949 under P.S Gournadi in the district of Barisal ....

Even my letter to the District authorities was not acknowledged. I then brought this matter to the notice of the highest authority in Pakistan including yourself but to no avail .
13. The Atrocities perpetrated by the police and the military on the innocent Hindus, especially the Schedule Castes of Habibganj in the Dist. of Sylhet deserve description ...The military not only oppressed these people and took away stuffs forcibly from Hindu houses, but also forced Hindus to send their womenfolk at night to the camp to satisfy the carnal desire of the military. This fact also I brought to your notice. You assured me of a report on the matter, but unfortunately no report was forthcoming.
14. Then occurred the incident at Nachole in the district of Rajshahi where..... The Santhals then crossed the border and came over to West Bengal. They narrated the stories of atrocities wantonly committed by the Muslims and the police ...
15. An instance of callous and cold-blooded brutality is furnished by the incident that took place on December 20,1949 in Kalshira under P.S. Mollarhat in the District of Khulna ...
16................ **17**............... **18**................
19. It is significant that on Feb. 10,1950 at about 10 O' clock in the morning a woman was painted red to show that her breast was cut off in Calcutta riot, and was taken round the East Bengal Secretariate at Dacca. Immediately, the Government servants of the Secretariate struck work and came out in procession raising slogans of revenge against the Hindus ...
20. The riot started at about 1 p.m. simultaneously all over the city. Arson, looting of Hindu shops and houses, and killing of Hindus, wherever they were found, commenced in full swing in all parts of the city. I got evidence even from the Muslims that arson and looting were committed even in the presence of high police officials ... To my utter dismay I had occasion to see and know things at close quarters. What I saw and learnt from first-hand information was simply staggering and heart-rending.
21...
22. During my nine days' stay in Dacca, I visited most of the riot-affected areas of the city and suburbs ...On the 20th February 1950, I reached Barisal town ... I was simply puzzled to find the havoc wrought by the Muslim rioters even at places like Kasipur, Madhabpasha and Lakutia which were

within a radius of six miles from the District town and were connected with motorable roads. At the Madhabpasha Zeminder's house, about 200 people were killed and 40 injured...I only asked myself. "What was coming to Pakistan in the name of Islam".

23. The large scale exodus of Hindus from East Bengal commenced in the latter part of March. It appeared that within a short time all the Hindus would migrate to India ...

I visited a number of places in the district of Dacca, Barisal, Faridpur, Khulna and Jessore. I addressed dozens of largely attended meetings and asked the Hindus to take courage and not to leave their ancestral hearts and homes...

24. ... It is true that the Jews in Arabia had been given religious freedom by Prophet Mahammed; but it was the first chapter of the History. The last chapter contains the definite direction of Prophet Mahammed which runs as follows :- "Drive away the Jews out of Arabia ". [Quoted from Maulana Akram Khan's editorial comments.]

25.......... 31.........

32. ... Thana officers seldom recorded half the complaints made by the Hindus. That the abduction and rape of Hindu girls have been reduced to a certain extent is due to the fact that there is no Caste Hindu girl between the ages of 12 and 30 living in East Bengal at present. The few depressed class girls who live in rural areas with their parents are not even spared by Muslim goondas. I have received information about a number of incidents of rape of Scheduled Castes girls by Muslims ...

33. ... I have got a list of 363 Hindu temples and gurudwaras of Karachi and Sind (which is by no means an exhaustive list), which are still in possession of Muslims. Some of the temples have been converted into cobbler's shop, houses and hotels ... I drew the attention of the Sind Provincial Government to this fact. There was a little or no effect. To my extreme regret, I received information that a large number of Scheduled Castes who are still living in Sind have been forcibly converted to Islam.

34. ... They (Hindus) have no other fault than that they profess Hindu religion. Declaration are being repeatedly made by Muslim League leaders that Pakistan is and shall be an Islamic state. Islam is being offered as the sovereign remedy for all earthly evils. In the ruthless dialectics of capitalism and socialism you present the exhilarating democratic synthesis of Islamic equality and fraternity. In that grand setting of the Shariat Muslims alone are rulers while Hindus and other minorities are jimmies who are entitled to protection at a price, and you know more than anybody else Mr. Prime

minister, what that price is. After anxious and prolonged struggle I have come to the conclusion that Pakistan is no place for Hindus to live in and that their future is darkened by the ominous shadow of conversion or liquidation. The buck of the upper class Hindus and politically conscious scheduled castes have left East Bengal. The Hindus who will continue to stay in that accursed province for that matter in Pakistan will, I am afraid, by gradual stages and in a planned manner be either converted to Islam or completely exterminated. It is really amazing that a man of your education, culture and experience should be an exponent of a doctrine fraught with so great danger to humanity and subversive of all principles of equality and good sense ...

And what about the Muslims who are outside the charmed circle of the League rulers and their corrupt and inefficient bureaucracy? There is hardly anything called civil liberty in Pakistan.... East Bengal Muslims in their enthusiasm wanted bread and they have by the mysterious working of the Islamic State and the Shariat got stone instead from the arid deserts of Sind and the Punjab.

Leaving aside the overall picture of Pakistan and the callous and cruel injustice done to others, my own personal experience is no less sad, bitter and revealing. You used your position as the Prime Minster and leader of the Parliamentary party to ask me to issue a statement, which I did on the 8th September last. You know that I was not willing to make a statement containing untruths and half-truths, which were worse than untruths. It was not possible for me to reject your request so long as I was there working as Minister with you and under your leadership. But I can no longer afford to carry this load of false pretensions and untruth on my conscience and I have decided to offer my resignation as your Minister, which I am hereby placing in your hands and which, I hope you will accept without delay. You are of course at liberty to dispense with that office or dispose of it in such a manner as may suit adequately and effectively the objectives of your Islamic State.

Yours sincerely
J.N. Mandal

Taken from: 'Minority Politics in Bangladesh'
by Muhammad Ghulam Kabir.
Pub: In 1980 by VIKAS PUBLISHING HOUSE PVT LTD.
5, Ansari Road, New Delhi. (Appendix VI, pages 131-152)

পরিশিষ্ট- ৮

উদ্ধৃতির উৎস

[1] 'India Partitioned and Minorities of Pakistan', page-27.
শ্রীপ্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী তাঁর এই বই-এ মিঃ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে মুসলিম লীগের সহযোগী সদস্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া ১৩. ১০. ০২ তারিখ রাত ৯-৪৫ মিনিটে এব টেলিফোন সাক্ষাৎকারে কোলকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির বর্তমান সভাপতি প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ অমলেন্দু দে শ্রীদেবজ্যোতি রায়কে জানিয়েছেন, ১৯৪৩-এই যোগেনবাবু মুসলিম লীগের 'সহযোগী সদস্য' হন। কৌশলগত কারণে এ খবর দীর্ঘদিন চেপে রাখা হয়। ১৯৪৬-এ নোয়াখালি দাঙ্গার পরে এ খবর প্রকাশিত হয়।

[2] The Statesman, dt. 25.10.'46.
"Not a single member of the Scheduled Castes was either killed or injured."

[3] মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ-১, পৃ-২২১।

[4] মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ-২, পৃ-৬৮।

[5] Minority Politics in Bangladesh by Ghulam Kabir, page-26.

[6] বাংলাদেশের অভ্যুদয়, শেখ হাফিজুর রহমান, পৃ- ৫৫।
"My dear students, for the shake of Islam I have decided that Urdu alone would be the state language of Pakistan." -- Mr. M.A.Jinnah.

[7] উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃ- ৫৪।

[8] যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পদত্যাগ পত্র, অনুচ্ছেদ- ৩৪ (পরিশিষ্ট-৭)।

[9] পদত্যাগ পত্র, অনুচ্ছেদ- ৩৪

[10] 'ভারত ইতিহাস পরিক্রমা',অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাইতি, ২য় অংশ,পৃ-২০২।

[11] Dr. Ambedkar's Writings & Speeches,Vol. 2, p-357,
"The golden mean is the system of joint electorates with reserved seats."

[12] অমলেন্দু দে-র 'পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক', পৃ- ১১১।

[13] আবুল মনসুরের 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পৃ-১৭৩।

[14] অমলেন্দু দে-র 'পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক', পৃ-১৬৫।

[15] Dr. Ambedkar,Vol. 8, page-407
"Today, he knows more of Islam than mere ***Kalama (Kalema)***. Today

he goes to the mosque to hear ***Khutba*** and takes delight in joining the *Id* congregational prayers."

[16] Dr. Ambedkar, Vol.8, Page-364
"The army in India must necessarily be a mixed army composed of Hindus and Muslims. If India is invaded by a foreign power, can the Muslims in the army be trusted to defend India? Suppose invaders are their co-religionists. Will the Muslims side with the invaders or will they stand against them and save India?"

[17] Dr. Ambedkar, Vol. 8. p-276
"The poet said that he had very frankly asked many Mohamedans whether in the event of any Mohamedans power invading India, they would stand side by side with their Hindu neighbours to defend their common land. He could not be satisfied with the reply he got from them. He said that he could definitely state that even such men as Mahamed Ali had declared that under no circumstances was it permissible for any Mohamedan, whatever his country might be, to stand against any other Mohamedan. "

[18] Dr. Ambedkar, Vol. 8. p-92.
"Even if the proportion be 50%, it is high enough to cause alarm to the Hindus."

[19] অমলেন্দু দে-র 'পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক', পৃ- ৪৩ এবং N.N.Mitra's 'The Annual Register, 1940, Vol.1, pages 305-306

[20] Dr. Ambedkar, Vol. 8. p- 301
"To the Muslims a Hindu is a Kaffir. A Kaffir is not worthy of respect. He is low born and without status."

[21] Dr.Ambedkar, Vol. 8. p-116.

[22] প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'আধুনিক ভারত', ২য় খণ্ড, ১৯৯৯, পৃ-১৮৩।
(পরে শুধু আধুনিক ভারত লেখা হবে।)

[23] অমলেন্দু দে-র 'পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক', পৃ-১৭৭)

[24] আবুল হাশিমের 'আমার জীবন ... পৃ-৩৯।

[25] অমলেন্দু দে-র 'পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক', পৃ-১৭৭।

[26] অমলেশ ত্রিপাঠী, স্বাধীনতা সংগ্রামে ...., পৃ-৩৪০

[27] India Wins Freedom, 1976, p-29
'We shall have India divided,' he (Mr. Jinnah) vowed, 'or we shall have India destroyed.'

[28] সিরাজ উদ্দিন আহমেদের 'শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক', পৃ-২০০।

[29] Stern Reckonong by G.D.Khosla.page-43.

'Pakistan could only be achieved by shedding blood and, if opportunity arose, the blood of non-Muslims must be shed.' - reported to have said by Sarder Abdur Rab Nishtar.

[30] The Transfer of Power,' Vol.VIII, page-139
"The Council of the All-India Muslim League is convinced that now the time has come for the Muslim Nation to resort to Direct Action to achieve Pakistan, to assert their just rights, to vindicate their honour to get rid of the present British slavery and the contemplated future Caste-Hindu domination. The Council calls upon the Muslim Nation to stand to a man behind their sole representative and authoritative organisation, the All-India Muslim League, and to be ready for every sacrifice."

[31] The Transfer of Power, Vol.VIII, page-139
"The Council directs the Working Committee to prepare forthwith a programme of Direct Action to carry out the policy enunciated above and to organise the Muslims for the coming struggle to be launched as when necessary."

[32] The Transfer of Power in India, by V.P. Menon, p-419]
"The Muslim League High Command functioned from Delhi and was from Delhi that the campaign of 'Direct Action' had been organised and conducted through the length and breadth of the country." •Rao Bahadur Vapal Pangunni Menon ছিলেন ভারত সরকারের তৎকালীন 'রিফরম্‌স কমিশনার' এবং পরবর্তীকালে গভর্ণর জেনারেলের (পাবলিক) সচিব।)

[34] অমলেশ ত্রিপাঠী, স্বাধীনতা সংগ্রামে .... পৃ-৪৪৩
"The loss of life in Calcutta riots was far greater than at the battle of Plassey." Wavell, Viceroy's Journal, 3 Nov., 1946.

[35] Gandhi : His Life and Thought by A. Kripalani, page- 253.
"The Chief Minister, who held the portfolio of law and order, had systematically transferred the Hindu police officers from 22 out of 24 police stations in Calcutta and replaced them by Muslim officers. The remaining two police stations were under Anglo-Indians."

[36] The Statesman dt. 16.8.46
"By 31 to 13 votes an adjournment motion criticising the Bengal Government's action in declaring to-day (which is to be observed by the Muslim League as 'Direct Action Day') as holiday, was defeated in the council yesterday."

[37] The Statesman dt. 16.8.46]
"The measure had been taken to minimise chances of conflict and

hoped that all sections of the community would do their utmost to co-operate in the preservation of peace and order."

[38] Amrita Bazar Patrika, Friday, August 9, 1946
"........... all demonstrations, processions, meetings, protests, closing of shops, observance of hartal etc. should be absolutely peaceful. There must not be violence of any kind whatsoever or any coercion on any one. ... We must be abslutely disciplined. Let us show to the world that we can perform our task with complete discipline and that we have sufficient control over ourselves, ..."

[39] Amrita Bazar Patrika, Friday, August 17, 1946
" Troops have been moved into the city and stationed in police headquarters. Curfew has been ordered in the city from 9 P.M. to 4 A.M. (Bengal Time),"

[40] India Wins Freedom,1965, page- 169
"Throughout Calcutta, the military and police were standing by but remained inactive while innocent men and women were being killed."

[41] The Statesman dt. 16.8.46
"I unreservedly condemn the acts of violence and deeply sympathise with those who have suffered."

[42] The Statesman, dt. 19.8.46
"Our programme will certainly not be upset because a few persons misbehave as in Calcutta."

[43] 'Gandhi : His Life and Thought' by J.B.Kripalani, page- 253]
"I have a stomach made strong by experience of war but war was never like this. This is not a riot. It needs a word found in mediaval history, a fury ..." - Kim Christen, A British correspondent.

[44] Mountbatten and the Partition of India, L. Collons & D. Lapierre, Vol. 1, 1982 Edition, page-33
"His (Gandhiji's) only contribution was to tell me, quite early on, that whatever happened, I mustn't dream of partitioning India. I said it was the last thing I wanted to do -- and don't forget Direct Action Day in Calcutta which was a warning of what he could do (August, 1946) -- I mean he killed 5,000 people and wounded 15,000 people just as demonstration, and I think he has the capacity to cause civil war if we don't meet him half-way. "Yes", said Gandhi, "I agree. ..'

[45] The Statesman dt. 19.8.46
"For the third time in less than a year Calcutta has become the scene of grave disturbances. I have myself gone round the troubled areas both yesterday and to-day and seen with my own eyes of havoc

created by riotous mob. The political leaders of all parties are unanimous in condemning this senseless destruction of life and property by lawless hooligans. From reports so far received, Calcutta is the only place of importance in India where the occasion has given rise to a major disturbance of the peace."

[46] গান্ধী রচনা সংগ্রহ (ইংরেজী), খণ্ড ৮৫, পৃ-২২০

[47] Dalit Literature:Quest for Dalit Liberation, 1994, page-34.
"To my utter surprise, I came to know that Shri Jogendra Nath Mondal raised an objection on the ground that communal riots should be allowed to continue. According to him it was a fight between the Muslims and the Caste Hindus and the Scheduled Castes were not involved, so were not to speak anything about the so-called riots." -
- Apurbalal Mazumder,

[48] Gandhi : His Life and Thought by A.Kripalani, page-254

[49] Pyarela's 'Mahatma Gandhi-Last Phase, Vol. II, page-255

[50] 'Gandhi : His Life & Thought' by A. Kripalani, p- 255
"The Muslim Hooligans had systemetically cut the roads and stopped the boatmen from ferrying the Hindus across. (The boatmen were all Muslims) A few brave souls had tried to enter the area to help the friends and relatives. They either met with death or returned wounded."

[51] জিন্নাহ্ ঃ পাকিস্তান - নতুন ভাবনা, পৃ-২৬২

[52] Pyarelal's 'Mahatma Gandhi - Last Phase- Vol.II, page-9
"The League General Secretary, Liaquat Ali Khan, declared that the Muslim National Guards were an 'integral part' of the Muslim League and an attack on them was, therefore, an 'attack on the Muslim League."

[53] The Statesman, dt. *15.10.'46.*
"The inclusion of a Non-Muslim by the Muslim League in its panel of names is a startling feature of the press Communiqué announcing the reconstitution of the Central Government issued from the Viceroy's House this evening."

[54] মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ, ১ম খণ্ড, পৃ- ২০১.
"It is reliably and authentically learnt that most of the Scheduled Caste people [Ramganj P.S. of Noakhali District] were attacked by thousands of Muslim Hooligangs who looted their properties, burnt their houses and forcibly converted them to Islam."]

[55] The Statesman, October 22, 1946.
"It is very doubtful whether the cabinet will work smoothly. It is quite definite that they are not our friends - they are not even allies,"

he added, "we know people who are allies though not friends, but the Muslim League and the Congress party have gone into the new Central Government as adversaries. What can we expect? One can hardly call that a coalition. It is really, in a sense, government of one country by two nations."

[56] 'Gandhi : His Life & Thought' by A. Kripalini, p- 255-56
"When we talked of kidnapping Hindu women by the Muslims, his laconic reply was that that was inevitable, as the Hindu women were more handsome than Muslim women."

[57] Gandhi : His Life & Thought by A. Kripalini, p- 255-56

[58] Dalit Literature : Quest for Dalit Liberation, page-34.]

[59] The Statesman, dt. 25.10.'46.
"...... But the happenings are not as serious as they are made to appear in certain sections of press. There has been no case of rape and abduction and no general killing and general arson. There are instances of conversion and stray marriages."

[60] The Statesman dt. 25.10.'46.
"There has been no murder of women and children."

[61] Mr. Mandal's Resignation Letter, Clause- 3

[62] The Statesman, Nov. 4, 1946
"Addressing the gathering at the end of his prayer to-day Mr. Gandhi said that the Prime Minister of Bengal had asked him to delay his departure for Noakhali till after the Bakre-Id and that he *(Mr. Gandhi)* had agreed. *[Also in the Collected Works of Mahatma Gandhi, Vol.86, page-70]*

[63] The Statesman, 12.11.1946]
"The meeting listened to him in silence and then dispersed."

[64] Collected Works of Mahatma Gandhi, Vol.86/306.
"While walking, saw the ravages in the colny of Namasudras. The mind started thinking: how could anyone stoop so low as to perpetrate such havoc in the name of religion or for selfish gain."

[65] Ibid, Vol. 51, p-139
"This Conference resolves that henceforth, amongst Hindus, no one shall be regarded as an untouchable by reason of his birth. ..... .

[66] ম.যোগেন্দ্রনাথ ও বাবাসাহেব আম্বেদকর, পৃ- ৮৩

[67] Dr. Ambedkar, Vol. 8/97
"The realist must take note of the fact that the Musalmans look upon the Hindus as Kaffirs, who deserve more to be exterminated than protected."

[68] 'Sahih Muslim.' Vol. III, page – 965

"It has been narrated by 'Umar b. Al-Khattab that he heard the Messenger of Allah (may peace be upon Him) say : I will expel the Jews and Christians from the Arabian Peninsula and will not leave any but Muslims." [Hadis No. 4366]

[69] Dr.Ambedkar,Vol.3/230
"Islam destroyed Budhism not only in India, but wherever it went.

[70] Transfer of Power, Vol. IX. page- 804
Lord Wavell, in his letter to King George VI, on 24 February, 1947, wrote –
"Mandal, the League's Scheduled Caste nominee, is Law Member ......(*personal comment omitted here*). He is usually travelling the country to attend Scheduled Caste political meetings; when he does come to the Cabinet he is silent or silly."

[71] Dalit Literature : Quest for Dalit Liberation, page-35.

[72] আবুল হাশিম, 'আমার জীবন ও ....', পৃ-৯৯।

[73] Mr. Mandal's R.L. Clause-3

[74] T.P. Vol. 8, page-712.
"I wished them to work together as a team in as much harmony as possible. Jinnah said that he recognised this and had been most anxious to meet me in every possible way, ***but they had their own interests to consider.***"

[75] Dalit Literature : Quest for Dalit Liberation, page-30.
"Don't forget for a moment that you are a member of the Working Committee of the Scheduled Caste Federation and your first duty would be to serve the depressed class communities."

[76] Dalit Literature : Quest for Dalit Liberation, page-30
"Shri Jogendra Nath Mandal who had not only misled us but also betrayed the Scheduled Caste Federation and also our leader Dr. B.R.Ambedkar."-- A.Mazumder.

[77] Dr. Ambedkar, Vol. 10, page - 537
"In the present Interim Government they have got two representatives of the Scheduled Castes neither of them owe any allegiance or obligation to the Scheduled Castes. One is nominated by the Congress and other is nominated by Muslim League."

[78] Transfer of Power, Vol.VII, page- 811, Enclo. No. 454,
"Failing this there will be no alternative for the Scheduled Castes but to resort to direct action."

[79] Amrita Bazar Partika, 26.8.46
"There is justification for Pakistan, but there is no justfication for the Muslims to be given parity with the Caste Hindus, nor any

justfication restricting the representative of the other minoroties to four only, when one of them namely the Scheduled Castes number more than fifty percent of the total population of the Muslims. .... If the Muslims are justified to claim equally with the Caste Hindus, then there is more justification for the Scheduled classes to claim at least fifty percent of the representation given to the Muslims."

[80] Amrita Bazar Partika, July 2, 1946
"Declaring that there was no ideological difference between the Congress and the Scheduled Caste Federation, he (Dr. Ambedkar) said that these organisations could close up their rank and work together if the Congress accepted the Federation's demand and agreed to a Separate electorate for the community."

[81] C.A. Debate, Vol. 1, Third Reprint,1999, pp- 100-101.

[82] জিন্নাহ্ ঃ পাকিস্তান - নতুন ভাবনা, পৃ- ২৫৬

[83] The Transfer of Power, Vol.-X, p- 899. Document- 485.
"Mr. Jinnah considered that, with its Muslim majority, an independent Bengal would be a sort of subsidiary Pakistan and was therefore prepared to agree to Mr. Suhrawardy's plan."

[84] স্বাধীন বঙ্গভূমি ......প্রয়াস ও পরিণতি, অমলেন্দু দে, পৃ-৭

[85] স্বাধীন বঙ্গভূমি ......প্রয়াস ও পরিণতি, অমলেন্দু দে, পৃ-৫১

[86] Larry Collins & Dominique Lapierre, Vol-1, page- 43]

[87] 'My Days with Gandhi' by N.K.Bose, page-227]
"They had a common language, a common culture and did not wish to be ruled by Pakistanis who lived a thousand miles away."

[88] স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রস, অমলেশ ত্রিপাঠী, পৃ-৪৭০।

[89] Letter from Ahmad Ispahani to M.A. Jinnah,F. 68/40,
Document No. 399 of Jinnah Papers, page no. 717.
"Mandal returned from his tour of North Bengal, and I gave him Rs. 10,000 for which I hold a receipt. He is going on tour to other parts of West Bengal to do his job."

[90] Jinnah Papers, Vol. I, Part-1, p- 869.
"I can tell you that the task is extremely uphill and except two meetings in the Burdwan Division it has not been possible to hold more, and the Scheduled Caste workers are even afraid to go amongst the Scheduled Caste in the Burdwan division, and they want protection and they want officers to support them." [Docu. no. 479, Enclo-1]

[91] Transfer of Power. Vol. XI, page-161
"At 11 o'clock that night [2nd June,'47] Jinnah came round. He

spent half an hour conveying the protest of his Working Committee against the partition of the provinces and saying that if His Majesty's Government were really going to insist on this scandalous move, then his Working Committee hoped strongly that they would at least do justice to the Scheduled Castes in Bengal by insisting on a proper referendum. ......"

[92] The Statesman, 6th June, 1947.
"A good sense will eventually prevail among Congress leaders like Mr. Gandhi and Pandit Nehru to grant the same justice to the Scheduled Castes as they will receive at the hands of Mr. Jinnah in Pakistan."

[93] 'The Transfer of Power, Vol.-XI, page - 41]
The question had arisen as to whether a referndum should be held in Calcutta as , according to Mr. Mandal's *(Mr. J.N.Mandal)* view, the vote of the Scheduled Castes there might result in a decision in favour of Calcutta joining Eastern Bengal.'

[94] T.P. Vol. XI, page- 536
" Separate meeting of members East repeat East Bengal Legislative Assembly this afternoon decided...... under paragraph thirteen of statement by 105 votes to 34 votes that East Bengal would agree to amalgamation of Sylhet." [Document No. 278]

[95] জিন্নাহ্ পাকিস্তান - নতুন ভাবনা, শৈলেশ বন্দ্যো. , পৃ- ১৭৫।

[96] Minority Politics in Bangladesh by Md. Ghulam Kabir, p-21
"You are free: you are free to go to your temples, you are free to go to your mosque or any other places of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed – that has nothing to do with the business of the State."

[97] মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ- ২, পৃ-১১১
"Referring to Mr. Gandhi's comment about the decision to wear the badges, Mr. Mandal emphatically said 'Mr. Gandhi has no business to make any comment on the wearing of badges, which is meant for the safety of the poor menials and other Scheduled Caste labourers who are required to come out and return to their homes from work at odd time."

[98] Morning News, dt. 8.10.'47, p-1, col.8.
"... the problem of refugee from Pakistan should be looked upon as an item of 'first concern' and they should be absorbed in the Indian Dominion."

[99] Dr. Ambedkar's Role in National Movement, page- 198
"I would like to tell the Scheduled Castes who happened to-day to

be impounded inside Pakistan to come over to India by such means as may be available to them. ......I ask the Scheduled Castes in Hyderabad not to side with the Nizam and bring disgrace upon the community by siding with one who is the enemy of India."

[100] Ghulam Kabir, Minority Politics ....., page-110
"Brother you have heard about the inhuman atrocities being perpetrated on our brother Muslims in India and West Bengal. Will you not prepare yourselves? Will you not gather strength?"

[101] তর্ক, বিতর্ক ও কুতর্ক, পৃ- ৮৬।

[102] The Times of India, September 10, 1950.
"It is encouraging to note that conditions in East Bengal have appreciably improved. The migration figures as published by the Governments of East Bengal and West Bengal show that a large number of migrants are returning to their homes. The facts indicates that a confidence of minority Community has been restored. I am inclined to think a very large percentage of returning Hindu migrants are members of the Scheduled Castes who are mostly cultivators."

[103] Mr. Mandal;s R.L.,Cluase 34

[104] Mr. Mandal;s R.L.,Cluase- 34

[105] Dr. Ambedkar, Vol. 8, page-330
"The brotherhood of Islam is not universal brotherhood of man. It is brotherhood of Muslims for Muslims only. There is a fraternity but its benefit is confined to those within that corporation. For those who are outside the corporation, there is nothing but contempt and enmity."

[106] Dr. Ambedkar, Vol. 8/302.
"Yes, according to my religion and creed, I do hold an adulterous and a fallen Musalman to be better than Mr. Gandhi."

[107] --- Report of the Viceroy's Staff Meetings, dt. 11 April, 1947, T.P. Vol.X, page-190.
"He (Mr. Jinnah) apparently thought that all Hindus were sub-human creatures with whom it was impossible for the Muslims to live."

[108] Dr. Ambedkar, Vol. 8/35.
" ...... they (Hindus & Muslims) have been just two armed bat talions warring against each other."

[109] Dr. Ambedkar, Vol. 8/330
"wherever there is the rule of Islam, there is his country."

[110] Dr. Ambedkar, Vol. 8/193
"For them Divinity is divided and with the division of Divinity their humanity is divided with the division of humanity they must remain

divided. There is nothing to bring them in one bosom."

[111] Dr. Ambedkar, Vol. 8/313
"The history of last 30 years shows that Hindu-Muslim unity has not been realized."

[112] Dr. Ambedkar, Vol. 8/116
"That the transfer to minorities is the only lasting remedy for communal peace is beyond doubt. If that is so, there is no reason why the Hindus and the Muslims should keep on trading in safeguards which have proved so unsafe."

[113] 'Veer Savarkar' - by Dhananjay Keer, 1966, Page-437.
He *[J.N.Mandal]*was denounced by Pakistani Papers a thrice born slave!"

[114] India's Struggle : Quarter of a Century, Part II, by A.C.Guha, page-801
"The writer knew Mondal personally -- a man of neither any intellectual, political or moral value to any party or to the society."

[115] জিন্নাহ্ পাকিস্তান - নতুন ভাবনা, শৈলেশ বন্দ্যো. , পৃ- ২৬৮

[116] Jatava's 'Dr. Ambedkar's Role in National Movement, p-145]
"I confess I have quarrel with the caste Hindus over some points. But I take a vow before you that I shall lay down my life in the defence of our land." — Dr. Ambedkar.

[117] Dr. Ambedkar,Vol.8, p-294
"According to Muslim Cannon Law the world is divided into two camps, Dar-ul-Islam (abode of Islam)and Dar-ul-Harb (abode of war). A country is Dar-ul-Islam when it is ruled by Muslims. A country is Dar-ul-Harb when Muslims only reside in it but are not rulers of it. That being the canon Law of the Muslims, India cannot be the common motherland of the Hindus and the Musalmans."

[118] Dr. Ambedkar,Vol.2, p-317
" ... the feeling not that they are Indians first and Hindus, Mohamedans or Sindhis and Kanarese afterwards but that they are Indians first and Indians last."

119] Dr. Ambedkar's Letter to Mr. J.N.Mandal dt. 2.6.'47.

"a) The scheduled Castes were incapable of doing anything precisely with regard to the question of partition. They could neither force partition nor could they prevent partition if it was coming.

b) The only course left to the Scheduled Castes is to fight for safeguards either in a united Bengal or a Divided Bengal.

c) I also hold the view that the Muslims are not greater friends of the Scheduled Castes than the Hindus ....

d) .... you have mentioned that the Scheduled Castes in eastern Bengal will elect to stay where they are even when partition comes.

e) I have of course told the Hindus .... to reseve some lanu in Western Bengal when the Damodar Valley Project matures and more land is available for cultivation.

f) In the meantime I agree that you should work in alliance with the league and secure adequate safeguards for them.

g) I am not quite so helpless as you are with regard to the attitude of the Hindus in 'A-block' to give political safeguards to the Scheduled Castes.

h) In so far I am able to judge I think they will agree to almost all the safeguards that we want."

[120] Dr. Ambedkar, Vol. 8/378.
"It is no use asking the non-Muslim minorities in the Punjab and Bengal to be content with safeguards."

শুদ্ধি-পত্র

পৃঃ/লাইন	যা আছে	যা হবে
সূচী-পত্র/২৫	যোগেরবাবুর	যোগেনবাবুর
৩০/১৮	মোক্তার	এ্যাডভোকেট
৩৬/ শেষ লাইন	বিসর্গ-ব	বিসর্গ-র
৬৭/২৫	জোরও যুক্তি	জোর ও যুক্তি
৬৯/১৫	কনফারেন্সর	কনফারেন্সের
১৩৫ নং পৃষ্ঠায় ৩৩ নং রেফারেন্স নেই		[33] Morning News, August 15, 1946. "As the All India Muslim League has resolved to take direct action as a mark of protest against the unjust policy and flagrant breach of faith of British Government to the Muslims, the Scheduled Castes and other minorities of India have decided to observe Friday, August 16, as All India Direct Action Day and the Bengal Provincial Scheduled Caste Federation has decided to co-operate with the Muslims to follow the programme announced by the Calcutta District Muslim League."
১২৩/১৫	Dr. B.R.Ambedkar	J. N. Mandal.
১৩৬/৪৪ নং রেফারেন্স	L. Collons	Larry Collins

বি. দ্র. সহৃদয় পাঠকবর্গের চোখে অন্য কোন ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়লে আমাদেরকে জানাবেন; বিনীত অনুরোধ রাখছি।

"আমার বিচারে দু'টো নিয়ামক উপাদান আছে
প্রথমত ভারতের প্রতিরক্ষার ব্যাপার এবং
দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদের মানসিকতা।"

— ডঃ আম্বেদকর।

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

"অবশেষে ভারতের অচল অবস্থার অবসান ঘটিল
এবং ভারতকে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে বিভক্ত
করণের দীর্ঘ বিতর্কমূলক প্রশ্নের সমাধান হইল
বাঞ্ছিত লক্ষ্য পাকিস্তান
অর্জ্জনের অপূর্ব সাফল্য লাভের জন্য আমি
কায়েদে আজম জিন্নাহ ও মুসলিম লীগকে
অভিনন্দিত ও সম্বর্ধিত করিতেছি।"

— যোগেনদ্রনাথ।

আহা! কি আনন্দ, কি আনন্দ!